ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

দ্বিতীয় বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ সেপ্টেম্বর ২০১৩ □ ৩০ টাকা

Subscribe Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক (একাংশ)। ২৪"×২৪"। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরাভ্রমণ কাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
কালের কষ্টিপাথর
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
ঋণ নিয়ে ব্যবসার সুযোগ
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে।

কলকাতায়ও সর্বত্র পাবেন
পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

জীবনে আমি চাকরি পাইনি ব'লে দুঃখ ছিল। ফলে, 'কর্মক্ষেত্র' আমি গোগ্রাসে গিলি। প'ড়ে বুঝেছি, চাকরি পেতে যে এলেম দরকার আমার তা নেই। প্রশ্নোত্তরগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করি। পরে বুঝি, খুব দেরি ক'রে ফেলেছি। কী করব, আমাদের বয়সকালে তো 'কর্মক্ষেত্র' জন্মায়নি। স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলো আত্মস্থ ক'রে তবু লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ বয়সেও হয়তো একবার কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা হল, 'কর্মক্ষেত্র' আমাকে কাজ না দিলেও অনেক কিছু শেখায় পড়ায়।

১৮/১২/২০০০

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র : www.ekarmakshetra.com

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

দ্বিতীয় বর্ষ। তৃতীয় সংখ্যা। সেপ্টেম্বর ২০১৩। আশ্বিন ১৪২০

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৫

ক্ষণের বচন ৯। শব্দবক্র ৯

চণ্ডীমণ্ডপ। ভলক্যানো কারে কয়? চণ্ডী লাহিড়ী ৭

পত্রস্মৃতি। বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি ৩২
সূত্র-সংযোজন: দময়ন্তী বসু সিং

পু র নো অ্যা ল বা ম

কালান্তর। সম্পাদকীয়। প্রতাপকুমার রায় ৫৫

বি বি ধ নি ব ন্ধ

আমার বাবা: সুকুমারী ভট্টাচার্য ২৭

কাদম্বরী সমাচার: নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৬৮

জসীম উদ্‌দীনের ভ্রমণ। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ২৩

ধা রা বা হি ক

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৪

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৪৬

রাজ্যপাট। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৫২

অনিল চন্দ ও রানী চন্দ ১০ ক্ষিতিমোহন সেন ১২
মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

ক বি তা র পা তা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্বাচিত দশটি কবিতা ৬০

কবিতার ভাষা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬৫

কবিতা-পরিচয়
ঘোড়া: জীবনানন্দ দাশ ৫৭
আলোক সরকার

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● অরুণকুমার সরকার ৫৯

ভ্র ম ণ ক থা

এক পলকের একটু দেখা: জাপান। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩৯

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফিয়ার্স লেন ৭৭

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৭৯। বই-ঠেক ৭২

প্রচ্ছদ: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক (একাংশ)। ২৪"×২৪"।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই
অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in
মহাশ্বেতা দেবীর
বিস্ময়কর বই
তুতুল ₹২৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
বকবকম
পাতায় পাতায় মজার ছবি। ₹১৫
কানাইলাল চক্রবর্তীর
চলো দেখে আসি
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত।
নবম মুদ্রণ। ₹২০
চড়ুইয়ের সঙ্গে
₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর
লেখায়-ছবিতে
আমার ছেলেবেলা
তৃতীয় মুদ্রণ। ₹১৮
পবিত্র সরকারের
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
চতুর্থ মুদ্রণ। ₹১৫
মৈত্রেয়ী নাগের
বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটদের বই
গৌর যাযাবর
বিশ্বভারতীর আশালতা সেন
পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০
আমাজনের জঙ্গলে
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০
বরফের বাগান
আন্টার্কটিকার
রহস্যময় তুষাররাজ্যের
আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
₹১২০
হীরু ডাকাত
শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত
নবম মুদ্রণ। ₹৪৫
শাদা ঘোড়া
দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।
পঞ্চম মুদ্রণ। ₹৩০
ছেঁড়াকাঁথার গল্প
নানা ভাষায় অনূদিত হচ্ছে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫
ঋষিকুমার
পাতায় পাতায়
দেবব্রত ঘোষের ছবি। ₹২০
আমার বনবাস
₹১২
এছাড়াও: পাখির খাতা ₹৪০ টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী ₹১৫ তালগাছের ডোঙা ₹২০ হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫ ভূতের বাঁশি ₹৪০
স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 Fax: 2287-6448
E-mail: books@swarnakshar.in
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

কালের কষ্টিপাথর

আশ্বিন ১৪২০ □ সেপ্টেম্বর ২০১৩

উৎসর্গ

যাঁর অনেক কবিতাপংক্তি ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রের শিরোনামে প্রবাদের মতো ব্যবহৃত, যাঁর কবিতায় জেগে থাকাও মানুষের ধর্ম হয়ে ওঠে, চারপাশের ভালোবাসাহননে যাঁর কবিতায় রক্তক্ষরণ, সেই কবি ও সমাজবিবেক শঙ্খ ঘোষ-কে এই সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' উৎসর্গ করে আমরা ধন্য।

কোনওদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই অজ্ঞাতে 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম। পরে লিখাইল 'উদ্ভিদ-জীবন মানবীয় জীবনেরই ছায়ামাত্র।' জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। কাহার আদেশে এরূপ লিখিলাম?

জগদীশচন্দ্র বসু

স ম্পা দ কী য়

লেখক যে-ভাষায় লেখেন, সেই ভাষায় যাঁরা কথা বলেন, যে মাটিতে তাঁদের জন্ম ও জীবন, সেই মাটির ওপরের আকাশ-বাতাসে যত ঋতুর উদয়-অস্ত, সবকিছুই তো সাহিত্যসৃষ্টির অঙ্গ বা উপকরণ। মহাকাশতুল্য মানুষের মন এই সৃষ্টি-পরিধির মধ্যেই। লেখকের সমকাল আর জীবনসত্যের চিরকাল— এই দুয়ের টানাপড়েনও হয়তো সাহিত্যের আর একটি শর্ত বা আরাধ্য মাত্রা।

সমকালীন বাংলাসাহিত্যে এরকম গভীরে শিকড় নামানো, সুদূরে ডালপালা ছড়ানো মহীরুহ সকলেই নন, কিন্তু কেউ-কেউ তো বটেই।

দুঃখের বিষয়, নতুন প্রজন্মের যাঁরা এমন সংকেত ও সম্ভাবনাময়, যাঁদের কেউ-কেউ হয়তো ভবিষ্যতে বাংলাসাহিত্যের নতুন দিগ্‌দর্শী হতেও পারেন, তাঁদের অধিকাংশেরই এখনও 'কালের কষ্টিপাথর'-এ আঁচড় পড়েনি— এই পত্রিকার সবচেয়ে বড় অপূর্ণতা এটাই, সম্পাদকের বড় দুঃখও এ-ই।

নতুনদের লেখা আসে প্রচুর। কিন্তু যশপ্রার্থনা আর যশ অর্জনের শক্তি দুটো আলাদা পথ। সেটা সম্পূর্ণ না হলে প্রথিতযশা লেখকদের লেখার মতো দেখালেও নিজের নতুন লেখাটি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। যাঁরা 'কালের কষ্টিপাথর'-এ লেখা পাঠিয়ে ছাপা না হওয়ায় দুঃখ পান, ক্ষুব্ধ হন, হতাশ বোধ করেন, সেইসব তরুণ সাহিত্যসাধকদের প্রতি এ আমার একটি বিনীত নিবেদন।

সকলে পত্রিকার সমালোচনা করুন। যাতে আমরা ঘুমিয়ে না পড়ি। সকলে তাঁদের প্রকৃতই নতুন সৃষ্টিতে পত্রিকা ভরে তুলুন, যাতে নতুন আশা নিয়ে আমরা জেগে থাকি। এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

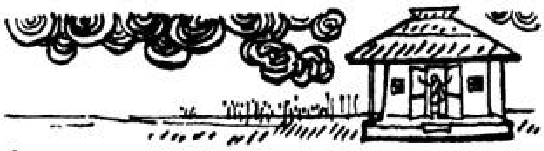

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

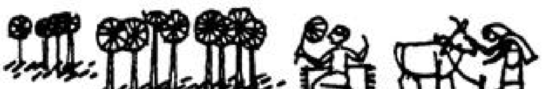

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্‌-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

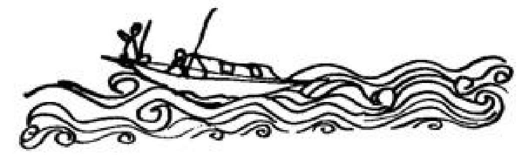

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ভলক্যানো কারে কয়?

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

এখন বড় হয়ে বুঝি, রোগটার নাম অটিজম। পঁচাত্তর বছর আগের ইস্কুল। আমাদের সহপাঠীর নাম ষষ্ঠী। রোগটি সম্পর্কে আমাদের বাল্যকালে কোনও ধ্যানধারণাই ছিল না। হাফ পাগল বলে সবাই উপেক্ষা করত। ষষ্ঠীর ছিল অসাধারণ মুখস্থ করবার ক্ষমতা। মানে বোঝার দরকার নেই। তখন পরীক্ষায় সাজেশন মিলত। বাঁধা বই, বাঁধা উত্তর, সিলেবাস পাল্টাবার কোনও প্রশ্নই উঠত না। চারটি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করতে পারলে একটি ‘কমন’ আসবেই।

ষষ্ঠীকে ভলক্যানো কথাটি শেখানো হয়েছিল। আমাদের সময়ে ম্যাট্রিকুলেশনের ইংরিজি পাঠ্যবইয়ে দুটি স্থানে ভলক্যানো শব্দটির ব্যবহার ছিল। ডেভিড কপারফিল্ডের ইউরিয়া হিপের মাথায় ভলক্যানো বার্স্ট করার ইচ্ছা ডেভিড রাগে-দুঃখে প্রকাশ করেছিল। আরেকটি প্রবন্ধ ইনসাইড দ্য আর্থ (লেখক জেমস জয়েস বা ওইরকম কিছু) নামক গুরুগম্ভীর প্রবন্ধে ভলক্যানো কীভাবে কাজ করে আলোচনা করা হয়েছিল।

ষষ্ঠী দুটো ভলক্যানো সম্পর্কিত প্রবন্ধের সম্ভাব্য প্রশ্ন ও উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার হলঘরে হাজির হল। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে এক জায়গায় ভলক্যানো লেখা আছে দেখে ছ'পাতা নির্ভুল লিখে ফেলল। জেমস জয়েস থেকে এল প্রশ্ন। ষষ্ঠী লিখল ডেভিড কপারফিল্ড থেকে।

আমরা হল থেকে বের হয়ে আসতেই ষষ্ঠী বলল, ডেভিড কপারফিল্ড থেকে কমন পেয়ে গেছি। আমরা ঠাট্টার ছলে হাসলাম।

পরীক্ষার ফল বের হতে দেখা গেল, একটি প্রশ্নে সে ডুবেছে কিন্তু মুখস্থর গুণে বাকি সব প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে।

অটিজমের রোগী ষষ্ঠী বেশিদিন বাঁচেনি। এখন ‘শেলটারে’ নিজে গিয়ে দেখেছি যে-কোনও অটিজমের রোগীকে অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ বছর বাঁচানো যায়।

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রথম খণ্ড

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। সহস্রাধিক পাতা। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

তৃতীয় মুদ্রণ। ₹৩৫০

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-Mail:** info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ক্ষনেরবচন

৭৭

সত্যের উল্লাস আছে, আস্ফালন নাই।
গুণের সুগন্ধ আছে, নাই দেখনাই।

৭৮

রাষ্ট্রশক্তির কেউ অধিকারী হলে
ন্যায়-অন্যায় সীমারেখা সহজেই ভোলে

৭৯

যত ঠিক খুঁটিনাটি
তত বড় বৈদ্যবাটি

৮০

ধামা চাপা দেওয়া ঘা
কারো আয়ু বাড়ায় না।

৮১

যে কাজের যা সমস্যা
না বুঝলেই অমাবস্যা

৮২

দোষ যদি থাকে ডিমে
বিষাবে সে পুন্যিমে।

৮৩

মুখে দয়া মায়া প্রেম, মনে মিথ্যাচার
মুখে স্নেহহাসি, মনে দম্ভের পাহাড়
এমন পুরুষ নারী যদি বৃদ্ধি পায়
মানুষের মূল্যবোধ তখন ঘা খায়।

ক্ষণকথক

শব্দবক্র

৮১। টিআরপিণ্ডি

বিশেষ্য; কোন টিভি চ্যানেলের জনপ্রিয়তা বাড়তে পারে এই আশায় যেসব দুষ্পাচ্য জগাখিচুরি পরিবেশন করা হয়।
— খুনখারাপির পুনরাভিনয়, টিকি বাঁধা লোকেদের ডেকে নিত্য কাজিয়া, এসব টিআরপিণ্ডি আর চলবে না বেশিদিন। এবার একটু অন্যরকম ভাবতে হবে।
— আমি বলি কি ম্যাডাম, যে ঘটনা এখনও ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারে এরকম কিছু নাটক করে দেখালে হয় না?
— হবে না কেন? তবে খবরের চ্যানেলে ওসব দেখালে সিরিয়ালগুলো কপি করে ফেলতে পারে। সে কথাটা তোমার মোটা মাথায় আসেনি তো?

৮২। হাত্তালিকা

বিশেষ্য; এস এম এসে পাঠানো ভোটের ভিত্তিতে যে সেরার তালিকা তৈরি হয়
> আমার ছোট নাতনিটা বড় মুখচোরা, বন্ধুবান্ধব বিশেষ নেই। অত ভালো গলা, জুরির বিচারে সেরা তিনেই ছিল... কিন্তু হাত্তালিকায় ঠাঁই পায়নি।

৮৩। কৈন্তেয়

বিশেষণ; 'কিন্তু' শব্দটি ব্যবহার না করে প্রায় কোনও বাক্যই শেষ করতে পারেন না যিনি— বাংলা খবরের টিভি চ্যানেলগুলোর দৌলতে কৈন্তেয়রা কৌরবদের চেয়েও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

৮৪। তাবুক

বিশেষণ; 'তবু' শব্দটি যার জীবনদর্শনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত— আশাবাদী জীবনে অনেক দেখেছি মশাই, তবে মহীনবাবুর মতো অমন তাবুক লোক চট করে দেখা যায় না। গেল বর্ষায় বাড়ির চাল ভেঙে পড়ায় বলেছিলেন, 'তবু তো হাঁড়ির চাল ভেসে যায়নি।' এবছর ভূমিকম্পে পুরো বাড়িটা গুঁড়িয়ে গেছে, সারা পরিবার কান্নাকাটি করছে, মহীনবাবু বললেন, 'তবু তো আমরা প্রাণে মরিনি, আর জমিটাও অক্ষত। বাড়ি আরেকখানা তুলে ফেললেই হল, এবারে বেশ মজবুত করে করতে হবে।'

৮৫। যদিমাত্রিক

বিশেষণ; আশঙ্কাগ্রস্ত যে মানুষটির কথার মাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'যদি' শব্দটি— 'প্লেনে চড়লে যদি ভেঙে পড়ে?', 'ট্রেনে যদি আগুন ধরে যায়?' 'গাড়ি যদি অ্যাকসিডেন্ট করে?' যদিমাত্রিক স্বামীটির এরকম বিবিধ ভয়ের জেরে অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী উড়নীদিদির একটু ইচ্ছেমতো দেশ বেড়ানোর যদি উপায় থাকে!

শব্দবক্রমুণি

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ২৭।

অনিল চন্দ ও রানী চন্দ

এই লেখাটি স্বামী-স্ত্রী— দুজনকে নিয়ে। দুজনেই খ্যাতিমান ও খ্যাতিমতী। একে অন্যের পরিপূরক এবং আমরা দুজনকেই সমানভাবে ভালোবাসতাম এবং ভালোবাসা পেতাম। দুজনেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এবং দুজনই সেকালের শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের সমান ভালোবাসতেন। তাই দুয়ে মিলে এক। তবে যেহেতু আমরা অনেকেই অনিলকুমার চন্দের ছাত্র, তাই তিনি এই রচনায় প্রধান ভূমিকা নিয়েছেন।

গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি। কলকাতায় ভবানীপুরের নন্দন রোডে তিন ভাই মিলে আড্ডা মারছেন। শুধু সেজভাই অশোককুমার দিল্লিতে। কোনও সরকারি দপ্তরের সচিব। নন্দন রোডে এল টেলিফোন— 'আমি মিঃ চন্দকে চাই।' মেজভাইয়ের বড় মেয়ে জয়শ্রী ফোন ধরে জানতে চাইলেন 'কোন চন্দকে চাই?' 'আমি মিঃ এ কে চন্দকে চাই।' 'কোন এ কে চন্দ?' 'চাই প্রিন্সিপাল এ কে চন্দকে?' 'কোন প্রিন্সিপাল এ কে চন্দ?' 'আমি প্রিন্সিপাল অপূর্বকুমার চন্দকে চাই।' 'তাই বলুন, ধরুন, আমি দিচ্ছি।'

অপূর্বকুমার তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল, মেজভাই অরুণকুমার শিলচর গুরুচরণ কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ছোট ভাই অনিলকুমার শান্তিনিকেতন কলেজের প্রিন্সিপাল। শুধু সেজভাই অশোককুমার কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন না, তবে দিল্লিতে ছিলেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি।

অপূর্বকুমারকে আদল করেই রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেন 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় চরিত্র। এই বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি তিনি অপূর্বকুমারকেই দান করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদি ছাত্র। কবিপুত্র শমীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। অরুণকুমার ছিলেন কংগ্রেস নেতা। কাছাড় জেলার মুকুটহীন রাজা। পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার, কিন্তু জনহিতে সারা জীবন কাজ করে অকালে প্রাণত্যাগ করেন। ছোট ভাই অনিলকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব। ছিলেন শান্তিনিকেতন কলেজের প্রিন্সিপাল এবং আমার মতো বহু ছাত্রছাত্রীর প্রিয় অনিলদা। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী রানী আমাদের প্রবাস জীবনকে মধুর করে রেখেছিলেন মধুর বাৎসল্যে ও স্নেহে। উত্তরায়ণের কোনার্ক বাড়িতে তাঁরা থাকতেন এবং সেই বাড়ি ছিল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে অবারিত দ্বার। পেয়েছে তাঁদের দুজনের স্নেহ ও প্রশ্রয়।

রানী চন্দ

রানীদি শিল্পী মুকুল দে ও মনীষী দে-র ছোট বোন। নিজেও শিল্পী। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর কাছে তাঁর শিক্ষা, তাঁর ছবি বারবার দেখার মতো। সাহিত্যিকরূপে তাঁর খ্যাতি ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ', 'জেনানা ফাটক', 'পূর্ণকুম্ভ', 'হিমাদ্রি', 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'আমার মা'র বাপের বাড়ি', 'গুরুদেব', 'শিল্পীগুরু রবীন্দ্রনাথ' ইত্যাদি বই লিখেছেন এবং সব পাঠককে মুগ্ধ করেছেন। 'পূর্ণকুম্ভ' বইয়ের জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার। তিনি রান্না করছেন আর মাঝে মাঝে লিখছেন। তাঁর সর্বশেষ বই শান্তিনিকেতন নিয়ে স্মৃতিকথা 'সব হতে আপন'। অসাধারণ বই। তাছাড়া তাঁর আঁকা ছবির বহু প্রদর্শনী হয়েছে দেশে-বিদেশে। প্রভূত প্রশংসা পেয়েছে শিল্পানুরাগীদের। তাছাড়া রান্নাবান্না এবং আতিথেয়তায় ছিলেন সবার সেরা। তাঁর হাতের ছবি এবং তাঁর হাতের রান্না দুই-ই অত্যন্ত আকর্ষক ছিল আমাদের কাছে। ডাকতাম রানীদি, কিন্তু মনে মনে বলতাম রানী-মা। তা-ই অনেক বেশি মানায়।

তাঁর হাতের ছবি এবং তাঁর হাতের রান্না দুই-ই অত্যন্ত আকর্ষক ছিল আমাদের কাছে। ডাকতাম রানীদি, কিন্তু মনে মনে বলতাম রানী-মা। তা-ই অনেক বেশি মানায়।

তাঁর স্বামী অনিলকুমার ছিলেন বহু গুণান্বিত। কবির সচিব বলে নয়, ইংরেজি ও বাংলা দুটো ভাষাতেই লেখার হাত ছিল চমৎকার। অ্যাকাসিয়া ছদ্মনামে তিনি নিয়মিত লিখতেন একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে। তাছাড়া 'দেশ' পত্রিকায় স্মৃতিকথামূলক কিছু রচনাও প্রকাশিত হয়। দুঃখের বিষয়, সেগুলো সব মিলিয়ে বই হয়ে বেরোল না।

অনিলদার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল বাকপটুত্ব। যে-কোনও পরিবেশে যে-কোনও ঘটনায় তিনি তাৎক্ষণিক এমন কথা বলতেন, যা উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে রাখতো। মনে আছে গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সরোজিনী নাইডু এসেছেন শান্তিনিকেতনে। অনিলদার কোনার্ক বাড়িতে আড্ডা চলছে। মান্যগণ্য অনেকেই উপস্থিত। তখন জার্মানিতে রানীদির একটি ছবির এক্সিবিশন চলছে। তিনি অনিলদাকে অনবরত খেপাচ্ছেন। হঠাৎ বললেন, 'অনিল, ইউ আর গুড ফর নাথিং। দেখেছো রানীর কেমন খ্যাতি। যেমন তেমন ছবি আঁকে, দেশ-বিদেশে ছবির এক্সিবিশন হয়। কত লোকে তাঁর বই পড়ে। আর তুমি? কিছুই না। গুড ফর নাথিং।' অনিলদা সব মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি যা বললেন, তার সবই সত্যি, আমি কে জানেন? আমি মিস্টার সরোজিনী নাইডু।'

অনিল কুমার চন্দ

> 'ম্যাডাম, আপনি যা বললেন, তার সবই সত্যি, আমি কে জানেন? আমি মিস্টার সরোজিনী নাইডু।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলের তুমুল হাসি। এমনকী সরোজিনী নাইডুও হাসলেন। সত্যিই তো, সরোজিনীর স্বামী ডঃ মুথিয়ালা গোবিন্দরাজুলুর নাম আমরা কজন জানি!

অবশ্য চাইলে অনিলদাও খ্যাতিমান লেখক হতে পারতেন। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সে হ্যারল্ড ল্যাস্কির এই ছাত্র অন্যদিকে খ্যাতিমান হলেও বাংলা সাহিত্যে ও ভাষায় তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল। লেখার হাতও ছিল চমৎকার। তাছাড়া বিশ্বভারতীর সেবায় সারা জীবন পাত করেছেন। আমরা যখন ছাত্র, তখন বলতাম আশ্রমে অ-সু-র রাজত্ব চলছে। অনিল চন্দ, সুরেশ কর ও রথীন্দ্র ঠাকুর— এই তিনজনের নামের আদ্যক্ষর নিয়েই ওই রসিকতা।

চিরাচরিত প্রথার বাইরে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ভদ্রলোক। আমরা বরাবর অনিলদা ও রানীদির স্নেহ পেয়ে এসেছি। একটা দুঃখ তবু থেকে গেল। এঁদের দুজনের বাক্সে অসাধারণ সব মূল্যবান জিনিস রয়েছে। 'শেষের কবিতা' ও 'চার অধ্যায়' বইয়ের পাণ্ডুলিপি, অবনীন্দ্রনাথের আঁকা বাল্মীকি প্রতিভার বহু দৃশ্যের ছবি, শান্তিনিকেতনের ছবি, রবীন্দ্রনাথের রচনা, জু পেয়ঁর আঁকা ছবি। এগুলো বাক্সবন্দি। মালিক তাঁদের নাতি প্যারিস প্রবাসী। বিশ্বভারতী অবিলম্বে সেগুলো কিনে নিক।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০

'শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'

মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল

দে বুক স্টোর, ১৩, *বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট*, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), ***স্টার মার্ক***-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

। পর্ব ২৮।

ক্ষিতিমোহন সেন

ক্ষিতিমোহন সেন

'গুরুদেব, আপনি তো শেলি পড়াচ্ছেন। ভালোই। কিন্তু কিটসের যন্ত্রণায় যে এখানে বসতে পারছি না।'

শান্তিনিকেতনের রেওয়াজমতো কেউ ওঁকে 'ক্ষিতিমোহনদা' বলতেন না। কেউ বলতেন 'ক্ষিতিদাদু', কেউ বলতেন ঠাকুরদা। প্রচণ্ড রসিক, কিন্তু কথাবার্তায় ও চেহারায় রাশভারী। চাম্বা রাজ্যের বড় চাকরি ছেড়ে ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ডাকে শান্তিনিকেতনে আসেন। আসেন পাঠভবনের রেক্টর হয়ে। এসেই প্রথমদিন ক্লাসে দেখেন একটি ছেলে খুব গন্ডগোল করছে। তিনি ওকে যেই মারতে গেলেন, অন্য একজন ছাত্র বলল — মশায়, জানেন না, আমাদের আশ্রমে মারা নিষেধ, গুরুদেবের নির্দেশে। তিনি তখন ছেলেটিকে শূন্যে তুলে ধরে বললেন, 'তুমি এখন আশ্রমের বাইরে। এই নাও এক চড়, এই নাও আর একটি'— দু-গালে দুটো থাবা বসিয়ে আবার ছেলেটিকে আশ্রমে নামিয়ে দিলেন। তারপর কোনও ছাত্র কোনওদিন ঘাঁটায়নি।

ক্ষিতিমোহনবাবুকে নিয়ে কত গল্প ছিল শান্তিনিকেতনে। অধিকাংশই তাঁর রসিকতার। 'গান' করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধকণ্ঠ। অমন অসাধারণ বাক্‌বৈদগ্ধ্যও আর কারও ছিল না। তাছাড়া শান্তিনিকেতন মন্দিরে আচার্যরূপে সব অনুষ্ঠানে ও প্রতি বুধবার তাঁর অনবদ্য ভাষণ ভুলবার নয়। তখন টেপ রেকর্ডারের এত চল ছিল না, তাই কেউ ওসব ভাষণ রেকর্ড করেনি, নইলে বোঝা যেত ব্যাপারটা ছিল কী অসাধারণ।

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথ নিজেও ক্লাস নিতেন। ছাত্র-অধ্যাপক— সবাই আসতে পারত। সেদিন তিনি শেলি পড়াচ্ছেন। অন্যতম ছাত্র ক্ষিতিমোহনবাবু। সবাই মাটিতে বসে আছেন। অনেকগুলো পোকা তখন আসন ফুঁড়ে ছাত্রদের জ্বালাতন করছিল। ক্ষিতিমোহনবাবু বললেন, 'গুরুদেব, আপনি তো শেলি পড়াচ্ছেন। ভালোই। কিন্তু কিটসের যন্ত্রণায় যে এখানে বসতে পারছি না।' বলেই হো- হো আসি। শিল্পী মুকুল দে তখন শান্তিনিকেতনের বাসিন্দা। তাঁর কথার দাপটে অনেকেই তখন থরহরি কম্পমান। সে কথা শুনে ক্ষিতিমোহনবাবু বললেন, 'আরে মুকুল ভালো হইব কী কইর‍্যা। ওর মূলের মাঝখানেই যে 'কু'। ক্ষিতিমোহনবাবুর পারিবারিক পেশা ছিল কবিরাজি। তিনি নিজেও কিছু জানতেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে তা হচ্ছে না। একদিন সখেদে বললেন, 'আরে, কবিরাজি করনের তো ইচ্ছা ছিল কিন্তু কবি রাজি হলেন না।' তিনি কলকাতায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, দেখেন একজন কেবল 'হাই' তুলে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'আর বক্তৃতা চলবে না। আমার সামনে একজন 'হাই-নেস' বসে আছেন। তিনি রাজকার্য থামালেই বক্তৃতা দেব।' 'হাই' থামল, বক্তৃতাও শুরু হল।

সেই ক্ষিতিমোহন সেন যৌবনটা কাটিয়েছেন পশ্চিম ভারত আর উত্তর ভারত ঘুরে ঘুরে। পায়ে হেঁটে মধ্যযুগীয় সন্তদের গান ও বাণী সংগ্রহ করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। আমি তখন শান্তিনিকেতনে কলেজে পড়াই। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের গোড়ায়। তিনি তখন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ পদ থেকে অবসর নিয়ে বাড়িতেই দিন কাটাচ্ছেন। একদিন আমার ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাই তাঁর বাড়িতে। দুপুরবেলা। সঙ্গে ছিল গুজরাট ও রাজস্থানের দুটি মেয়ে। তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন,

কোন গ্রামে বাড়ি। ওরা জবাব দিতেই বললেন, 'আচ্ছা, তোমার গ্রামের অমুক জায়গায় বটগাছটি আছে তো? অমুক গ্রামের মাঝখানে বড় দিঘি, তার পাশে একটি মন্দির। এখনও আছে কি? আছে, আছে। মেয়েটি অবাক! এত জানলেন কী করে? আসলে সারা আর্যাবর্ত ছিল তাঁর নখদর্পণে। সেই কারণেই অনায়াসে বই লিখেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। তাঁর 'দাদু' বইটি তো অসাধারণ। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে তাঁর 'হিন্দু মুসলমান ঐক্য' তো বারবার পড়ার মতো।

তাঁর অনেক গুণমুগ্ধ বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। যেমন প্রমথনাথ বিশী এবং সৈয়দ মুজতবা আলি। তিনি বই কম লিখেছেন বটে, কিন্তু মুখে মুখে বলেছিলেন অনেক বেশি। তিনি এ যুগের সর্বশেষ কথক। তিনি বেদ উপনিষদ গুলে খেয়েছেন এবং আউল বাউলদের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখতেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের মননে স্নিগ্ধ হয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনের নবরত্ন সভায় অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যরূপী রবীন্দ্রনাথের রাজসভায় তিনি ছিলেন বিশেষ স্থানাধিকারী। শান্তিনিকেতনে সব ঋতু-উৎসবে মন্ত্র ও অন্য উপকরণ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছিলেন তিনিই। তাছাড়া তিনি পারদর্শী ছিলেন সঙ্গীতেও।

আমরা ছাত্রাবস্থায় দেখেছি, তিনি বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন এবং ছোট্ট বাজারের থলি হাতে রোজ বিকেলে বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে দু-চারজন কৌতূহলী ছাত্র বা অধ্যাপক। তাঁদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন এবং দু-একটি রসিকতা করছেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

শান্তিনিকেতনে শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ

শেষজীবনে তিনি প্রায় অথর্ব হয়ে পড়েন। ১৯৫২ সালে তাঁর বিয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের দিন থেকে তিনি দাড়ি রাখা শুরু করেন। মাঝখানে অস্থায়ী উপাচার্য হয়েছিলেন বিশ্বভারতীর। কলকাতায় কবীর রোডে তাঁর একমাত্র ছেলের বাড়িতে এসে থাকতেন। আমিও প্রায়ই যেতাম ওই বাড়িতে তখন। কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠস্বরে অনেক কথা বলতেন। তাঁর নিজের কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা, আউল-বাউলদের কথা। উনি রসিকতা করে বলতেন, গুরুদেবের জন্মশতবার্ষিকীতে খরচ লাগবে মাত্র পঁচিশ টাকা— অর্থাৎ শতবারসিকি।

তিনি বর্ধমানের এক হাসপাতালে চলে গেলেন, শান্তিনিকেতন আর শান্তিনিকেতন রইল না।

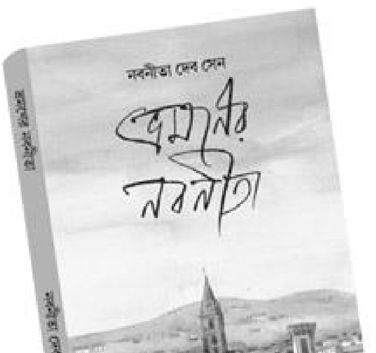

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

পনেরো

৪ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯৭১

আজ দশটার সময় আকবরের মায়ের সঙ্গে পাগলাপিরের বাসায় যাব। আকবরের মা বলেছেন ওঁর কাছে যেতে হলে কিছু একটা হাতে নিয়ে যেতে হয়। কেউ খালি হাতে গেলে খুব রাগ করেন। তাই আমিরুদ্দিকে পাঠিয়েছি মিষ্টি কিনে আনতে। এই অবসরে গত কয়েকদিনের খবর কাগজে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। গতকাল তো জামীর ডাকে খবর কাগজ দেখতে গিয়ে রাগে-দুঃখে কেঁদেকেটে একটা কেলেঙ্কারিই বাঁধিয়ে ফেলেছিলাম।

প্রদেশে এতদিনে বেসামরিক গভর্নর দিয়েছে। নতুন গভর্নর ডাঃ মালিকের হাসিমুখের ছবি ছাপা হয়েছে। নতুন সামরিক আইন প্রশাসকও দেওয়া হয়েছে— লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী।

একই সঙ্গে গভর্নর আর সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করে অবশেষে টিক্কা খান বিদায় নিয়েছে। গভর্নর হয়েই ডাঃ মালিক ঘোষণা করেছেন শিগগিরই মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হবে।

সামরিক বাহিনী আরও একটা জায়গায় হানা দিয়ে অনেক অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। নয়জনকে মেরেছে, একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ঢাকা থেকে তিন মাইল দূরে নাসিরাবাদ বস্তির একটা বাড়ি থেকে ১ সেপ্টেম্বর পাক আর্মি এই অস্ত্রশস্ত্র ধরেছে।

এখানেও 'দেশপ্রেমিক নাগরিকদের' কাছ থেকে খবর পেয়ে ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস— সংক্ষেপে ইপকাফের একটা দল এই অস্ত্র 'উদ্ধার' করে এবং যাদের মারে তারা হল 'ভারতীয় এজেন্ট'। ভাবছি কোন নজন মুক্তিযোদ্ধাকে ওরা মেরেছে? তাদের কেউ কি আমাদের চেনা? যাকে গ্রেপ্তার করেছে, সেও কি সেক্টর টুয়েরই কোনও মুক্তিযোদ্ধা? কে জানে? জানবার কোনও উপায়ই নেই।

৩১ আগস্টের দৈনিক পাকিস্তানের একটা খবরে চোখ আটকে গেল।

'মরতে যখন হবেই, তখন দেশের জন্যই মরি। বিশ বছর বয়স্ক পাইলট রশীদ মিনহাজ গত ২০ আগস্ট পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি বিমানকে জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছেন।'

এটা আবার কী ধরনের খবর? জোর করে ভারতে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস যিনি করেছেন তার নাম কই? কে তিনি? কী তাঁর পরিচয়?

পরবর্তী দিনগুলোর কাগজ ঘাঁটতে লাগলাম। ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেবল রশীদ মিনহাজের বীরত্বগাথার কাহিনি। বীরত্বের জন্য তাকে সর্বোচ্চ সম্মানসূচক খেতাব নিশানে হায়দার দেওয়া হয়েছে, তাকে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য নির্ধারিত গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে, তার বাপের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, তার চোদ্দোগুষ্ঠির কুষ্টি-কুলুজী বর্ণনা করা হয়েছে, অথচ কে বিমান হাইজ্যাক করলেন তাঁর নাম নেই!

৪ সেপ্টেম্বরে এসে নাম পেলাম। রশীদ মিনহাজের অমর বীরত্বগাথা নাম দিয়ে চার কলামজুড়ে এক নিবন্ধে রশীদের বীরত্ব, মহত্ত্ব, ত্যাগের অনেক ধানাই-পানাই করে বলা হয়েছে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এ কে এম মতিয়ুর রহমান

বলে আট বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক পাইলট বিমানটা হাইজ্যাক করার চেষ্টা করেন। পরিণামে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়ে দু'জনেই মৃত্যুবরণ করেন।

কে এই মতিয়ুর রহমান? কোন দেশি লোক? কিছুই বলেনি। বোঝাই যাচ্ছে কোনও দেশপ্রেমিক বাঙালি পাইলট একটি বিমান হাইজ্যাক করে ভারতে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। ভারতের আকাশে পৌঁছেছিল ঠিকই কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং দু'জনেই মৃত্যুবরণ করেছে। একজন সর্বোচ্চ বীরের খেতাব পেয়েছে, অন্যজনকে বলা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক। এই খবর দৈনিক পূর্বদেশ-এ 'বিশ্বাসঘাতকের নাম মতিয়ুর রহমান'— এই শিরোনামে ছাপা হয়েছে।

মুক্তিকামী বীর বাঙালি মতিয়ুর রহমান বিশ্বাসঘাতক? যদি কোনওদিন পূর্ব বাংলার এই ভূখণ্ড স্বাধীন হয়, তবে মতিয়ুর রহমান— সেই স্বাধীন দেশ নিশ্চয় তোমাকে সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক খেতাবে ভূষিত করবে।

এলিফ্যান্ট রোডের যে অংশটা রমনা থানার সামনে দিয়ে ঘুরে আউটার সার্কুলার রোড ক্রস করে ওয়ারলেস কলোনির দিকে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তায় ঢুকে রেললাইন ক্রস করে একটু এগোলেই বাঁয়ে পাগলাপির বাবার বাড়ি। আগে বোধহয় টিন ও বেড়া ছিল, এখন সামনের দিকের দু'তিনটে ঘর পাকা। সদ্য-সমাপ্ত, দেখেই বোঝা যায়। চারদিকে ইট, বালি, লোহা এলোমেলো পড়ে রয়েছে। একটা ঘরে সিমেন্টের বস্তার টাল, পিছনদিকে কাজ চলছে। বাবার কাছে দোয়াপ্রার্থী নারী-পুরুষের ভিড়ে চারদিক থইথই করছে।

আকবরের মা বলেছেন, 'বাবার খুব ক্ষমতা। দোয়া পড়ে ফুঁক দিয়ে শক্ত শক্ত অসুখ চোখের নিমেষে ভালো করে দেন। ওনার কাছে যে যা আর্জি নিয়ে আসে, তাই কবুল হয়। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বড় বড় মেজর, কর্নেল, জেনারেল সবাই ওনার কাছে আসেন দোয়া নিতে। দেখবেন, উনি ঠিক আপনার রুমীর খবর বের করে দেবেন।'

সেই আশাতেই তো এসেছি। এই একই আশা নিয়ে পাগলাপিরের কাছে এসেছেন রাজশাহীর ডি আই জি মামুন মাহমুদের স্ত্রী মোশফেকা মাহমুদ, এসেছেন রাজশাহীর এস পি শাহ আবদুল মজিদের স্ত্রী নাজমা মজিদ, এসেছেন চট্টগ্রামের এস পি শামসুল হকের স্ত্রী মাহমুদা হক, এসেছেন আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী ঝিনু মাহমুদ।

ঝিনু মাহমুদকে দেখে আমি চমকে গিয়েছি। ছোটখাটো চেহারার সোনারবরণী এক মেয়ে, পুতুলের মতো সুন্দর— কাঁদতে কাঁদতে চোখের কোণে কালি পড়ে গিয়েছে। এইটুকু মেয়ে, কতই

মুক্তিকামী বীর বাঙালি মতিয়ুর রহমান বিশ্বাসঘাতক? যদি কোনওদিন পূর্ব বাংলার এই ভূখণ্ড স্বাধীন হয়, তবে মতিয়ুর রহমান— সেই স্বাধীন দেশ নিশ্চয় তোমাকে সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক খেতাবে ভূষিত করবে।

বা বয়স, দেখে মনে হয় আঠারো-উনিশ। কোলে আড়াই বছরের মেয়ে শাওন। এই নবীন বয়সে ওর জীবনে এতবড় দুর্দৈব? ঝিনুর সঙ্গে পাগলা বাবার কাছে এসেছেন ঝিনুর মা, তার ছোট বোন শিমুল বিল্লাহ আর চার ভাই নুহেল, খনু, দীনু ও লীনু বিল্লাহ। শরীফ, জামী, মাসুমের কাছে এই চার ভাইয়ের কথা আগেই শুনেছি।

মোশফেকা মাহমুদকে আগে অল্পস্বল্প চিনতাম, তার মুখে শুনলাম, ২৬ মার্চ বাসায় মিলিটারি এসে মামুন মাহমুদকে ডেকে নিয়ে যায়। সেই যে গেল মামুন, আর ফিরে আসেনি। একই কাহিনি নাজমা মজিদের, মাহমুদা হকের।

এরা কেউ এদের স্বামীর খোঁজ জানে না। আমি জানি না আমার ছেলের খোঁজ। পাগলাপির বাবা সবাইকে আশ্বাস দিয়েছেন— এরা সবাই বেঁচেবর্তে আছে। উনি ঠিকই সকলের খোঁজ বের করে আনবেন।

৫ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭১

একটা কঠিন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে গত দু'দিন থেকে শরীফ আর আমি খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। রুমীকে কী করে বের করে আনা যায়, তা নিয়ে শরীফের বন্ধুবান্ধবরা নানারকম চিন্তাভাবনা করছে। এর মধ্যে বাঁকা আর ফকিরের মত হল: যে-কোনও প্রকারে রুমীকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। বাঁকা আর ফকির মনে করছে— শরীফকে দিয়ে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা মার্সি পিটিশন করিয়ে তদবির করলে রুমী হয়তো ছাড়া পেয়ে যেতেও পারে। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। সেটাও একটা আশার কথা।

রুমীর শোকে আমি প্রথম চোটে 'তাই করা হোক' বলেছিলাম। কিন্তু শরীফ রাজি হতে পারছে না। যে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রুমী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, সেই সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করলে রুমী সেটা মোটেও পছন্দ করবে না এবং রুমী তাহলে আমাদের কোনওদিনও ক্ষমা করতে পারবে না। বাঁকা ও ফকির অনেকভাবে শরীফকে বুঝিয়েছেন— ছেলের প্রাণটা আগে। রুমীর মতো এমন অসাধারণ মেধাবী ছেলের প্রাণ বাঁচলে দেশেরও মঙ্গল। কিন্তু শরীফ তবু মত দিতে পারছে না। খুনি সরকারের কাছে রুমীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে দয়াভিক্ষা করা মানেই রুমীর আদর্শকে অপমান করা, রুমীর উঁচু মাথা হেঁট করা। গত দু'রাত শরীফ ঘুমোয়নি, আমি একবার বলেছি, 'তোমার কথাই ঠিক। ওই খুনি সরকারের কাছে মার্সি পিটিশন করা যায় না।' আবার খানিক পরে কেঁদে আকুল হয়ে বলেছি, 'না, মার্সি পিটিশন করো।'

এভাবে দ্বিধাদ্বন্দ্বে কেটেছে দু'দিন দু'রাত। শেষপর্যন্ত শরীফ সিদ্ধান্ত নিয়েছে— না, মার্সি পিটিশন সে করবে না। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে আমিও শরীফের মতকে সমর্থন করেছি। রুমীকে অন্যভাবে বের করে আনার যতরকম চেষ্টা আছে, সব করা হবে; কিন্তু মার্সি পিটিশন করে নয়।

৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭১

আজাদের মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করছে। এ কয়দিন তাল করে উঠতে পারিনি। আজ বেলা এগারোটার দিকে গেলাম। আজাদের মা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন, বললেন, 'বইন গো, কী সর্বনাশ হয়া গেল আমাদের। আপনের রুমীরেও তো লয়া গিয়েছে শুনছি।'

'হ্যাঁ আপা, বাড়িসুদ্ধ সবাইকেই নিয়ে গিয়েছিল। দু'দিন-দু'রাত পর রুমী ছাড়া বাকিরা ফিরে এসেছে।'

বাড়িটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে। খাট ভেঙে পড়ে আছে, লোহার আলমারির পাল্লা ছ্যাঁদা হয়ে গিয়েছে বুলেটে,

দেওয়ালে জায়গায় জায়গায় রক্তের ছিটে শুকিয়ে খয়েরি হয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করে করে পুরো ঘটনাটা শুনলাম আজাদের মার মুখ থেকে।

২৯ আগস্টের রাতে তার বাসাতে অনেক লোক ছিল। বোনের ছেলে জায়েদ, চঞ্চল এরা তো থাকতই, তাছাড়াও অন্য জায়গা থেকে বেড়াতে এসেছিল আরেক বোনের ছেলে টগর, বোন-ঝি জামাই মনোয়ার। জুয়েল, কাজী, বাশার এরা তিনজন ছিল। আর কপাল মন্দ সেকেন্দার হায়াত খানের— জয়েন্ট সেক্রেটারি এ আর খানের ছেলে— আজাদের বন্ধু, সে রাতে এ বাসাতেই ছিল।

রাতদুপুরে ঘুম ভেঙে সবাই দেখে আর্মি সারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। এঘর-ওঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বোঝা যায় সামনে, দু'পাশে ছাদে সর্বত্র মিলিটারি। ভেবেছিল পিছনদিকে মেথরের রাস্তাটায় নিশ্চয় কেউ নেই, ওদিক দিয়ে পালানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। জায়েদ হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কোনওমতে মেথর আসার চিকন দরজাটার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে খুলতেই গলি থেকে কয়েকজন আর্মি উঠে এসে ঢোকে বাড়িতে। তারা ঘরে ঢুকে সামনের দরজা খুলে দেয়— সেদিক দিয়ে আরও মিলিটারি পুলিশ সব ঘরে ঢুকে পজিশন নিয়ে দাঁড়ায়। জুয়েলের দুটো আঙুলে তখনও একটুখানি ব্যান্ডেজ বাঁধা ছিল, ক্যাপ্টেন সেই আঙুল দুটো ধরে দুমড়ে ভেঙে দেয়। জুয়েল 'মা-গো' বলে একটা প্রাণঘাতী চিৎকার দিয়ে ওঠে। আর তখনই ঘটে যায় সেই কাণ্ডটা। কাজী হঠাৎ ক্যাপ্টেনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন টাল সামলাতে না পেরে খাটের ওপর পড়ে যায়। কাজী পড়ে তার ওপর। দু'জনের আছড়ে পড়ার ভারে খাট ভেঙে যায়। কাজী ক্যাপ্টেনের স্টেন ধরে টানাটানি করতে থাকে। সেপাইরা ভাবতেও পারেনি এইরকম কিছু ঘটতে পারে। তারা ভয় পেয়ে এলোপাথাড়ি গুলি করতে থাকে। গুলিতে ভীষণ রকম জখম হয় জায়েদ আর টগর। এর মধ্যে ধস্তাধস্তি করতে করতে কাজী পালিয়ে যায়— টানাটানির চোটে তার লুঙ্গি খুলে যায়। সেই অবস্থাতেই সে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

কাজীকে ধরতে না পেরে খানসেনাদের সব রাগ গিয়ে পড়ে বাড়ির বাকি লোকদের ওপর। মারের চোটে আজাদের নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে, বাশারের বাঁহাত কবজি আর কনুইয়ের মাঝে দু'টুকরো হয়ে ভেঙে যায়, জুয়েলের আঙুল তো আগেই ভেঙেছিল, এখন নাকমুখ দিয়ে রক্ত বেরতে থাকে, মনোয়ার, সেকেন্দারও প্রচুর মার খায়।

তারপর গুলিবিদ্ধ, অচেতন জায়েদ আর টগরকে রক্তের স্রোতের মধ্যে ফেলে

'বইনরে। বড্ড মারছে আমার আজাদরে। আমি কইলাম বাবা কারও নাম বলো নাই তো? সে কইল, 'না মা, কই নাই। কিন্তু মা যদি আরও মারে? ভয় লাগে যদি কইয়া ফেলি?' আমি কইলাম, 'বাবা, যখন মারবো, তুমি শক্ত হইয়া সহ্য কইরো।'

বাকিদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে খানসেনারা চলে যায়। চোখের সামনে এরকম পৈশাচিক কাণ্ডকারখানা দেখে আজাদের মায়ের হুঁশ ছিল না বহুক্ষণ। চেতনা ফিরলে দেখেন ভোর হয়ে আসছে। দেখেন রক্তে থইথই মেঝেতে দুটি প্রাণী তখনও অজ্ঞান। তিনি পাশের বাসায় গিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ফোন করেন অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার জন্য। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসে না। তিনি হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ফোন করেন, কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসে না। এই করতে করতে সকাল আটটা-নটা হয়ে যায়। তখন তিনি নিরুপায় হয়ে রিকশা করে ইন্টারকনের সামনের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসেন। জায়েদ, টগরকে অনেক কষ্টে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তোলা হয়। তিনি ড্রাইভারকে মেডিক্যাল কলেজে যেতে বলেন। ড্রাইভার তাকে পরামর্শ দেয় মেডিক্যালে না নিতে। কারণ মেডিক্যালে মিলিটারি ভর্তি। তারা গুলিবিদ্ধ পেসেন্ট দেখলে গুম করে ফেলবে। তখন আজাদের মা হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে যান।

হোলি ফ্যামিলিতে জায়েদ, টগর এখনও সঙ্কটজনক অবস্থায় রয়েছে। জায়েদ ছদিন অজ্ঞান ছিল। আজাদের মা স্টিল আলমারির পাল্লা দুটো খুলে দেখালেন স্টেনের গুলি পাল্লা ফুটো করে পিছনের লোহার পাত ফুটো করে ঘরের দেওয়ালে গিয়ে বিঁধেছে। ভাঙা খাট যেভাবে ছিল, সেভাবেই পড়ে আছে। মেঝের চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে, সেগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়নি। কে করবে? তিনি তো একদিকে নিজের ছেলের শোকে কাতর, অন্যদিকে আহত বোনের ছেলে দুটোর জন্য হাসপাতালে দৌড়োদৌড়ি করছেন। এই আটদিনে ওর চেহারাও শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, চুলে তেল নেই, পরনের কাপড় ময়লা। ঘরের দিকে, নিজের দিকে তাকাবার এক মুহূর্ত ফুরসত নেই ওঁর।

আজাদের মা জিজ্ঞেস করলেন, 'রুমীর কোনও খবর করতে পারলেন বইন?'

'না আপা, এখনও কোনওদিকে কোনও সুরাহাই করতে পারছি না। পাগলাপির বাবা ভরসা দিয়েছেন উনি রুমীকে বের করে এনে দেবেন। আপা, আপনি যাবেন ওঁর কাছে? খুব ক্ষমতাবান পির উনি। ক্যান্টনমেন্ট থেকে বড় বড় জেনারেলেরা পর্যন্ত ওর কাছে আসে।'

'না বইন, আমার পির সাহেব আছেন জুরাইনে, আমি গিয়েছি তেনার কাছে। আল্লায় দিলে আজাদ আমার ছাড়া পায়া যাইব। আমি রমনা থানায় আজাদের লগে দেখা করছি।'

আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে চলে এল। আজাদের সঙ্গে দেখা করতে দিয়েছে।

'না বইন। অরা দেখা করতে দেয় নাই। রাইতে রমনা থানায় আইনা রাখে, আমাদের চিনা এক লোক সিপাইরে ঘুষ-মুষ দিয়া কেমন কইরা জানি বন্দোবস্ত করছিল, রাইতে লুকাইয়া জানালার বাইরে দাঁড়ায়া কথা বলছি।'

'কী কথা বললেন? কেমন আছে আজাদ?'

'বইনরে। বড্ড মারছে আমার আজাদরে। আমি কইলাম বাবা কারও নাম বলো নাই তো? সে কইল, 'না মা, কই নাই। কিন্তু মা যদি আরও মারে? ভয় লাগে যদি কইয়া ফেলি?' আমি কইলাম, 'বাবা, যখন মারবো, তুমি শক্ত হইয়া সহ্য কইরো।'

৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

বিকেলবেলা পাগলা বাবার ভেতরের ঘরে খুব মন খারাপ করে বসেছিলাম। আমার চারপাশ ঘিরে বসেছিল লালু, মা, ঝিনু, শিমুল, ওদের মা, মোশফেকা মাহমুদ, তার মা, মাহমুদা হক, নাজমা মজিদ এবং আরও অনেকে। পাগলা বাবা পাশের ঘরে পুরুষদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি সবাইকে আজাদের মায়ের কাহিনি বলছিলাম। শুনে প্রায় সকলের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল। খানিক পরে শিমুলের একটা কথায় ভয়ানক চমকে গেলাম। গত তিনদিন থেকে নাকি আলতাফ মাহমুদ আর বদিকে রাতে রমনা থানায় আনছে না। ওদের তাহলে কী হল? আমি শিমুলকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কার কাছে শুনলে এ কথা?'

'চুল্লু ভাইয়ের ভাবীর কাছে।'

চুল্লুর ভাবী ইশরাতও পাগলা বাবার কাছে

আসে। তার কাছ থেকে আমরা মাঝে মাঝে রমনা থানার ছিটেফোঁটা জানতে পারি। চুল্লুর ভাইয়ের সঙ্গে এক ডি আই জি সাহেবের বেশ ভালো জানাশোনা আছে। তার মারফত রমনা থানার বন্দিদের কিছু কিছু খবর চুল্লুর ভাই-ভাবী পান।

ঝিনু অঝোরে কাঁদছে। আমার মা তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। আমি গুম হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম রমনা থানায় না আনার অর্থ কী? শরীফ, জামীরা যখন আলতাফ মাহমুদকে দেখে তখনই তার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তবে কি আলতাফ মাহমুদ মরে গিয়েছেন? নাকি ওরা গুলি করে শেষ করে দিয়েছে? বদিরও কি তাই হয়েছে? জামী ফিরে এসে বলেছিল বদি নাকি ভয়ানক উতলা হয়ে থাকত। খালি বলত, 'আমি আর বাঁচতে চাই না। আমি আত্মহত্যা করব।' একবার সে ঘরের প্লাগপয়েন্টে আঙুল ঢুকিয়ে ইলেক্ট্রিক শক খেয়ে মরতে চেয়েছিল। আরেকবার হঠাৎ দৌড় দিয়েছিল এই আশায় যে দৌড়োতে দেখলেই খানসেনারা ওকে গুলি করবে। কিন্তু খানসেনারা খুব সেয়ানা। ওরা বুঝে গিয়েছিল চারধারে এত পাহারার মাঝখানে খালি হাতে দৌড় দেওয়ার কী অর্থ। গুলি না করে কয়েকজন খানসেনা তিনদিক থেকে এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলে।

রুমীকে কখনই রমনা থানায় আনেনি কেন? আনলে তবু তো ছিটেফোঁটা কিছু খবরও পেতাম। কোথায় রেখেছে তাকে, কীভাবে রেখেছে— ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে মাথা ঘুরে যায়। কী করব আমি? কেউ কোনও খবর বের করতে পারছে না। পাগলা বাবা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন— শিগগিরই তিনি রুমীর খবর বের করে আনবেন। কিন্তু কবে?

পাগলা বাবা ভেতরের ঘরে এলে আমরা তাকে আলতাফ মাহমুদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ঝিনু কেঁদে তার পায়ের ওপর পড়ল। ঝিনুর মা কাঁদতে লাগলেন। আমরা সবাই নিজের নিজের হারানো প্রিয়জনের কথা মনে করে কাঁদতে লাগলাম। পাগলা বাবা ধমক দিয়ে সবাইকে থামিয়ে দিলেন, বললেন, 'তোরা কোথা থেকে কী সব ভুল-ভাল আবোল-তাবোল কথা শুনে মাতম করিস! আমি বলছি আলতাফ সহি-সালামতে আছে। শিগগিরই তার খবর পাবি। বাকিরাও সবাই ভালো আছে। তোরা সবাই খবর পাবি ঠিক সময়ে। আমি তো চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রাণপণে।'

৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

প্রতি বৃহস্পতিবারে পাগলা বাবার আস্তানায় মিলাদ-মাহফিল হয়। এখানে আজ সকাল থেকে পাগলা বাবা রুমী, আলতাফ মাহমুদ, মামুন মাহমুদ, আবদুল মজিদ, শামসুল হক, ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর— সকলের জন্য কোরান খতম শুরু করিয়েছেন। মিলাদের জন্য দশ সের অমৃতি এনেছি। অন্যরাও ওইরকম পরিমাণ মিষ্টান্ন এনেছে। বাদ আছর মিলাদের সময় প্রচুর লোক হয়। পিছনদিকে বিরাট একটা বেড়ার ঘর আছে— নামাজের জন্য জামাতঘর, সেইখানে পাগলা বাবা নিজে মিলাদ পড়ান। মেয়েরা এদিককার পাকা ঘরে বারান্দায় বসে। বাবা আমাদের সবাইকে বলেছেন তিনি জায়নামাজে বসে খাস দেলে ধ্যান করে জেনেছেন রুমী, আলতাফ, মামুন— ওরা সবাই বেঁচে আছে। তিনি শিগগিরই ওদের সবাইকে বের করে আনবেন। আমাদের শুধু একটুখানি ধৈর্য ধরতে হবে, আল্লার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে, পাগলা বাবার ওপর ভরসা রাখতে হবে।

বাবা বাড়িতে এসে দোতলায় রুমীর ঘরে গিয়ে দুরাকাত নামাজ পড়লেন, সালাম ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চোখ বুজে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রইলেন। তারপর বললেন, 'একটুও ঘাবড়াসনে। সে ভালো আছে। শিগগিরই তাকে বের করে আনব।'

পাগলাপিরের কথামতোই চলছি। সেই সঙ্গে আত্মীয়স্বজন যে যা বলছে তাই করে চলেছি। একজন বললেন, রুমীর নামে একটা খাসি কোরবানি দাও— জানেন সদকা। তাই দিলাম। পরশুদিন একটা খাসি কিনে এনে বাড়িতে কোরবানি দেওয়া হল। আকবরের বাবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খাসিটা নিজের হাতে জবাই করলেন। কিছু গোশত ফকিরদের বিলানো হল, বাকিটা এতিমখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওইদিন দুপুরের পর পাগলা বাবার আস্তানায় খতমের দোয়া ও মোনাজাত করা হল রুমীর জন্য। বাবার নির্দেশে সাত সের অমৃতি নিয়ে গিয়েছিলাম। দু'সের আলাদা করে বাবা দোয়া পড়ে দম করে দিয়েছিলেন পাড়ায় বিলোবার জন্য।

ইস্টার্ন ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের জি এম আমিনুর রহমান সাহেব নিয়মিত পাগলাপিরের কাছে যান। তিনি শরীফ, ফকির এবং মিনিভাইয়ের বন্ধু। ওঁকে ধরে গতকাল পাগলা বাবাকে বাসায় আনিয়েছিলাম। বাবা বাড়িতে এসে দোতলায় রুমীর ঘরে গিয়ে দুরাকাত নামাজ পড়লেন, সালাম ফিরিয়ে খানিকক্ষণ চোখ বুজে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রইলেন। তারপর বললেন, 'একটুও ঘাবড়াসনে। সে ভালো আছে। শিগগিরই তাকে বের করে আনব।'

মিলাদের পর বেশির ভাগ লোক চলে গিয়েছেন। আমরাও যাওয়ার উদ্যোগ করতে পাগলা বাবা বসতে বললেন। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। আরও লোকজন চলে গেলে বাবা আমাকে আর শরীফকে ডাকলেন, বললেন, রুমীকে বের করে আনার একটা ব্যবস্থা তিনি করেছেন। জামাতঘরে একজন পাঞ্জাবি সার্জেন্টকে বসিয়ে রেখেছেন। এর সঙ্গে তিনি আগেই কথাবার্তা বলে নিয়েছেন। সার্জেন্টটি খবর বের করেছে রুমীকে কোথায় রাখা হয়েছে। আমরা দু'জন যদি তাকে গাড়িতে উঠিয়ে এখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে যাই, তাহলে সে রুমীকে বের করে আমাদের গাড়িতে তুলে দেবে। কথাটা অন্য কাউকে যেন না বলি। কারণ সকলের জন্য এরকম বিশেষ ব্যবস্থা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রুমীর জন্যই তিনি অনেক খাঠখড় পুড়িয়ে এই গোপন ব্যবস্থাটা করেছেন।

ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত এবং অবিশ্বাস্য যে শোনামাত্র আমাদের তাক লেগে গেল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল— আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম, 'যাব, এক্ষুনি যাব।' শরীফের প্রতিক্রিয়া হল সম্পূর্ণ উল্টো। সে বলল, 'এক্ষুনি যাওয়া সম্ভব নয়। একটু অসুবিধে আছে। কাল আপনাকে জানাব।' শরীফের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, যাতে আমি আর কোনও কথা না বলে চুপ করে গেলাম।

বাড়ি ফেরার পথে গাড়িতেই শরীফ আমাকে বোঝাল— এভাবে ক্যান্টনমেন্টে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। ওখানে ঢোকার পর খানসেনারা আমাদের দু'জনকে মেরে গাড়িটা গুম করে দিলে আমাদের আত্মীয়বন্ধুরা কোনওকালেও খুঁজে বের করতে পারবে না আমাদের কী হল।

১১ সেপ্টেম্বর শনিবার ১৯৭১

ভারবাহী গর্দভের মতো দিনগুলো টেনে নিয়ে চলেছি। ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময় পাগলা বাবার বাসায় যাই। ঘণ্টাদুয়েক পরে ফিরে এসে শরীফ শেভ, গোসল করে নাশতা খেয়ে অফিসে যায়। আমরা সংসারের কাজে লেগে যাই। লালুর সাংঘাতিক এক মাথা ধরার

ব্যারাম আছে— মাইগ্রেন। বাবা বলেছেন লালুর মাথা ঝেড়ে তিনি ফুঁক দেবেন ফজরের নামাজেরও আগে। তার জন্যই এরকম ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটায় যাওয়া।

গতকাল থেকে মা আর আতাভাই আরেক দফা কোরান খতম শুরু করেছেন। আতাভাই এক থেকে পনেরো পারা, মা ষোলো থেকে শেষ পারা পড়বেন। এটা ওরা শেষ করবেন আগামী বৃহস্পতিবার। এই কোরান খতমের শেষে দোয়া পাঠ করানো হবে পাগলা বাবাকে দিয়ে— তাঁর সাপ্তাহিক মিলাদের মাহফিলে।

এত ভোরে উঠে শরীফ ক্লান্ত। নিজের হাতে সংসারের সমস্ত কাজ করা— কারণ বারেকও চলে গিয়েছে। বিকেলে আবার পাগলা বাবার আস্তানায় যাওয়া। এর মধ্যে নানা ধরনের দোয়া, আমল, খতম। এর মধ্যেও চমক— দেড়টার সময় হঠাৎ আবুর ফোন।

আবু— পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের উইং কমান্ডার মাহবুবুর রহমান— সে তো করাচিতে রয়েছে বলেই জানতাম। তার ফোন পেয়ে অবাক হলাম, 'তুমি ঢাকায় কী করছ? কবে এসেছ?'

'বাসায় আছো তো? এসে সব বলছি।'

আবু ১৯৪৪-৪৮ সালে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শরীফের সঙ্গে পড়ত। সেই থেকে বন্ধুত্ব। আবুর কোনও বড় বোন ছিল না। তাই সে আমার সঙ্গে বুবু পাতায়। সেই থেকে আমি তার সবগুলো ভাইবোনের বুবু।

আবু বাসায় এসে এক চমকপ্রদ, অবিশ্বাস্য কিন্তু খাঁটি সত্য কাহিনি শোনাল।

গত দু-মাস পাঁচ দিন ধরে ঢাকায় সে সামরিক জান্তার বন্দিশালায় বন্দি জীবনযাপন করেছে। আজকে তাকে ছেড়েছে, আগামীকাল দুপুরের ফ্লাইটে তাকে করাচি যেতে হবে। সেখানে তার বউ-ছেলে-মেয়ে রয়েছে— তারা জানে যে, আবু ঢাকায় এয়ারফোর্সের যে ইস্ট ওয়েস্ট কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ইনস্টলেশান আছে, সেটা মেরামত করতে ঢাকা গিয়েছে। ১৯৬৭ সালে আবুই এয়ারফোর্সের ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ঢাকায় ওই মাল্টিচ্যানেল রেডিও-টেলিফোন-টেলিপ্রিন্টার লিঙ্ক ইনস্টল করেছিল। আবুকে করাচিতে বলা হয়, ঢাকায় ওই লিঙ্ক ইকুইপমেন্ট ঠিকমতো চলছে না। যেহেতু তুমি ওটা বসিয়েছিলে, অতএব তুমি ছাড়া আর কেউ ওটা ঠিকমতো মেরামত করতে পারবে না।

তেজগাঁ এয়ারপোর্টে নামার পর আবুকে জানানো হয় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার অপরাধ সম্বন্ধে বলা হয় সে এ বছরের প্রথমদিকে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রে শেখের কাছে কিছু গোপন খবর দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল।

> অবাক হই সারা বাংলাদেশের যত ছোবল-খাওয়া লোক— সব যেন আসে এখানে! এতগুলো লোক প্রিয়জন হারানোর দুঃখে মুহ্যমান, এদের মধ্যে বসে নিজের পুত্রশোকের ধারটা কমে যায় অনেকখানি। এক ধরণের সহমর্মিতায় মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। সবাইকে মনে হয় আত্মার আত্মীয়, মনে হয় সবাই মিলে আমরা একটি পরিবার।

এরপর আবুর ওপর শুরু হয় নির্যাতন। এয়ারপোর্টের উল্টোদিকে যে এয়ারফোর্স অফিসার্স মেস, তার পিছনদিকে কাঁঠাল বাগানে একটা জায়গায় আবুকে নিয়ে রাখে। ব্যারাকের মতো ঘর, টিনের ছাদ, পাঁচ ইঞ্চি পাকা দেওয়াল, চারধারে ডবল কাটাতারের বেড়া। এখানে ওকে রাখে একটা ছোট ঘরে— একদম একা। ওকে বলা হয় আমরা তোমার সম্বন্ধে সব জানি। কিছু গোপন করে লাভ হবে না। যা জান, যা করেছ, সব বলবে।'

এখানে তেরোদিন নির্জন ঘরে একাকী রাখার পর একরাতে আবুকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যায় অন্য একটা জায়গায়— শেরে বাংলা নগরে ফিল্ড ইন্টারোগেশান ইউনিটে। এখানে কাটে তেরোটা দিন। এই তেরোদিন আবুকে ঘুমোতে দেওয়া হয়নি, শুতে দেওয়া হয়নি, কড়া বাতি চোখের সামনে জ্বালিয়ে অনবরত ইন্টারোগেশান চলেছে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, এলোপাতাড়ি প্রশ্ন, এলোমেলো প্রশ্ন— কয়েকঘণ্টা প্রশ্ন করে, তারপর কাগজ-কলম দিয়ে বলে, লেখো, যা জান সব লেখো। লেখা পছন্দ না হলে নির্যাতন। বেশ খানিক নির্যাতন করে লেখা কাগজ ছিঁড়ে ফেলে আবার লিখতে বলে।

এরপর তাকে এয়ারপোর্টের উল্টোদিকে প্রাদেশিক সংসদ ভবনের কাছে একটা বাড়িতে নিয়ে রাখে কয়দিন, আবার ফেরত নেয় কাঁঠাল বাগানের ব্যারাকে। সব জায়গাতেই অমানুষিক নির্যাতনের পর শেষমেষ আবুর স্টেটমেন্ট নেওয়া শেষ হয়।

আজ আবুকে ছেড়েছে। প্রথমে সে তার চাচার বাসায় গিয়েছিল। গিয়ে দেখে চাচার বাসায় বিহারি দারোয়ান বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে। চাচা পাড়ার পিস কমিটির মেম্বার। সেখানে ঘণ্টাখানেকও বসেনি, চলে এসেছে এখানে।

আমি বললাম, 'তোমার চেহারা একদম খারাপ হয়ে গিয়েছে। খুব লাঠিপেটা করেছে না?'

'না, আমাকে কিন্তু লাঠি দিয়ে তেমন পেটায়নি। সবাইকে ওরা একইরকমের টর্চার করে না। ওরা দেখে কার কীরকম স্ট্যামিনা, কার কীরকম সহ্য করার ক্ষমতা, কে অল্পেই ঘাবড়ে যায়, কে নার্ভাস, কে স্টেডি। বন্দির সাইকোলজি বুঝে ওদের টর্চারের হেরফের হয়। তাছাড়া একজন সিনিয়ার মিলিটারি অফিসার হিসেবে আমার ফিজিক্যাল ফিটনেস ছিল পুরোপুরি। তাই ওরা অনেক অত্যাচার করেও আমাকে কাবু করতে পারেনি। তোমরা তো জান আমি চিরকাল যোগব্যায়াম করেছি, হেডস্ট্যান্ড করেছি।'

'জানি না? রুমীকে হেডস্ট্যান্ড করা তুমিই তো শিখিয়েছিলে। রুমী যোগব্যায়ামও তো শুরু করে তোমার কাছেই।'

'ওরা প্রথম প্রথম আমার ওপর কয়েকটা গতানুগতিক অত্যাচার করে দেখে আমার কিছুই হয় না। তখন ওরা অন্যরকম টর্চার করে আমাকে কাবু করতে চাইল। ফ্যানের সঙ্গে পা বেঁধে মাথা নীচে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখল। আমার হেডস্ট্যান্ড করা অভ্যেস ছিল বলে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ওঠেনি। ওরা পরপর তিন রাত— প্রত্যেকবার ঘণ্টাতিনেক করে এভাবে ঝুলিয়ে দেখল, আমার কিচ্ছু হয় না, তখন ওরা এটা বাদ দিল। আসলে যে-কোনও প্রকারে আমার মনোবল ভেঙে দিয়ে আমার কাছ থেকে ওদের ইচ্ছেমতো স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেওয়াই ওদের উদ্দেশ্য ছিল। আমিও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম— একদম প্রথমে যা বলেছি, শেষ পর্যন্ত তাই বলে যাব। প্রথমদিন কাগজে যা লিখেছি, শেষপর্যন্ত তাই লিখে যাব।'

অত্যাচারের চোটে আবুর হাতের আঙুলের গিঁঠগুলো মচকে গিয়েছে, কোমরে অসম্ভব ব্যথা। সামনে ঝুঁকতে পারে না, বসলে উঠতে পারে না, উঠলে বসতে পারে না। শরীফ, জামী, মাসুম তিনজনেই তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে তাদেরও প্রত্যেকের ঘাড়ে, কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা, তাদেরও হাতের আঙুল মুঠ করতে, হাঁটু ভাঁজ করতে বিষম ব্যথা লাগে।

একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ থেকেই গলার কাছে

উশখুশ করছিল, করব কী করব না করে অনেকক্ষণ গেল, শেষমেষ করেই ফেললাম, 'এমনকি কোনও টর্চার আছে, যাতে শরীরের কোথাও কাটবে না, ভাঙবে না, কিন্তু ভেতরটা চুরচুর হয়ে যাবে?'

'আছে বইকি, অনেকরকম আছে। যেমন একটা হল সকিং। মোজার মধ্যে বালি ভরে মারলে শরীরে কোথাও দাগ পড়বে না কিন্তু মারের চোটে মনে হবে শরীরের সমস্ত মাংস—'

জামী চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, আবার? মামা প্লিজ, বলবেন না। মা, ওইসব শুনবে, তারপর কাঁদতে কাঁদতে ফিট হবে।'

১২ সেপ্টেম্বর রবিবার ১৯৭১

মন খুব খারাপ। আবু এয়ারপোর্টের উদ্দেশে বাসা থেকে গেল এগারোটার দিকে। সকালে উঠে পরোটা করে ডিম, মিষ্টি, গোশত ভুনা দিয়ে যতটা সম্ভব ভারী নাশতা খাইয়ে দিয়েছি আবুকে। করাচির প্লেন কটায় ছাড়বে আবু জানে না, তার ওপর নির্দেশ ছিল বারোটার মধ্যে তেজগাঁও এয়ারপোর্ট পৌঁছনোর।

গতকাল বিকেলে আবুকে পাগলাপিরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাবার পায়ের কাছে পঞ্চাশ টাকার একটি নোট রেখে সালাম করার কথা আবুকে আগেই বলে দিয়েছিলাম। বাবা আবুকে খুব খাতির করে কথাবার্তা বললেন, দোওয়া করলেন, তার কোমরে ফুঁক দিয়ে দিলেন।

কাল রাতে প্রথমে নীচতলায় ডাইনিংরুমের চৌকিটায় আবুর জন্য বিছানা করেছিলাম। খানিক পরে উপলব্ধি করলাম আবু একা একা নীচতলায় থাকার চিন্তায় খুব স্বস্তি পাচ্ছে না। তখন ওকে আমাদের বেডরুমে নিয়ে গেলাম। খাটের ওপর আবু আর শরীফকে দিয়ে আমি মেঝেতে তোষক পেতে শুলাম। কিন্তু ঘুম তেমন হল না। অনেকক্ষণ কথাবার্তা, তারপর নামাজ, কোরান শরীফ পড়া, তারপর শুয়ে শুয়ে আবার কথাবার্তা। ভোরের দিকে অল্প একটুখানি ঘুম।

মাত্র বিশ ঘণ্টার জন্য এসে আমাদের দুঃখক্লিষ্ট জীবনে একটুখানি আলোড়ন তুলে আবু চলে গেল তার অজানা, অনির্দিষ্ট ভাগ্যের পথে। কে জানে, করাচিতে তার জন্য কী অপেক্ষা করছে। আমরা জানি না সামনের দিনগুলোতে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করেছে।

১৩ সেপ্টেম্বর সোমবার ১৯৭১

রুমীর কোনও খবর নেই। প্রতিদিন পাগলা বাবার কাছে যাচ্ছি, তার পায়ের ওপর পড়ে কান্নাকাটি করছি। তিনি বেশিরভাগ সময় চুপ করে ধ্যানে বসে থাকেন, কোনও কথা বলেন না। বেশি চাপাচাপি করলে বিরক্ত হন। তবু

> 'আমার মনে হয় শেখকে মারতে ওরা সাহস পাবে না, এমনিতেই ওদের এখন ছ্যারাব্যারা অবস্থা, এ সময় শেখকে মারলে আরও যে গভীর গাড্ডায় পড়বে, সেটুকু বুদ্ধি ওদের আছে।'

আমরা সবাই পাগলাপিরের আস্তানায় ধরনা দিয়ে বসে থাকি— আমি, মা, লালু, মোশফেকা মাহমুদ, তার মা ঝিনু মাহমুদ, শিমুল বিল্লাহ, তাদের চার ভাই, তাদের মা, নাজমা মজিদ, মাহমুদা হক। ধরনা দিয়ে বসে থাকেন চট্টগ্রামের অ্যান্টিকরাপসান ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর নাজমুল হকের স্ত্রী, বরিশালের এ ডি সি আজিজুল ইসলামের স্ত্রী, কুমিল্লার ডি সি শামসুল হক খানের স্ত্রী, রাজশাহীর সিনিয়ার রেডিও ইঞ্জিনিয়ার মহসীন আলীর স্ত্রী, চট্টগ্রামের চিফ প্লানিং অফিসার রেলওয়ে, শফী আহমদের স্ত্রী, পিরোজপুরের এস ডি পি ও ফরিদুর রহমান আহমদের স্ত্রী, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ৪০ ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সি ও লেঃ কর্নেল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের ফিল্ড ইন্টেলিজেন্সের মেজর আনোয়ারুল ইসলামের স্ত্রী এবং এরকম আরও বহু। এঁদের সকলেরই স্বামী নিখোঁজ। আমরা পরস্পরের দুঃখের কাহিনি শুনি, কাঁদি, দোয়া-দরুদ পড়ি, আবার নিজেদের মধ্যে দুঃখের কথা নিয়ে আলোচনা করি, আবার কাঁদি। এত লোক আসে পাগলাপিরের কাছে! অবাক হই সারা বাংলাদেশের যত ছোবল-খাওয়া লোক— সব যেন আসে এখানে! এতগুলো লোক প্রিয়জন হারানোর দুঃখে মুহ্যমান, এদের মধ্যে বসে নিজের পুত্রশোকের ধারটা কমে যায় অনেকখানি। এক ধরণের সহমর্মিতায় মন আপ্লুত হয়ে ওঠে। সবাইকে মনে হয় আত্মার আত্মীয়, মনে হয় সবাই মিলে আমরা একটি পরিবার। পি এস সি আওয়াল সাহেব আগে থেকে আমাদের পরিচিত, তিনি ও তাঁর স্ত্রী আসেন ছোট ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে। আমি জানি, তাদের অন্য তিনটি ছেলে মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে। কিন্তু আমরা ভুলেও তাদের কথা তুলি না। উলফাতের বাবা আজিজুস সামাদ সাহেব ছাড়া পাওয়ার পর সাদেকা সামাদ আপা তাঁকে নিয়ে পাগলাপিরের কাছে এসেছিলেন। আমরা তাঁদের কুশল জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু উলফাত, আশফাক কেমন আছে— একবারও শুধোইনি। ভয় হয় ফিসফিস করে শুধোলেও বুঝিবা দেয়াল শুনে ফেলবে, ইশারায় শুধোলেও বুঝিবা আকাশ দেখে ফেলবে। পাগলাবাবার কাছে নিয়মিত আসেন গায়ক আবদুল আলীম, আসেন বেদারউদ্দিন আহমদ, আসেন আরও অনেক শিল্পী। শুধু যে ছোবল খাওয়ারাই আসেন তা নয়। ছোবল যাতে না খেতে হয় তার জন্য দোয়া নিতেও বহুজন আসেন।

ফকির পাগলাপিরের ওপর প্রসন্ন নয়। আমরা পাগলাপিরের কাছে যেতে শুরু করেছি শুনেই প্রথমদিনে মন্তব্য করেছিল: 'ও বাবা, বহুত এক্সপেন্সিভ পিরের কাছে গিয়েছেন। ওর বন্ধু আমিনুল ইসলাম নিয়মিত পাগলাপীরের কাছে যায়, সেটাও ফকিরের পছন্দ নয়। এই নিয়ে আমিনুল ইসলামের সঙ্গে তার প্রায় তর্ক হয়। ফকিরের দৃঢ়বিশ্বাস পাগলাপির পাক আর্মির দালাল। সেদিন যে তিনি পাঞ্জাব সার্জেন্টের সঙ্গে আমাদের দু'জনকে ক্যান্টনমেন্টে পাঠাতে চেয়েছিলেন রুমীকে আনার জন্য, সেটা ওঁর স্রেফ ভাঁওতা। আসল উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে বাঘের খোপে ঢুকিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমিনুল ইসলাম এবং আমরা কেউই ফকিরের কথায় কান দিইনি এবং পাগলা বাবার ওপর বিশ্বাসও হারাইনি।

শরীফদের আরেক বন্ধু আগা ইউসুফ আগে যখন আর্মিতে ছিলেন, তখন তাঁর বস ছিলেন, আজকের সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল নিয়াজী। ওই সময় নিয়াজীর সঙ্গে আগার বেশ হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। আগা ইউসুফ অনেকদিন হয় আর্মি থেকে রিটায়ার করে বর্তমানে আই পি বি-র চেয়ারম্যান। লেঃ জেঃ নিয়াজী ঢাকায় আসার পরপরই আগা ইউসুফকে খোঁজ করে তাঁর বাসায় চা খেতে ডেকেছিলেন। শরীফের সঙ্গে আগা ইউসুফের প্রায় দেখা হয় ঢাকা ক্লাবে। শরীফ এবং ফকির তাকে অনুরোধ করেছে— নিয়াজীকে বলে রুমীর খবরটা বের করার চেষ্টা করতে।

১৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

একটা রক্ত হিম করা গুজব কানে এল। চার সেপ্টেম্বর রাতে নাকি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। পাঁচ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তা নিয়ে সেনাবাহিনীর ভিতরে নাকি মতভেদ ছিল। একদলের মত ছিল এইসব দেশদ্রোহী দুষ্কৃতকারী কোনওভাবেই সাধারণ ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নয়। এদের ক্ষমা করে

ছেড়ে দিলে 'দেশের' সমূহ ক্ষতি। তাই প্রেসিডেন্টের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা হওয়ার আগের রাতেই তাড়াহুড়ো করে প্রায় শ'খানেক দেশদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে।

গুজবটা শুনে প্রথমে আমরা সবাই স্তম্ভিত বাকহারা হয়ে রইলাম। খবরটার সত্যাসত্য বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করলাম। তাহলে, শিমুল যে বলেছিল, চার সেপ্টেম্বরের রাত থেকে আলতাফ মাহমুদকে রমনা থানায় আনেনি, সে খবরটার মূল তাৎপর্য এই? তাহলে কি সত্য সত্যই ওই চার সেপ্টেম্বরের রাতেই আলতাফ, বদি, জুয়েল, আজাদ, রুমী—?

আজাদের মা'র কাছে ছুটলাম। উনি বললেন, আজাদ ধরা পড়ার পর প্রথম সপ্তাহেই মাত্র দু'দিন তিনি লুকিয়ে রমনা থানার জানালার বাইরে থেকে আজাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিলেন, তারপর আর সুযোগ পাননি। তিনি জানেনও না, আজাদকে এখনও রমনা থানায় আনে কিনা।

চুল্লুর ভাবী ইশরাতও আর কোনও খবর বলতে পারল না। যে ভদ্রলোক এর আগে একটু ছিটেফোঁটা খবর এনে দিতেন, তাঁকেও অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে খবর জানতে হত। তাঁরও বোধহয় কিছু অসুবিধে হয়ে গিয়েছে।

কী করি? কার কাছে যাই? আগা ইউসুফ সাহেব চেষ্টা করবেন বলেছেন। তবে তাঁর অসুবিধে হল নিয়াজী নিজে থেকে তাকে চা খেতে না ডাকলে তিনি নিয়াজীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। শুধু রুমী নয়। আহাদ সাহেব এবং সাইদুল হাসান সাহেবের খবর এনে দেবার অনুরোধও রয়েছে তাঁর কাছে।

পাগলাবাবা কিন্তু ক্রমাগত বলে যাচ্ছেন ও গুজব সত্যি না। ওরা সবাই বেঁচে আছে।

কিন্তু পাগলাবাবার কথায় ষোলো আনা ভরসা করতে মন যেন আর সায় দিতে পারছে না। পাগলাবাবার কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু মনের ভেতরের মনে যেন মাঝে মাঝে কেউ বলছে: রুমী নেই, আলতাফ নেই, জুয়েল নেই, বদি, বাশার, হাফিজ নেই, আজাদ নেই, নেই, নেই, ওরা কেউ নেই।

রুমী নেই? এই নবীন বয়সে— যখন পৃথিবীর রূপ-রস-মধু-গন্ধ উপভোগ করার জন্য সবে বিকশিত হচ্ছিল, তখনই সে নেই? এই সেপ্টেম্বরের দু তারিখ থেকে তার ইলিনয় ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে ক্লাস করার কথা। তার বদলে চার তারিখে কোথায় গেল সে?

মনে পড়ল, ডাইনিং রুমের এই চৌকিটার সামনে দাঁড়িয়ে মাত্র কয়েকদিন আগে— ২৮ আগস্টে সে বলেছিল, যদি চলেও যাই, কোনও আক্ষেপ নিয়ে যাব না। হয়তো জীবনের পুরোটা তোমাদের মতো জানিনি, তবু জীবনের যত রস-মাধুর্য-তিক্ততা-বিষ সবকিছুর স্বাদ আমি এর মধ্যে পেয়েছি।

সেদিন সেই বিষণ্ণ বিকেলে রুমী চৌকির সামনে মেঝেতে পায়চারি করতে করতে বলেছিল তার জীবনের প্রথম ও শেষ প্রেম-বিরহ-মিলন-বিচ্ছেদের এক অনুক্ত কাহিনি।

একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তার চেয়ে দু'এক ক্লাস ওপরে পড়ত, সেই মেয়ে তাকে হাতে ধরে প্রেমের আনন্দ-বেদনার রাজ্যে প্রবেশ করিয়েছিল। শেষমেষ মেয়েটি তাকে ছলনাই করেছিল, রুমী তাতে প্রচণ্ড দুঃখও পেয়েছিল। কিন্তু পরে মেয়েটির ওপর তার আর কোনও রাগ ছিল না। কারণ মেয়েটি তখন তার কাছে রক্ত-মাংসের কোনও মানবী ছিল না, তখন সে তার মনের মধ্যে হয়ে উঠেছিল বিশুদ্ধ প্রেমের প্রতীক স্বরূপিণী।

ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত পায়চারি করতে করতে সেদিন রুমী রবিঠাকুরের একটি কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করেছিল:

যা কিছু পেয়েছি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল প'ড়ে,
যে মনি দুলিল, যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

১৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

রেবা টাট্টুকে নিয়ে করাচি চলে যাচ্ছে আগামীকাল। মিনিভাইয়ের পাশের বাসার পড়শী লেঃ কর্নেল কেরোয়শীর ভাবভঙ্গি ক্রমেই আতঙ্কজনক হয়ে উঠছে। ভদ্রলোকের পড়শীসুলভ সদ্ভাব বজায় রাখার প্রচেষ্টা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মিনিভাইদের বাড়ির সব্বার দেখভাল করার দায়িত্ব যেন ওর কাঁধেই গিয়ে পড়েছে। দু'বাড়ির মাঝখানের বাউন্ডারি ওয়াল বেশ নিচু। ভদ্রলোক বিকেলে লনে তো বসবেই, এদিকে মিনিভাইরা কেউ বেরলেই সে বাউন্ডারি ওয়ালের কাছে এসে চেঁচিয়ে ডেকে খোশগল্প জুড়ে দেবে। মিনিভাইদের বাড়িতে কেউ মেহমান এলেই খানিক পরে কোরায়শীও এ বাড়িতে আড্ডা দিতে এসে হাজির হয়ে যাবে। আর জাহির, টাট্টু, সোজন, মিনিভাই-রেবার তিন ছেলে যেন তারও চোখের মণি। এই ছেলেদের খবরদারির চোটেই মিনিভাই-

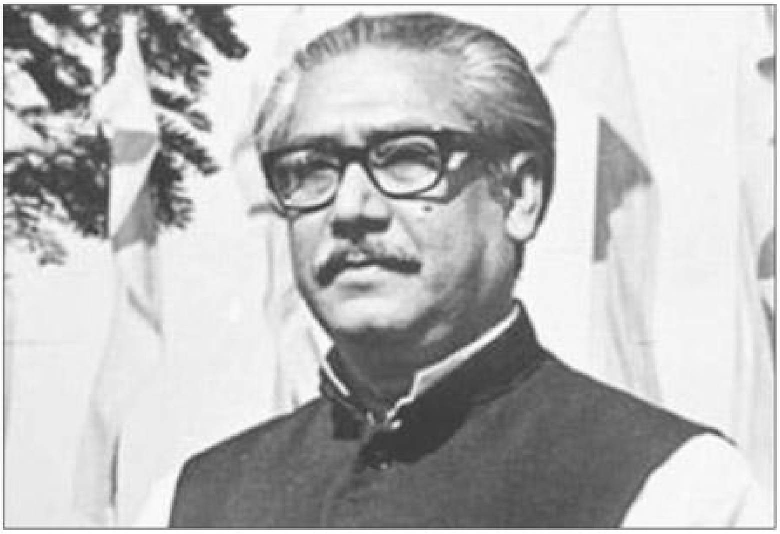

একটা রক্ত হিম করা গুজব কানে এল। চার সেপ্টেম্বর রাতে নাকি অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছে। পাঁচ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন, তা নিয়ে সেনাবাহিনীর ভিতরে নাকি মতভেদ ছিল।

সঙ্গের ছবিতে মুজিবর রহমান

রেবার ঘুম হারাম হয়ে উঠেছে। মার্চ-এপ্রিলের দিকে রুমী-জামীকে নিয়ে যখন এ বাসায় একটু বেশি আসতাম, তখন আমাদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছিল এর। টাট্টু পরীক্ষা দিতে পারেনি 'দেশদ্রোহী দুষ্কৃতকারীদের' জন্য, করাচিতে নভেম্বরে পরীক্ষা হচ্ছে, করাচিতে টাট্টুর বাবার বিজনেস পার্টনার যখন আছেনই, তখন ছেলেকে ওখানে পাঠিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, ছেলের একটা বছর নষ্ট হবে না— কোরায়শী সাহেবের এসব সুবুদ্ধির ঠেলায় মিনিভাইরা দিশেহারা।

শেষমেষ ছেলেকে নিয়ে করাচি যাওয়াই ঠিক হয়েছে। রেবা নিয়ে যাচ্ছে আগামীকাল।

২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

ফকির বলল, 'ঠেটা মালেক্যার মন্ত্রীদের তো একেবারে কুফা অবস্থা—'

জামী হেসে ফেলল, 'চাচা, আপনিও দেখি চরমপত্রের ভাষায় কথা বলছেন।'

ফকিরও হাসল, 'শুধু আমি কেন রে বেটা, ঢাকায় প্রায় সবার মুখেই তো এখন এইসব কথাই শুনছি— কুফা, ফাতা ফাতা, ছ্যারাব্যারা অবস্থা, মাদারের খেইল, গুয়ামুরি হাসি, ফুচি মারা-ইঃ।! বাংলা ভাষাকে একেবারে—'

ফকিরের মুখের কথা কেড়ে শরীফ পাদপূরণ করল, 'সমৃদ্ধ করে দিল!'

আজ দুপুরে নাকি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে মন্ত্রী মওলানা মোহাম্মদ ইসহাকের গাড়িতে 'মুক্তি'রা বোমা ছুঁড়েছে, মন্ত্রীর হাত-পা দুই-ই জখম, গাড়ির ড্রাইভার ও অন্য দুজন যাত্রীও জখম। ফকিরই খবরটা এনেছে। ২৯-৩০ আগস্ট একগাদা মুক্তিযোদ্ধা গ্রেপ্তার হওয়ার পর ঢাকা শহর ক'দিন যেন মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, এখন আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে একটু একটু নড়েচড়ে উঠছে। দশ তারিখে বাসাবো এলাকায় একদল মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে ওখানকার কদমতলী ফাঁড়ির পুলিশ আর রাজাকারদের বেশ বড় রকম সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা নদীর ওপারের একগ্রাম থেকে এসে ফাঁড়ি ঘেরাও করে রেইড করে বেশকিছু পুলিশ আর রাজাকার মেরে আবার নির্বিঘ্নে পালিয়ে গিয়েছে। খবরটা আমাদের কানে আসতে ক'দিন দেরি হয়েছিল। নিজেদের দুঃখ-ধান্দা নিয়ে বড় বেশ মুষড়ে ছিলাম, খবরটা শুনে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠি সবাই।

শরীফ বলল, 'আচ্ছা কাগজে দেখলাম শেখ মুজিবের বিচার নাকি সমাপ্ত? মিলিটারি ট্রাইবুনাল শিগগিরই রিপোর্ট পেশ করবে প্রেসিডেন্টের কাছে। কী হবে বলে মনে হয়?'

ফকির বলল, কী করে বলব? আগা মাথা 'কিছুই তো ভেবে পাই না। শেখকে বাঁচিয়ে যে রেখেছে— এইটাই তো আমার কাছে প্রায় অলৌকিক মনে হয়।'

শরীফ বলল, 'আমার মনে হয় শেখকে মারতে ওরা সাহস পাবে না, এমনিতেই ওদের এখন ছ্যারাব্যারা অবস্থা, এ সময় শেখকে মারলে আরও যে গভীর গাড্ডায় পড়বে, সেটুকু বুদ্ধি ওদের আছে।'

২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

আজ থেকে ঠিক তিরিশ দিন আগে তারা আমার রুমীকে নিয়ে গিয়েছে। এই তিরিশ দিনের মধ্যে একবারও কারও কাছ থেকে ছিটেফোঁটা একটু খবরও পেলাম না রুমী সম্বন্ধে।

খবর নেই অন্যদেরও। পাগলাপির যদিও সবসময় প্রবল বেগে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন যে তারা সবাই বেঁচে আছে, তবুও আলতাফ, বদি, জুয়েল, বাকের, বাশার, হাফিজ, মামুন, মজিদ, শামসুল হক, জাহাঙ্গীর— কারও সম্বন্ধেই এক ফোঁটা খবরও কেউ কোনওভাবে পাচ্ছে না।

সুফিয়া কামাল আপার বাসায় এসেছি। ঝিনু বলেছিল উনি আমাকে দেখবার জন্য অস্থির হয়ে আছেন।

সুফিয়া কামাল আপা শব্দ করে কাঁদতে পারেন না। বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে যেভাবে কথা বলেন, মনে হয় ওঁর বুকের হাড়-পাঁজর সব ভেঙে যাচ্ছে। এর চেয়ে যদি চেঁচিয়ে কাঁদতে পারতেন, বুঝি কষ্ট কম পেতেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে উনি একনাগাড়ে বলে যাচ্ছেন: 'এই তো মাত্র গেল বছর— আমরা বরিশালে রিলিফে যাব, রুমী এসে বলল, খালা আপনি একটু আম্মাকে বলুন, আম্মা তো যেতে দিচ্ছে না— আমি তোকে বললাম, তুই বললি, আপা আপনার সঙ্গে যাবে, তাতে আমার আপত্তি কিসের? ওতো আপনারও ছেলে— হায়রে— আমারও ছেলে! কী মায়াতেই যে বেঁধেছিল। যখনই আসত, চুপিচুপি পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরে গালে একটা চুমো দিত—

সুফিয়া কামাল আপা শব্দ করে কাঁদতে পারেন না। বড় বড় নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে যেভাবে কথা বলেন, মনে হয় ওঁর বুকের হাড়-পাঁজর সব ভেঙে যাচ্ছে। এর চেয়ে যদি চেঁচিয়ে কাঁদতে পারতেন, বুঝি কষ্ট কম পেতেন।

সঙ্গের ছবিতে শেখ হাসিনা, বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা ইমাম

মেলাঘর ফিরেই আমার কাছে এসেছিল। লুলু টুলুর সব খবর আমাকে বলে গেল— আর এই যে আলতাফ— আহা, হীরের টুকরো ছেলে— আমিই তো ঝিনুর সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলাম— সেও আমার বুকে শেল হেনে কোথায় গেল— আলভী— আহারে, আলভী যখন এল আমার কাছে— তার সারা গায়ে রক্ত— রোগা দুবলা ছেলে, কী মারটাই না মেরেছে— আমার ভালোবাসার ধনগুলোকে জালেমরা এমনভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে—

'আমি আপার মাথাটা বুকে চেপে বললাম, 'আপা, চুপ করুন, একটু শান্ত হোন—।

আমি তো শান্তই আছিরে ভাই, দেখছিস না কেমন বুকে পাথর বেঁধে রয়েছি। রান্না করছি, সংসার দেখছি, খাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি। এর চেয়ে আর কত শান্ত হয়ে থাকব?'

'আলভী কবে এসেছিল আপনার কাছে?'

'যেদিন ছাড়া পায়, সেইদিন রাতেই। রানা

নিয়ে এসেছিল। রানাকে চিনিস? লুৎফর রহমানের ছেলে— লুৎফর রহমান— ওই যে কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের ছোট জামাই—'

চিনি। উনিই তো নুহেল, আলভীদের এসেম্বলি হাউসের সামনের রাস্তা থেকে তুলে আনেন।'

সুফিয়া কামাল আপা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, নুহেলেরা চার ভাই আর আলভী যেদিন ছাড়া পায়, সেদিন এম পি এ হোস্টেলের গেট থেকে মেইন রোড পর্যন্ত ওরা হেঁটে এসেছিল। তারপর অ্যাসেম্বলি হাউসের সামনে যে মাটির ঢিপির মতো আছে, সেইখানে ওরা পাঁচজন বসেছিল। ওদের শরীর এত খারাপ ছিল যে আর হাঁটতে পারছিল না। সেই সময় ওই রাস্তা দিয়ে লুৎফর রহমান সাহেব গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। উনি দেখতে পেয়ে ওদের পাঁচজনকে গাড়িতে তুলে বাসায় নিয়ে আসেন। নুহেলদের মুখে শুনেছি এ কথা। ওদের সঙ্গে তো এখন রোজই দেখা হয় পাগলাপিরের আস্তানায়। আলভী এখন কেমন আছে? আর দেখা হয়েছে আপনার সঙ্গে?

'হ্যাঁ, আরও দু'বার এসেছিল। ও বোধহয় এতদিনে আবার মেলাঘর চলে গিয়েছে। ওর তো হাঁটবার মতো অবস্থা ছিল না। ওর কিছু আর্টিস্ট বন্ধু— দেলোয়ার, কবীর— তারা তাদের বাসাতে লুকিয়ে রেখে ওর চিকিৎসা করিয়েছে। আমি আলভীর সঙ্গে গিয়াসের যোগাযোগ করে দিয়েছি। গিয়াসের ছোটভাই ডাঃ রশীদউদ্দিন— সে ওপারে চলে যেতে চায়। আলভী তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে ঠিক হয়েছে। অ্যাদ্দিনে চলেও গিয়েছে মনে হয়।'

২ অক্টোবর শনিবার ১৯৭১

মা বললেন, 'রুমীর নামে আরেকটা সদকা কোরবানি দাও।' আমি বললাম, 'এবার একটা গরু আনাই। রুমীর সঙ্গে আলতাফ, বদি, জুয়েল ওদের নামেও কোরবানি হোক।'

একটা গরু কিনে আনা হয়েছে। সলিমুল্লাহ এতিমখানা কাছেই— আজিমপুরে।

সেখানে নিয়ে গিয়ে কোরবানি দেওয়া হবে। গরু নিয়ে আমিরুদ্দিন ড্রাইভার আর একজন পিওন হেঁটে রওনা হয়ে গেল। ওদের দু'জনকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হল— 'পথে যদি কোনও মিলিটারি জিজ্ঞেস করে গরু কোথায়, কী জন্য নিচ্ছ? শুধু বলবে এতিমখানায় নিয়ে যাচ্ছি। খবরদার কোরবানি দেওয়ার কথা বলবে না। যদি জিজ্ঞেস করে কোন বাড়ি থেকে আসছ, খবরদার আমাদের বাড়ির ঠিকানা বলবে না। বলবে মোহাম্মদপুর থেকে আসছি।'

আধঘণ্টা পরে মাসুমের হাতে রুমী, আলতাফ, বদি, জুয়েল, আজাদ, বাশার ও হাফিজের নাম লেখা কাগজ দিলাম। বললাম,

টেবিলে এফতার সাজাচ্ছি, শরীফ, জামী, মাসুম একে একে ওজু করে এসে জড়ো হচ্ছে, হঠাৎ কানে এল একটা শব্দ বু-ম্ ম্ ম্। বেশ দূরে শব্দটা হয়েছে, তবে সারা শরীর শিউরে উঠল। বড় পরিচিত শব্দ— গত একমাসে খুব কম শুনেছি এ শব্দ। আজ শব্দটা বেশ পরিষ্কার, বেশ জোরালো।

'কোন বাড়ি থেকে গরু এসেছে, বোলো না।'

মাসুম বলল, 'তাতো হবে না। ওদের তো খাতায় ঠিকানা লিখতে হয়।'

তাহলে যাহোক একটা বানিয়ে ঠিকানা দিয়ে দিয়ো— মোহাম্মদপুরেরই দিয়ো। আর ঈমাম সাহেবকে বোলো কোরবানির পর গোশত যেন রেঁধে এতিমদের খাওয়ানো হয়। চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ো কোথাও কোনও মিলিটারি দাঁড়িয়ে আছে কিনা। কোরবানি হওয়া মাত্রই সরে পোড়ো। আর পৌঁছেই আমিরুদ্দিনের চলে যেতে বোলো।'

মিলিটারির সম্ভাব্য সন্দেহের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এতসব আটঘাট বাঁধা। মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সদকা কোরবানি দেওয়ার 'অপরাধে' আবার না ধরে নিয়ে যায়!

বুড়া মিয়া গত ষোলো বছর ধরে আমাদের বাসায় বাবুর্চির কাজ করেছে। আলসারে কাহিল হয়ে এ বছরই জানুয়ারি মাসে বাড়ি চলে গিয়েছিল। বাবুর্চির কাজ করলেও বুড়া মিয়া খুব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। ধবধবে সাদা চুলদাড়ি আর রাশভারী ব্যবহারে ওকে মুরুব্বির মতো লাগে। বুড়া মিয়া আসাতে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। বাড়িঘর নির্দ্বিধায় ওর হাতে ফেলে যখন-তখন বেরনো যাবে। এমনকি দরকার হলে পালানোও যাবে।

৫ অক্টোবর মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ শবেবরাত। গত রাতে শরীফ ১৪০ রাকাত নামাজ পড়েছে— তাছাড়াও দোয়াদরুদ। একটুও ঘুমোয়নি। মা আর জামীও সারারাতই জেগেছেন বলা যায়— মাঝে ঘণ্টা তিনেক ঘুমিয়ে। আমি আরও কম জেগেছি। শরীর এত দুর্বল, রাতদুপুরের পর মাথা ঘুরতে লাগল। মা জোর করে শুইয়ে দিলেন।

আজকের রুটি-হালুয়া তৈরিতে অন্যান্যবারের মতো কারুকার্য নেই। শুধু আটার রুটি, সুজির হালুয়া আর গরুর গোশত। পরিমাণে অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশি। যত বেশি ফকিরকে দেওয়া যায়।

বাড়ির সবাই রোজা— কেবল আমি বাদে।

টেবিলে এফতার সাজাচ্ছি, শরীফ, জামী, মাসুম একে একে ওজু করে এসে জড়ো হচ্ছে, হঠাৎ কানে এল একটা শব্দ বু-ম্ ম্ ম্। বেশ দূরে শব্দটা হয়েছে, তবে সারা শরীর শিউরে উঠল। বড় পরিচিত শব্দ— গত একমাসে খুব কম শুনেছি এ শব্দ। আজ শব্দটা বেশ পরিষ্কার, বেশ জোরালো।

হাসি হাসি মুখ নিয়ে শরীফ এসে বসল একটা চেয়ারে, মৃদুস্বরে বলল 'শুনলে?'

'শুনলাম তো। বেশ দূরে মনে হল।'

'এখন থেকে কাছেও শুনবে।'

'তার মানে?'

'নতুন চালান এসেছে।'

মা, লালু রান্নাঘরে ছিলেন, দু'হাতে খাবারের বাটি নিয়ে তাঁদের আসতে দেখে শরীফ মুখ বন্ধ করে ফেলল।

এরপর ঘণ্টাদুয়েক আর নিরিবিলি কথা বলারই সুযোগ মিলল না। পড়শীদের বাড়ি থেকে রুটি-হালুয়া আসছে, দরজায় ফকিরদের ভিড়, তাদের সুস্থির করে একে একে রুটি-হালুয়া, গোশত বিলি করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। এরমধ্যে দাদাভাই, মোর্তুজা ভাই একটি টিফিন কেরিয়ার ভর্তি রুটি-হালুয়া নিয়ে এসে উপস্থিত। ওঁরা আসতেই শরীফ ওদের সঙ্গে বসার ঘরে রেডিও নিয়ে বসল। স্বাধীন বাংলা বেতার অনুষ্ঠানের সময় হলেই আর অন্য কোনও কথা নয়, যে যেখানেই থাকুক, রেডিও নিয়ে বসবেই।

রাতে শুতে যাওয়ার সময় শরীফের কাছে শুনলাম মেলাঘর থেকে নতুন গেরিলা দল এসে ঢাকার উপকণ্ঠে সাভারের দিকে ঘাঁটি গেড়েছে। সেই দলের ডেপুটি লিডার বাচ্চু মঞ্জুর হোসেনের আপন ভাগনে। বাঁকার বউ ডলিও মঞ্জুরের এক ভাগনি, সেই সুবাদে বাচ্চু, বাঁকারও শ্যালক হচ্ছে।

ওরা আপাতত ফার্মগেটে আর ফকিরাপুলে দুটো বাড়িভাড়া নিয়েছে। এ সবের খরচ জোগাচ্ছে বাঁকা আর মঞ্জুর। পরে সুযোগ বুঝে আরও দুটো জায়গায় বাড়ি ভাড়া করবে। আজ শবেবরাতের রাতে ওদের প্রথম অ্যাকশন করার কথা ছিল। শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওটা ওদেরই অ্যাকশন। কাল পরশু জানা যাবে ঘটনার বিবরণ। ক্রমশ

বেশ দেরি হয়ে গেছে, তবু
শতবার্ষিক স্মরণ

জসীম উদ্‌দীনের ভ্রমণ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশ-বিদেশে আমার সামান্য ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার বিভিন্ন পর্যায়ে ভ্রমণ সম্পর্কে আমার মনে নানান ভাব ও ভাবনা জেগেছে। মানুষ কেন বেড়ায়, কেন নিজের চেনা গণ্ডি ছেড়ে অচেনা দিক-দিগন্তে যেতে চায়, কিসের টানে কিসের অন্বেষণে মনের এই ব্যাকুলতা— এইসব প্রশ্নের এতদিনে হয়তো দুয়েকটা উত্তর পেয়েছি।

কী সেই উত্তর? মানুষ মানুষের নৈকট্য চায়। দূরত্বের বাধা, অপরিচয়ের বাধা, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-আচরণের বাধা— এই সবই মানুষকে মানুষের কাছ থেকে সরিয়ে রাখে। অজানা দেশের অচেনা মানুষের প্রতি মনের মায়া-মমতা মৈত্রী ঢেকে রাখে। ভ্রমণ সেই বাধা ডিঙোবার, ঢাকা সরাবার অব্যর্থ পথ।

প্রকৃতিপ্রেম, পুণ্যাকাঙ্ক্ষা, কিংবা ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ দেখার আগ্রহ— এসবই, ক্রমশ আমার মনে হয়েছে, ভ্রমণের প্রাথমিক প্রেরণা কিংবা হাতছানি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পাহাড়, নদী, সমুদ্র দেশের সৌন্দর্যছবির ফ্রেমমাত্র, দেখবার আসল ছবি হল সে-দেশের মানুষ।

এমনও হয় যে মানুষের দয়া বা করুণার খোঁজে কেউ বিশ্বের নানা শহরে বেড়িয়ে বেড়ান। যেমন এযুগের এক বিখ্যাত ভ্রমণলেখিকা ওয়েলসবাসী জান মরিস (লিঙ্গ পরিবর্তনের আগে ছিলেন জন মরিস, তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবই লিখে সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন তিনি আর ভ্রমণকাহিনি লিখবেন না)। মরিস বলেছেন, দয়া দিয়ে মানুষের সব সমস্যার সমাধান করা যায়। সেই জন্যই তাঁর বিশ্বাস, সভ্য শহরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য দয়া। পৃথিবীর যে শহরেই তিনি যান, দয়া বা করুণার প্রকাশ দেখবার আশায় স্থানীয় আদালতে একবার যাবেনই। নতুন কোনও শহরে পৌঁছেই সেখানকার কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তার মুখের হাসিটা কেমন হয় তা দেখে মরিস আঁচ করে নেন সেখানকার মানুষের সংস্কৃতির ধরন আর সেই সংস্কৃতির জনক সেই শহরটার স্বভাব। জান মরিসকে সমালোচকরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইমপ্রেশানিস্টিক ভ্রমণলেখকদের সঙ্গে এক সারিতে বসিয়েছেন।

তখনকার পূর্ববঙ্গের প্রাণস্পর্শী পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের ভ্রমণসাহিত্য নিয়ে দুয়েকটা কথা বলতে এই শিবের গাজন গাইছি, ভ্রমণপরিধির কেন্দ্রে মানুষ ও তার দয়া-মায়ার কথা বলছি তার কারণ জসীম উদ্‌দীনের ভ্রমণকাহিনির মূলে ও শাখা-প্রশাখায় এই মানুষ আর মানুষের প্রতি তাঁর মায়া-মমতা।

ভ্রমণকাহিনি কতরকম হতে পারে তার কোনও বাঁধাধরা রীতিনীতি নেই। সকলের দেখবার চোখ, ভাববার মন একরকম হলে ভ্রমণকাহিনির তো দরকারই থাকত না। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' আর গ্যেটের 'দ্য ফ্লাইট টু ইটালি' বা ক্রিশ্চিনা নোবেল-এর 'ওভার দ্য হাই পাসেস' আর আলেকজান্ডার ফ্রেটারের 'চেজিং দ্য মনসুন' কি একইরকম ভ্রমণ? আসল কথা, ভ্রমণ করে মানুষের মন, আর শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদস্পর্শী বাগভঙ্গির অনুকরণে বলতে পারি— যত মন তত ভ্রমণ।

জসীম উদ্‌দীনের ভ্রমণের মধ্যে তাঁর মন যেন শতমুখে উৎসারিত। তাঁর 'নক্সী কাঁথার মাঠ' বা 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এ মানুষের প্রতি তাঁর মায়া-মমতা, দুঃখীজনের প্রতি তাঁর দরদ যেমন সহজেই পাঠকের মন স্পর্শ করে, ভ্রমণেও তেমনই সদ্যপরিচিত মানুষজনের সুখ-দুঃখে তাঁর একাত্মতা চোখে না পড়ে পারে না। দুঃখী মানুষের প্রতি তাঁর সমব্যথা আর জীবনের প্রতি তাঁর দরদী দৃষ্টি তাঁর ভ্রমণকথাকে করে তোলে বিশেষ দেশ-কালের আধারে মানবিকতার দলিল। ভ্রমণকাহিনিকে সুস্বাদু করতে কোনও কাল্পনিক সুন্দরী বা সাধু-সন্ন্যাসীর দরকার হয় না তাঁর। ভ্রমণপথে তিনি কুড়িয়ে নেন জীবনের ছোটবড় সুখ-দুঃখের নানান বাস্তব ঘটনা। ভ্রামণিকের দরদী মনে জারিত হয়ে, অচেনা সর্বজন হয়ে ওঠে তাঁর চিরচেনা আত্মজন।

যেমন, তাঁর আমেরিকার ভ্রমণকথা 'চলে মুসাফির' বইয়ের ভূমিকায় তিনি নিজেই বলেন, "সেই ভ্রমণে আমি যেসব সুন্দর-প্রাণ লোকের সংসর্গে আসিতে পারিয়াছিলাম তাঁহাদের কথা এই পুস্তকে মনের অনুরাগ মিশাইয়া প্রকাশ করিয়াছি।...

"সকল দেশের মানুষই এক। ...সবদেশের মানুষই তাই ভালো। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিবাদ হয়, তাহাতেও মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যায় না।"

২

ষাটের দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত জসীম উদ্‌দীনের দুটি ভ্রমণবই 'হলদে পরীর দেশে' আর 'চলে মুসাফির' আমি পড়েছি প্রকাশের প্রায় পনেরো-কুড়ি বছর পর। তার অনেক আগেই গ্রামবাংলার জল মাটি মানুষের সুখ-দুঃখ নিংড়ে লেখা 'নক্সী কাঁথার মাঠ'-এর এই কবি তাঁর আমেরিকা-ভ্রমণের কাহিনি 'চলে মুসাফির' লিখে তখনকার পূর্ববঙ্গে ভ্রমণকথাকার হিসেবেও খ্যাত হয়েছেন। বইটির ছাত্রপাঠ্য সংস্করণের পর যেসব কথা "সরলমতি ছাত্রদের জন্য লিখিত বলিয়া পাঠ্যপুস্তকে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, তাহা প্রথম ও তাহারও পরে দ্বিতীয় সংস্করণে

বিশেষভাবে লিখিত হইল।"

তাঁর নিজের কথা— পূর্ববঙ্গ গভর্নমেন্টের অর্থানুকূল্যে তিনি আমেরিকা গিয়েছিলেন ১৯৫০ সালে। সেই আমেরিকার ভ্রমণকথার ওই প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তার অনেক পরে— ১৯৬৬ ও ১৯৬৯ সালে। বইয়ের গোড়ার দিকে 'আমেরিকার পথে' অধ্যায়ে তিনি লিখছেন, "আমাদের প্লেনে একজনও পাকিস্তানী বা ভারতীয় যাত্রী ছিলেন না। সবাই ইউরোপবাসী। কারোর সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। ভাবিলাম সারা পথ একা একা কাটাইতে হইবে।

"কিন্তু শীঘ্রই আমার ভুল ভাঙিল, অল্প সময়ের মধ্যেই বহু যাত্রী স্বেচ্ছায় নিজেদিগকে আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হইলেন। ...এর ওর সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনি ইংল্যান্ডের মাধ্যমিক স্কুলগুলির সম্পাদক। আমেরিকা যাইতেছেন নানাস্থানে বক্তৃতা করিবার জন্য। আমার পরিচয় পাইয়া তিনি বড়ই খুশী হইলেন। আমেরিকা যাইয়া আমি যে অভিভাষণটি দিব তাহা তিনি পড়িতে চাহিলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে তাহাকে আমার অভিভাষণটি দিলাম। অতি মনোযোগের সঙ্গে তিনি আমার লেখাটি পড়িলেন। পড়িয়া বলিলেন, 'আপনার প্রবন্ধ পড়িয়া আপনার দেশ পূর্ববঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করে।'

"আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, 'দেখুন, আমার বড়ই ভয় হইতেছে, হয়তো আমার খারাপ উচ্চারণের জন্য এদেশের কেহই আমার প্রবন্ধটি বুঝিতে পারিবে না।' তিনি আমাকে বলিলেন, 'আপনি ঘাবড়াইবেন না। আসুন, আপনাকে আমি উচ্চারণ শিখাইয়া দিতেছি। আমাদের নিউইয়র্ক পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে আমি আপনাকে তৈরি করিয়া দিতে পারিব।' আমার প্রবন্ধ পড়ার মহড়া চলিতে লাগিল। এই ভদ্রলোকের আরও বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তাহাদের সঙ্গে গল্প-গুজব না করিয়া প্রায় সারাটি পথই তিনি আমাকে উচ্চারণ শিখাইয়া কাটাইলেন।"

কিংবা আবার, "আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীতের কথা শেষ হইয়া গেল। এবার বসিবে আন্তর্জাতিক লোক-গাথার অধিবেশন। ইহার আগেই ডেরিংটন চলিয়া যাইবে। রাত্রে সে আমাকে হঠাৎ বলিয়া গেল, 'কাল খুব ভোরে আমি চলিয়া যাইব।' আমি তো আকাশ হইতে পড়িলাম। এই সুন্দর দেশে ডেরিংটন ছিল আমার বন্ধু দার্শনিক আর পরিচালক। সে কাল চলিয়া যাইবে। আমি সকল দিক অন্ধকার দেখিলাম। ...কথা হইল ভোর হইলেই আমি

মানুষের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, সকলের প্রতি ভালোবাসা, জীবনের প্রতি দরদী দৃষ্টি —এ যেমন তাঁর কাব্যে, তেমনই তাঁর ভ্রমণে। জসীম উদ্দীনের তখনকার অখণ্ড যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণের কাহিনি 'হলদে পরীর দেশে' এমনই দরদী দৃষ্টি আর সমব্যথী মনের এক দেশ আবিষ্কার।

তৈরি হইয়া বসিয়া থাকিব। ডেরিংটন যেন আমার ঘরে আসে। আমি তাহাকে কিছুদুর পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।

"...সারা রাত্রি জাগিয়া কিভাবে ডেরিংটনকে কৃতজ্ঞতা জানাইব তারই জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলাম। সকালে তৈরি হইয়া পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া আমার ঘরে অপেক্ষা করিতেছি; কিন্তু ডেরিংটন আর আসে না। ... তবে কি সে আজ যায় নাই? কি মজাই না হইবে।

"মনের আহ্লাদে ডেরিংটনের ঘরে যাইয়া দেখি, শূন্য বাতাস তার পরিত্যক্ত কামরার ধূলা-বালু উড়াইয়া শুধু বলিতেছে, সব খালি সব খালি। কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তার ঋণের বোঝা যে পূরণ করিব সে সুযোগও ডেরিংটন আমাকে দিল না।

"কয়েক দিন পরে ডেরিংটনের নিকট হইতে চিঠি পাইলাম। আমি টেপ রেকর্ডিং মেশিন কিনিতে চাহিয়াছিলাম, কোন্ স্থানে ভালো মেশিন পাওয়া যায়, কিভাবে মেশিন কিনিয়া দেশে লইয়া যাইতে হইবে তারই সুদীর্ঘ উপদেশ।

"চিঠি শেষে মাত্র একটি কথা লিখিয়াছে, 'আমি হঠাৎ তোমাকে না বলিয়া আসাতে দুঃখ করিও না। যে কথা অনুভব করিবার তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলে সেই কথাকে শুধু অপমান করা হয়।'"

ভ্রমণ অচেনা দেশকে করে স্বদেশ, অচেনা মানুষকে করে স্বজন। পৃথিবীর নানা দেশ ঘুরে আমার তো এমনও মনে হয়, ভ্রমণ মানেই ভালোবাসা। মানুষকে, প্রকৃতিকে, পশুপাখি কীটপতঙ্গকে— এক স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসা। এই ভালোবাসার টানেই মানুষ পথে নামে। আমি এমনও ভাবি যে যে যত ভালোবাসে তার মনে তত আলো আসে।

এই ভালোবাসাই জসীম উদ্দীনের ভ্রমণকাহিনির মর্মকথা। যেমন সুন্দর ভাব, তেমনই সহজ তাঁর ভাষা। উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটা বোঝাতে গেলে আমার পড়া তাঁর দুটি ভ্রমণবই-ই প্রায় পুরো পুনর্মুদ্রিত করতে হয়। 'চলে মুসাফির' থেকে আর একটি মাত্র অংশ শুনিয়ে জসীম উদ্দীনের বিপুল গভীর আমেরিকাভ্রমণ প্রসঙ্গ শেষ করব।

"ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাহিনী আমার শেষ হইতে চলিল। কত লোক কতভাবে আসিয়া আমার মন যে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই।

"...প্রায় পঁচিশ দিন এইসব লেখকের সংসর্গে কাটাইয়া আমি যেন এঁদেরই একজন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহাদের আমার এতই আপনার বলিয়া মনে হইয়াছিল যে মাঝে মাঝে মনের অতর্কিতে আমি তাহাদের সহিত বাংলায় কথা বলিয়া ফেলিতেছিলাম।"

৩

মানুষের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, সকলের প্রতি ভালোবাসা, জীবনের প্রতি দরদী দৃষ্টি —এ যেমন তাঁর কাব্যে, তেমনই তাঁর ভ্রমণে। জসীম উদ্দীনের তখনকার অখণ্ড যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণের কাহিনি 'হলদে পরীর দেশে' এমনই দরদী দৃষ্টি আর সমব্যথী মনের এক দেশ আবিষ্কার। তাঁর নিজের কথায়, "গল্পে পড়িয়াছিলাম হলদে পরীর দেশ। এত সুন্দর সুন্দর মানুষ তো কোন দেশে কোথাও দেখি না।"

'হলদে পরীর দেশে' মার্শাল টিটোর তখনকার অখণ্ড যুগোশ্লাভিয়ার এক মায়াময় লোককথা। এরকম সার্থক ভ্রমণ আমাকে ভারী শান্তি দেয়। এই বইয়ের 'শিশুরাজ্য' পর্বটি ঠিক যেন একটি বাস্তব রূপকথা। আগাগোড়া সত্যি ঘটনা, তবু মনে হয় স্বপ্ন দেখছি। এটি আমার একটি প্রিয় ভ্রমণবই। অথচ, যতদূর মনে পড়ে, ১৯৭৫-এ গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় সাহিত্যিক মনোজ বসুর বাড়িতে এ-বইয়ের লেখক কবি জসীম উদ্দীনের সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাতে তাঁর কবিতা নিয়ে আলাপচারিতার সময় পর্যন্ত এই বইটির কথা আমি জানতামই না।

১৯৬৫-এ প্রকাশিত 'হলদে পরীর দেশে'র স্নেহ-ভালোবাসা, সখ্য-সহৃদয়তার যে পরিচয় পাই আজকের পৃথিবীতে তার বড়ই দরকার। এই আন্তরিক ভ্রমণকথার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "দুপুরে লোকসঙ্গীত সভায় বড় বড় পণ্ডিতদের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা শুনি। অবসর

পাইলেই সমুদ্রতীরে চলিয়া আসি। ছোট ছোট অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আমাকে যেন চিনিয়া ফেলিয়াছে। আমি সমুদ্রতীরে আসিলেই তাহারা আমাকে ঘিরিয়া ধরে। কখনো আমি বালুর উপর শুইয়া পড়ি। তাহারা আমার ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়। আবার কখনো আমার কোলে-পিঠে-কাঁধে উঠিয়া তাহাদেরই একটা খেলনার মত আমাকে লইয়া নাড়াচাড়া করে।

''সেদিন আমি সবে লোক-সঙ্গীত-সভা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় একটি সুন্দরী মহিলা তাঁহার একজন অনুবাদকের সাহায্যে আমাকে বলিলেন, 'আপনার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, পাশের এই ঘরটিতে এসে বসেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি।'

''আমি মহিলাটির অনুগমন করিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, 'আপনি এ দেশে এসে আমাদের শিশুদের বেশ মাতিয়ে তুলেছেন। তারা আপনার কথা কত বলে।'

''আমি বলিলাম, 'সকল দেশের শিশুরাই সকলের। দেশ, ধর্ম বা সংস্কার কিছুরই দেয়াল এরা মানে না। ভালবেসে কাছে ডাকলেই এরা আপন হয়ে যায়।'

''মহিলাটি উত্তর করিলেন, 'আপনি আমাদের শিশুদের ভালবাসেন বলে আপনার প্রতি আমরা খুব আকৃষ্ট। আচ্ছা, আপনি এ দেশে কত দিন থাকবেন?'

''তখনকার যুগোশ্লাভিয়ায় একটি ম্যাচ বাক্সের দাম ৫০ টাকা, এক প্যাকেট সিগারেটের দাম দুই শত টাকা। সব জিনিসেরই দাম এমনি। অবশ্য এদের এক টাকা আমাদের এক আনার কিঞ্চিত অধিক। তাহা হইলেও এ দেশে সব জিনিসের দামই আমাদের দেশের অনেক গুণ। আমার ইচ্ছা ছিল কনফারেন্স শেষ হইলে কিছুদিন এদেশে ঘুরিয়া বেড়াইব। কিন্তু সেই বেড়ানোর জন্য যা টাকা ব্যয় হইবে তাহা আমি কোথায় পাইব? এ সব কথা ত ভদ্রমহিলাকে বলা যায় না। আমি উত্তর করিলাম, 'কনফারেন্স শেষ হলেই আমি দেশে চলে যাব।'

''মহিলা বলিলেন, 'আচ্ছা, আমরা যদি আপনাকে আমাদের রাজ-অতিথি করে দেশের সব জায়গা দেখাই তবে কেমন হয়?' ভদ্রমহিলার কথা শুনিয়া ত আমার নাচিতে ইচ্ছা করিতেছিল। বিনা খরচে সমস্ত দেশ দেখা এ কি কম সৌভাগ্যের কথা!

''ভদ্রমহিলা বলিলেন, 'এখানকার কনফারেন্স শেষ হলেই আপনি বেলগ্রেড, চ'লে আসবেন। সেখান থেকেই আমরা আপনাকে রাজ-অতিথি হিসাবে গণ্য করব।' তারপর আমি কোন্‌দিন কোন্‌ গাড়ীতে উঠে বেলগ্রেড যাব তিনি সমস্ত নোট বই-এ লিখিয়া লইলেন।''

একটু পরেই লিখছেন, '' ... ভাবিলাম, গাড়ীতে এই সুদীর্ঘ আঠার ঘন্টার মত ভ্রমণ না জানি কত দুঃখেই না কাটিবে। এদের ভাষাও আমি জানিনা। কথা বলিয়া যে কাহারো সঙ্গে ভাব জমাইব তাহারও কোন উপায় নাই।

''গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার আশে-পাশের সৈনিকেরা জোকার দিয়া উঠিল। তারপর তাহারা দলবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল। যুগোশ্লাভিয়ার গ্রাম্য গান। এ দেশের গ্রাম্য গানের অর্ধেক ইউরোপীয় আর অর্ধেক প্রাচ্য সুরের সংমিশ্রণ। শুনিতে শুনিতে মনে হয় যেন আমাদের দেশের গানই শুনিতেছি। সুরে সুরে আমার অন্তর পাগল হইয়া উঠিল। ছোটবেলায় কবিগান গাহিতে অভ্যাস করিয়াছিলাম। তাই যে কোন সুরে উপস্থিত গান তৈরী করিতে আমার বেগ পাইতে হয়না। সৈন্যেরা অনেকক্ষণ গান গাহিয়া থামিলে আমি তাহাদেরই সুরে উপস্থিত রচনা করিয়া একটি গান গাহিলাম। তাহারা হাতে তালি দিয়া নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। গান শেষ হইলে তাহারা আমাকে টানিয়া তাহাদের মাঝখানে ভাল জায়গাটিতে আনিয়া বসাইল। তারপর তাহারা একটি গান গায় আমি একটি গান গাই। দুই দলে যেন গানের পাল্লা চলিল।...

''অনেকক্ষণ গান গাহিয়া আমরা থামিলাম। সেপাইরা রাত্রের আহারের জন্য প্রস্তুত হইল। সকলেই সামান্য কিছু খাবার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। আকারে ইঙ্গিতে তাহারা আমাকে তাহাদের খাবারের সঙ্গী হইতে বলিতে লাগিল। আমি মাথা নাড়িয়া না, না, করিতে লাগিলাম। তাহারা কিছুতেই শুনিল না। একজন খানিকটা মাংসের কাবাব আমার মুখে পুরিয়া দিতে আসিল। সুতরাং রাত্রের ভোজনটা তাহাদের সঙ্গে ভালভাবেই সমাধা হইল। খাবার পরে তাহারা ফ্লাক্স হইতে গরম কফি আনিয়া ঢালিয়া দিল

''আমার পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইতে যাই। তাহারা সিগারেটটি কাড়িয়া লইয়া আমার পকেটে রাখিয়া নিজেদের সিগারেটের বাক্সটি সামনে মেলিয়া ধরে। এমন আদর ত' জীবনে কোন দিনই পাই নাই। শিশুর মত সরল এই লোকগুলি। এমন প্রাণ-খোলা ভালবাসা যাহাদের তাহারা কেমন করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে ভাবিতে আশ্চর্য লাগে। এমন সুন্দর-প্রাণ লোকগুলির কি কোথাও কোন শত্রু থাকিতে পারে!''

একটু পরেই লিখছেন, ''...তাহাদের বিষয়ে অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করিলাম। মার্শাল টিটোর ইহারা খুব আদুরে সেপাই। সামন্ত-যুগে জমিদারেরা দেশের জমি-জমার মালিক ছিল। মার্শাল টিটো ক্ষমতা হাতে পাইয়া সেই সব জমি-জমা কাড়িয়া লইয়া ইহাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। বড় বড় মিলগুলির মালিকানা স্বত্ব মিলের শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়াছেন। এই সেপাইরা সেই চাষী ও শ্রমজীবীদের ছেলে-পেলে অথবা আত্মীয়-স্বজন।''

বেলগ্রেডে পৌঁছে এক সকালের অভিজ্ঞতা— ''পরদিন সকালে চলিলাম, এদেশের একটি বাজার দেখিতে। আমাদের দেশের মত গ্রাম হইতে বহু লোক আসিয়াছে শাক-সব্জী ফল-মূল লইয়া। দোকানদারেরা আমার সঙ্গে কথা বলে। আমিও তাহাদের সঙ্গে কথা বলি। কিন্তু কেহই কাহারো কথা বুঝিতে পারি না। একটি বৃদ্ধা মহিলা ঝুড়ি-ভরা আঙুর লইয়া আসিয়াছে বেচিতে। এমন বড় বড় আর সুন্দর আঙুর দেখিলেই কিনিতে ইচ্ছা করে। নানা ইঙ্গিত করিয়া তাহার নিকট হইতে এক পাউণ্ড আঙুর লইলাম। কিন্তু দাম দিতে যাইয়া পড়িলাম মুস্কিলে। বিদেশীদিগকে ট্রাভেলার চেকের বিনিময়ে এদেশী টাকার সঙ্গে এক রকমের কুপন দেওয়া হয়। নয় আনার জিনিস যদি আমি কিনি তবে ছয় আনার কুপন দিব। কিন্তু মেয়েটি আমার কুপন লইতে চাহে না। সে গ্রামের মেয়ে। কুপনের অতশত ঝামেলা বোঝে না। কারণ সেই কুপন ব্যাঙ্কে যাইয়া ভাঙ্গাইতে হইবে। সে যখন কুপন লইল না, ভাবিলাম আঙুরগুলি ফিরাইয়া দেই। বৃদ্ধা কিন্তু তাহা কিছুতেই ফেরৎ লইবে না। সে বার বার ইঙ্গিত করিয়া বলে, ''তুমি আঙুর নিয়ে যাও, দাম লাগবেনা।''

ইংরেজী জানা এক ভদ্রলোক আসিয়া আমাদের অনুবাদকের ভার লইলেন। তাঁর জবানীতে বৃদ্ধা বলিল, ''এ আঙুর ত' আমি কিনে আনিনি। এ আমার ক্ষেতের ফসল। তুমি না নিলে আমি বড়ই ব্যথা পাব। মনে কর তোমার দেশের একটি ছেলেকে এদেশের একটি বৃদ্ধা মাতার স্নেহোপহার।''

এ সেই দেশ দেখার আনন্দ, মানুষ চেনার আনন্দ। ভ্রমণের মূল চালিকাশক্তিও তা-ই। জসীম উদ্দীনের ভ্রমণকাহিনি সেই আনন্দেরই অকপট কথকতা।

(উদ্ধৃতির বানান মূলানুগ)

স্বর্ণাক্ষরে সংগ্রহযোগ্য

অনলাইনেও পাবেন:
www.swarnakshar.in

প্রথম ভারতীয় ভূপর্যটক
বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া
১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণবই
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹৯০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা
কবির দেখা কবির লেখা
একগুচ্ছ অসামান্য ভ্রমণকথা।
দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১৫০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে
প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অজানা দেশ দেখে বেড়ানো, অচিন মানুষ চিনে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই। **দ্বিতীয় সংস্করণ** ₹১২০

প্রতাপকুমার রায় ও হরপ্রসাদ মিত্রের
বহু দেশ ঘুরে
বহুদিন ধরে বহু দেশ ঘুরে দশ দিকের দশটি লেখা ₹৬০

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরীর
চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

রবীন চক্রবর্তীর
বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে।
সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য ₹৬০

ভ্রমণ ট্রেকিং
যাঁরা ট্রেকিং করবেন, এ বই তাঁদের পথ দেখাবে আর ট্রেকিং যাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, বইটি তাঁদেরও পৌঁছে দেবে প্রকৃতির অমৃতলোকে। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹১০০

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই
নিমফুলের মধু গল্পসংকলন ₹৬০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

নতুন বই
মৈত্রেয়ী নাগের
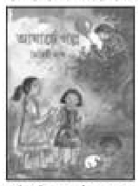
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

কুমির হয়ে জলে গেল
₹৩০

নেকড়ের চোখ
বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়।
মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন:
মৈত্রেয়ী নাগ ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী
প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০
দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিডিও-র জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

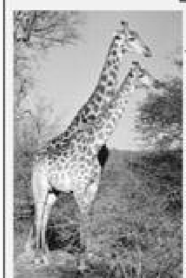
আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান।
₹৫০

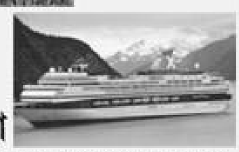
আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
***for Preview:* www.bhraman.com**

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

আমার বাবা

সুকুমারী ভট্টাচার্য

বেশ খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে শুরু করতে হবে। যে মাহেশের রথ পশ্চিমবঙ্গে বিখ্যাত, সেই মাহেশের জমিদারের অষ্টবিংশ শতকের শেষদিকে কী একটা কারণে চিত্ত-পরিবর্তন হয়, তিনি সহসা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং জীবনযাত্রা থেকে হিন্দু চালচলন সম্পূর্ণ বিসর্জন দেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা আমার ঠাকুরমা প্রিয়বালার পরনের বেশবাস বিলিতি হয়ে গেল। তাঁর দিদি লীলাবতী অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। দীর্ঘদেহিনী, শ্বেতচন্দনের মতো গাত্রবর্ণ। ঠাকুরদা সে তুলনায় অনেক সাদাসিধে দেখতে ছিলেন, পড়তেন নবম কিংবা দশম শ্রেণিতে। পিতার নির্দেশে এঁরা শাড়ি পরতে পেতেন না, যদিও ঠাকুরমা বিবাহের দিন থেকেই আমরণ শাড়িই পরতেন। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতী, স্বল্পভাষিণী এবং শান্তস্বভাবের।

সরসীকুমার দত্ত ছিলেন কৃতবিদ্য শিক্ষক, ধর্মানুসন্ধিৎসু, উদ্ভাবনী মেধাবান, গান্ধীবাদী ও সামাজিক দায়বোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। বিচিত্র ও বহুমুখী জীবন কাটিয়ে যাওয়া মানুষটিকে স্মরণ করছেন তাঁর সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিদুষী কন্যা।

বড়ঠাকুরমা লীলাবতীর বিয়ে হয়েছিল সোনাটিকরি গ্রামের জমিদার এবং পাশ-করা ডাক্তারের সঙ্গে। ইনি মারা যান শেষ-যৌবনেই, তারপর লীলাবতী সম্পত্তির কিছু অংশ নিয়ে ছোট বোনের সঙ্গে বাস করতে এলেন মহানাদ গ্রামে। সেইখানেই আমরা তাঁকে দেখেছি। পুরো সাহেবি ইংরেজি বলতেন ইংরেজি কেতায়। মুখ ফিরিয়ে থাকলে একেবারেই বোঝা যেত না এ ইংরেজি কোনও বাঙালিনি বলছেন। ওদিকে ঠাকুমাও এরকম, ভালো ইংরেজি বললেও তাঁর বাংলাটি ছিল মধুর। বেয়ারা-বাবুর্চি-খানসামার সংসারে মানুষ হয়েও এঁরা গোপনে অনেকটা বাঙালিয়ানা বজায় রেখেছিলেন মৃত্যু পর্যন্ত। ঠাকুরমার মা-র একটি খাতা দেখেছিলাম মুক্তোর মতো হস্তাক্ষরে। তাতে উনি আশপাশের সমাজের বহু জীবনরীতি, বিশ্বাস ও চালচলনের বর্ণনা ও সমালোচনা করেছিলেন। আমার প্রবল আত্মগ্লানি রয়ে গেল খাতাটি যথাকালে নিয়ে নিইনি বলে।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

প্রিয়বালার চার ছেলেমেয়ে— বিদ্যুৎপ্রভা, সরসীকুমার, চারুপ্রভা ও নলিনীকুমার। জ্যেষ্ঠপুত্র সরসীকুমার আমার বাবা। তাঁর জ্যেষ্ঠাভগিনী বিদ্যুৎপ্রভা এক অসামান্যা নারী ছিলেন। বাবার জন্ম ১৮৯৩ সালের ৩০ আগস্ট, মৃত্যুদিন ২৩ অক্টোবর, ১৯৪৫। বড় পিসিমা জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালের ২ জুলাই।

মাহেশের জমিদার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে মেয়েদের বিয়ের জন্য প্রথম প্রজন্মের খ্রিস্টান ছেলে খুঁজছিলেন যশোরে মাইকেল মধুসূদনের বাড়ি কপোতাক্ষ নদীর তীরের সাগরদাঁড়ি গ্রামে। ঠাকুরদা মধুসূদনের জ্ঞাতিভাই। সেখানে ঠাকুরদার ছেলেবেলার খেলার সঙ্গিনী ছিলেন এক বিধবা কিশোরী। ঠাকুরদা তখন কলকাতার কলেজে পড়েন, গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে গিয়েছেন। প্রচণ্ড গরমের দিনে তিনি পাশের বাড়ির বন্ধুটির খুব কান্নার শব্দ পেয়ে মেয়েটির মাকে জিজ্ঞেস করেন 'ও কাঁদে কেন?' মা-র উত্তর, 'আজ একাদশী, ওর তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু বিধবার তো আজ নিরম্বু উপবাস।' অনেক অনুনয় বিনয় করেও বন্ধুর জন্য এতটুকু জলের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। সেই সন্ধ্যায় মেয়েটি মারা গেল। ঠাকুরদা সোজা কলকাতায় এসে বিশপ্‌স কলেজের সাহেবকে বললেন আমি এখনই খ্রিস্টান হব। ধর্মের তত্ত্বকথা পরে শুনে শিখব। কিছু তর্কাতর্কির পর সাহেব তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দিলেন। দেশে ফিরে সেকথা জানাতে তাঁর পিতা তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। বড় সম্পত্তি থেকে, জমিদারিতে তাঁর অংশ থেকে বিপিনবিহারী দত্ত বঞ্চিত হলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এই ছাত্র কলকাতার এক ধনী ছাত্রকে পড়ানোর বিনিময়ে অন্ন ও আশ্রয় পেলেন। যাই হোক, তাঁর ছাত্র টেনেটুনে পাশ করলেও ঠাকুরদা নিজে

দশাশ্বমেধ ঘাট। বারাণসী

মূল সূত্র নিয়ে এই দুই ধর্মান্বেষী আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, খ্রিস্টধর্ম প্রাচ্যেরই সৃষ্টি। কিন্তু সর্বত্রই একে সাহেবি পোশাকে, ভাষায়, নামে ও আচার-আচরণে বিদেশি আবরণে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। আর এদেশের লোকেরা এটাকে সাহেবি ধর্ম বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে এবং নিজেদের ধর্মজীবন থেকে দূরে রেখেছে।

আশানুরূপ ফল করতে পারেননি। ওবাড়ির বাজার সরকার ও সহপাঠীর গৃহশিক্ষকতা করে তিনি মিক্সড কোর্সে সংস্কৃত, দর্শন ও কেমিস্ট্রি নিয়ে পাশ করলেন— তখন এটা চালু ছিল। তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে কয়েকটি বিষয়ে এম এ পড়ানো হত।

আমার বাবাও স্কটিশ কলেজেই এম এ পড়তেন। পাশ করার পর প্রথমে হিমালয়ের সাধুদের সঙ্গে কিছুকাল ধর্মচর্চা করেন। এঁদের জীবনযাত্রা খুব কঠিন ছিল। অনিয়মিত সামান্য খাওয়া, তাও প্রধানত শিলাজতু— পাথর কেটে কোথাও কোথাও গাঢ় গোলাপি চটচটে মধুর মতো ঘন রস বেরিয়ে জমা হত। খেতে মিষ্টি এবং বেশ কয়েকঘণ্টা শরীরকে পুষ্টি ও উষ্ণতা দিত। ঝরনার জল এবং দৈবাৎ দুয়েকটা ফলও মিলত।

তখন দেশে ধর্মজিজ্ঞাসা খুব একটা চলতি ব্যাপার ছিল। কোন নামে রূপে ভগবান সত্য— এই নিয়ে খুব চর্চা অনুসন্ধান চলত। এই আবহাওয়ার মধ্যে বাবাও আক্রান্ত হন এবং তাঁর বিশ্বাস জন্মায় প্রাচীন শাস্ত্রের ঋষিরা যখন হিমালয়েই বেশি ভক্তিমান, কীর্তিমান, সেজন্য ওখানে গিয়ে সন্ধান করা দরকার; গেলেনও তাই। নানা দেশের নানা ভাষাভাষীর নানান দার্শনিক ঋষিদের সঙ্গে একে একে আলাপ করলেন। যা শুনলেন তাতে ওঁর জিজ্ঞাসা মিটিল না। ফিরে এলেন। এলেন কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে, দক্ষিণেশ্বরে। পরে একে একে রাজস্থানের ও পাঞ্জাবের কয়েকটি স্কুলের হেডমাস্টারের কাজ করলেন। গরিবের ছেলেরও দেশভ্রমণের শখ থাকতে পারে। তখন এছাড়া কোনও উপায় ছিল না। রাজস্থানে পশুবধ নিষিদ্ধ ছিল বলে রাস্তায় হাঁটলে হরিণ ও ময়ূরের দল নির্ভয়ে পাশাপাশি হাঁটত, পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে গা-ঝাড়া দিয়ে পরম নির্ভয়ে আগের মতো হাঁটত। পাঞ্জাবে অমৃতসর, আম্বালা, বাটালা ও আরও দু-তিন জায়গায় কয়েকমাস স্কুলে পড়ানোর সুবাদেই ঘুরে ছিলেন। তাঁর স্বভাব ছিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সবকিছু লক্ষ করা। তাই তাঁর কাছে এসব জায়গার গার্হস্থ্য ও সমাজজীবনের বহু অনুপুঙ্খ শুনতে পেয়েছিলাম।

ধর্মানুসন্ধিৎসা তাঁকে নানাদিকে নিয়ে যেত। তাই রাজস্থান ও পাঞ্জাবে যাওয়া। পরে তিনি ছোট ভাইকে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে গেলেন দীক্ষা নেওয়ার আশায়। স্বামীজিরা বিশেষ উৎসাহ দেননি। ভোজনশালায় আশ্রমিকরা খেতে বসতেন; বাবা ও কাকাকে খাবার দেওয়া হত দরজার বাইরে মাটিতে। আশ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ ছিল মাথাপিছু দুখানি ধুতি, পরিধেয় ও উত্তরীয় হিসেবে। বাবা ও কাকাকে একখানি করে ধুতি দিয়ে বলা হল আধখানা ধুতি পরতে ও অপরার্ধ উত্তরীয় হিসেবে ব্যবহার করতে। সর্বধর্মসমন্বয়ের পীঠস্থানে ওই জাতিভেদটা বাবাকে বড় ধাক্কা দেয়। যেমন দেয় আশ্রমে কেবল কালীপুজোর অনুষ্ঠান; অন্য কোনও ধর্মের কোনও অনুষ্ঠান হত না। নিজেদের আদর্শ থেকেই ওঁরা এমন বহু ছোটবড় বিষয়ে সরে থাকতেন।

একবার পূর্ববঙ্গে বিধ্বংসী বন্যা হয়। ত্রাণকার্যে নিযুক্ত কিছু শিষ্যের সঙ্গে বাবাকেও যেতে হয়েছিল। প্রকাণ্ড বটগাছের ওপর বিশাল পাটা পেতে গাছের ওপর খিচুড়ি রান্না করে মোটা গোরুবাঁধা দড়িতে প্রকাণ্ড ডেকচি বেঁধে দড়ি ধরে অতি সাবধানে নামাতে হত। এ কাজ বাবাকেই দেওয়া হয়েছিল। নৌকোয় করে বারেবারে বন্যাপ্লুত গ্রামে প্রয়োজনমতো খিচুড়ি বিতরণ করতেন। কাজটা খুবই বিপজ্জনক। অতএব খ্রিস্টানের ছেলের প্রাণের ওপর দিয়ে বিপদটা যাক।

ওখান থেকে ফেরার বেশ কিছুদিন পরে কাশীতে প্লেগের মহামারি শুরু হয়। সেখানেও বাবার সঙ্গে আর একজন শিষ্যকে পাঠানো হল। সে কাশীতে গিয়েই উধাও হল। বাবা একা কিছুদিন রোগীদের যথারীতি শুশ্রূষা করে নিজে পেটের অসুখে পড়লেন। সেটা প্লেগ না হলেও যথেষ্ট কষ্টদায়ক ছিল। শরীর যখন যন্ত্রণায় নিরতিশয় কাতর, তখন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়িতে শুয়ে পড়লেন। দুদিন পরে এক অচেনা ভদ্রলোক এসে রুগ্ণ বাবাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিজের বাড়িতে নিয়ে প্রথম কদিন ডাক্তার দেখিয়ে বাবাকে সুস্থ করলেন— ইনি স্বাধীন বাংলার প্রথম রাজ্যপাল হরেন মুখোপাধ্যায়ের সহোদর ভাই তারক মুখোপাধ্যায়। বাবা তখন খুবই দুর্বল ও শয্যাগত। সুস্থ হলে তাঁর সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের আলোচনায় ব্যাপৃত রইলেন। মূল সূত্র নিয়ে এই দুই ধর্মান্বেষী আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এলেন যে, খ্রিস্টধর্ম প্রাচ্যেরই সৃষ্টি। কিন্তু সর্বত্রই একে সাহেবি পোশাকে, ভাষায়, নামে ও আচার-আচরণে বিদেশি আবরণে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছে। আর এদেশের লোকেরা এটাকে সাহেবি ধর্ম বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছে এবং নিজেদের ধর্মজীবন থেকে দূরে রেখেছে। এই মোহ-আবরণ সরিয়ে দিয়ে একে একান্তভাবে প্রাচ্যের ধর্ম বলে প্রকাশ করলে দেশের লোকের দ্বিধা হবে না খ্রিস্টান বলে পরিচিত হতে। ভারতীয় থেকেও পুরো খ্রিস্টান হয়ে থাকা সহজ হবে। এর জন্য আমার মামা ও কাকাকে সঙ্গে নিলেন। এর কিছু পরে একে রূপদান করে একটা অতিবাস্তব কর্মকাণ্ড সৃষ্টি করে এক অভিযানে সক্রিয় হওয়ার উদ্যোগ নিলেন। পাঞ্জাবের লুধিয়ানা থেকে চিঠি লেখেন। এই সিদ্ধান্ত

কাজে পরিণত করবার আগে অনেক দীর্ঘ প্রস্তুতি ছিল।

পিসিমা শান্তিনিকেতনে কাজে যোগ দিতে আসার পর বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। রবীন্দ্রনাথ দর্শনের কিছু কিছু বিষয়ের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার জন্য বাবার সঙ্গে বেশ কিছুকাল আলাপ করেন। অল্প কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ বিলেত গেলেন, বাবা কলকাতায় ফিরলেন।

ততদিনে বাবা ও পিসেমশায়দের প্রস্তাবিত ব্যাপারটি অনেকটাই বাস্তবায়িত হওয়ার দিকে এগিয়েছে। টাকার জোগাড় হল: পিসেমশায়ের অনেক নিজস্ব টাকা দান, ঠাকুরমার দিদি লীলাবতী দেবীর কাছ থেকে বেশ কিছু ধার— লীলাবতী জমিদারবাড়ির বিধবা। দিদিমা ও ঠাকুরমার কিছু টাকা নিয়ে একটা বড় মূলধনে প্রাথমিক কাজগুলো করা। জমি কেনা, বালেশ্বরের কাছে গিডনি গ্রামে, ধানজমি, পুষ্টিকর খাদ্যে লালিত শুয়োর, যার প্রচুর চাহিদা ছিল কলকাতার সাহেবদের কাছে। ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রভূত লাভজনক। সুবিস্তৃত ধানজমিতে তখনকার সবচেয়ে আধুনিক ধানচাষ পদ্ধতিতে ধানচাষ হত এবং সেটা খুবই লাভজনক হতে লাগল। ক্রমেই সাঁওতালদের বৃহৎ এক দরিদ্রদল সাগ্রহে এবং সানন্দে এগিয়ে এসেছিলেন। কারণ এঁদের ব্যবহারটা ছিল মানবিক ও সমান সমান আচরণে গঠিত।

গিডনিতে মা সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আমি ওই তিন বছর বয়সেই অত্যন্ত দুরন্ত ছিলাম আর আমার বোন দেড় বছর বয়সে অত্যন্ত শান্ত ছিল। মা দুজনের জন্য দুটি সাঁওতাল মেয়ে নিযুক্ত করেন দেখাশোনা করবার জন্য। আমারটির নাম রাইমণি, বোনেরটির নাম সুখী। একদিন জেদ করে ওদের বাড়ি গেলাম এবং অত্যন্ত জেদ করে ওদের যে হাঁড়িয়া জ্বাল দেওয়া হচ্ছিল, তার থেকে অল্প একটু খেলাম। এরপরে বাড়ি নিয়ে যেতে মা তাঁর তিন বছরের রক্তচক্ষু কন্যাকে দেখেই রাইমণিকে ছাড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। রাইমণির কাপড় জোর করেই ধরে থেকে সেযাত্রা রক্ষা হল। সুখী ও রাইমণি আমাদের শালবনে নিয়ে যেত। আমরা সেখানে রজন সংগ্রহ করতাম; মা-বাবা দুজনেই বেহালা বাজাতেন, ওঁদের কাজে লাগত। বনজঙ্গলে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোই প্রধান কাজ ছিল এবং অত্যন্ত আনন্দ পেতাম ছোটখাটো ঝরনার ধারে নানাজাতীয় জীব, গাছ, লতা দেখে বেড়াতে। এই স্বপ্নস্পর্শ থেকে উৎখাত হওয়াটা ভীষণ কষ্টকর ছিল।

বেশ চলল বছরতিনেক, লাভ ভালোই হচ্ছিল। চতুর্থ বছরে মারাত্মক খরা, খালবিল শুকিয়ে উঠল, চাষ একেবারে বন্ধ। শুয়োরদের স্নান ও পানের জলে এত টান পড়ল যে, সেগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হল। এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। আমরা ছোটরা পাশের ঘরে শুয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম খুব জোর আলোচনা হচ্ছে। বাবা সকালে, কাকা, মামা ও পিসেমশায়কে সামনে রেখে সাঁওতালদের বললেন, 'ভুখা মজুরদের পাতের ভাত ও শখের শুয়োরমাংস বেচতে পারবেন না তাঁরা। সব চাবি ওঁদের হাতে তুলে দিলেন, সাঁওতালরা সবাই মিলে সরবে কাঁদতে লাগলেন। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে আমরা সবাই কলকাতায় ফিরলাম দুদিন পরে। খ্রিস্টধর্মকে ভারতীয় রূপ দেওয়ার এই পর্ব ওখানেই শেষ হল। যতদূর জানি, এ চেষ্টা তেমনভাবে পরে কেউ করেনি। কলকাতায় বাবা, মামা ও কাকা ফিরলেন ওঁদের অংশের বিপুল ঋণের বোঝা নিয়ে। সকলেরই আয় কম, ফলে দীর্ঘকাল ধরে অতি কষ্টে ঋণ শোধ করা হল।

মাহেশের জমিদারের কন্যাদায় জটিল হয়ে উঠল এই কারণে যে, তিনি কন্যাদের জন্য প্রথম প্রজন্মের খ্রিস্টান পাত্র খুঁজছিলেন এবং সেটা ছিল বেশ বিরল। এদিকে বিপিনবিহারী দত্তেরও ওই সমস্যা। যাই হোক, লোকপরম্পরায় উভয়ে উভয়ের সন্ধান করে শেষপর্যন্ত দুই পরিবারের যোগ হল। মাহেশের জমিদারের প্রথমা কন্যা লীলাবতী দেবীর বিয়ে হল হুগলির সোনাটিকরি গ্রামের জমিদার ও পাশ-করা ডাক্তারের সঙ্গে। দ্বিতীয়া কন্যা প্রিয়বালার বিয়ে হল বিপিনবিহারী দত্ত— আমার ঠাকুরদার সঙ্গে। মাহেশের জমিদারের শখ ছিল হুগলির মহানদ (লোকে বলে মহানাদ) গ্রামে মেয়েজামাইয়ের বাস্তুবাড়ি তৈরি করে দেবেন। বড় বড় ঘরের চওড়া বারান্দা দেওয়া একটি বাড়ি, খানিকটা জায়গা ছেড়ে চার ঘরের দোতলা একটি অতিথিসদন তৈরি করে দেওয়া হল। সঙ্গে বড় একটা বাগান; মাতাদিঘি নামে সুবিস্তৃত এক দিঘি। বাড়ির উঠোন ছাড়িয়েই বেশ বড় একটি বাগান। সেখানে মজবুত ও সুদৃশ্য এক দোলনা, আর মার্বেল পাথরের দুটি সুদৃশ্য আসন। সারাদিনের স্কুলের হেডমাস্টারি, গির্জার পাদরির কাজ সেরে ওই শ্বেতপাথরের আসনে বসে ঠাকুরমার সঙ্গে বিদেশি সাহিত্যপাঠ, তার ভাষ্য ইত্যাদি দিয়ে ঠাকুমার জ্ঞান ও সাহিত্যের রসগ্রহণের পরিধি বাড়ানো। সাহিত্যিক, ধর্মীয়, সামাজিক, দার্শনিক আলোচনা ছাড়াও প্রেমালাপ ও হাস্যরসেরও কিছু যোগ মিলত।

বেশ চলছিল। এমন সময়ে ওঁদের প্রথম সন্তান কী এক রোগে ভুগে মারা গেল অতি শৈশবেই। স্নেহপ্রবণ মাহেশের শ্বশুরমশায় প্রায় তখনই জামাইকে ডাক্তারি পড়তে পাঠালেন। তিনি ফিরলে আশপাশের পাঁচখানি গ্রামের একমাত্র ডাক্তার হলেন। পরিশ্রম বাড়ল, দায়িত্ব ও কর্মভারও বাড়ল। বাড়ল শরীরের ওপর ধকল। যখন তাঁর তেতাল্লিশ বছর বয়স, তখন এক ভিনগ্রামের মানুষ ছই-ছাড়া এক গোরুর গাড়িতে করে রোগী দেখতে নিয়ে গেল। রোগী দেখে এসেই জ্বর। শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে শয্যা। রোগটা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। তখন এ রোগের নির্ণয় হত না। ছ-দিন ভুগে সাতদিনের দিন ঠাকুরদার মৃত্যু হয়।

ছত্রিশ বছরের ঠাকুরমার হাতে কোনও সঞ্চয় ছিল না। চারটি ছেলেমেয়ে। এমন সময়ে প্রেসবিটিয়ান মিশন ওঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বুদ্ধিমতী ছাত্রী বিদ্যুৎপ্রভাকে লুধিয়ানায় ডাক্তারি পড়তে পাঠালেন। সেখানে প্রত্যেকটি পত্রেই অত্যুচ্চ নম্বর পেয়ে প্রথম হলেন। এম বি বি এস ডিগ্রি পেলেন না। কারণ পিতার মৃত্যুর পরেই লুধিয়ানা চলে আসতে হয় এবং

সুখী ও রাইমণি আমাদের শালবনে নিয়ে যেত। আমরা সেখানে রজন সংগ্রহ করতাম; মা-বাবা দুজনেই বেহালা বাজাতেন, ওঁদের কাজে লাগত। বনজঙ্গলে ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোই প্রধান কাজ ছিল এবং অত্যন্ত আনন্দ পেতাম ছোটখাটো ঝরনার ধারে নানাজাতীয় জীব, গাছ, লতা দেখে বেড়াতে। এই স্বপ্নস্পর্শ থেকে উৎখাত হওয়াটা ভীষণ কষ্টকর ছিল।

বাবা বাড়ির গৃহিণীকে বললেন, আপনি তো জানেন আমি খদ্দর পরি, এসব কেন? তিনি বললেন, তুমি তো রায়সাহেবের কন্যাকে সম্প্রদান করবে। এতটুকু না হলে কি চলে? বাবা বললেন, তা হলে কাপড়ই সম্প্রদান করুক, আমাকে বাদ দিন।

অর্থাভাবেই আই এসসি পড়া হয়নি। বড় পিসিমার কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ যেন ওঁকে এম বি বি এসের পুরো কোর্সটা পড়তে দেওয়া হয়। ডিগ্রির জন্য লালায়িত ছিলেন না, ছিলেন জ্ঞানের জন্য। পুরো কোর্সটা উনি একাগ্র নিষ্ঠায় শেষ করেন। পরবর্তী জীবনে গয়ায় কর্মকালে উনি প্রচুর যশ অর্জন করেন।

ওখানে পরীক্ষার প্রত্যেক পত্রে নব্বই-এর ঘরে নম্বর পেয়েছিলেন, তার প্রতিলিপি আমি দেখেছি। পাশ করে উনি আমন্ত্রিত হন দিল্লির লেডি আরউইন কলেজে। কিছু কাজ করার পর রবীন্দ্রনাথ লুধিয়ানা কর্তৃপক্ষকে লেখেন একজন নির্ভরযোগ্য লেডি ডাক্তার পাঠাতে। তাঁরা উত্তরে জানান, যাকে পাঠাচ্ছি (পিসিমা) তেমন ছাত্রী আগে কখনও পাইনি, পরেও কখনও পাব বলে মনে হয় না। নিয়োগপত্র পেয়েই বড়পিসিমা সাহেবি মানের বেতন, কোয়ার্টার্স ও দুটি অনুচরের (সরকারি নিয়োগের) পাওনা ছেড়ে পরের ট্রেনেই চলে এলেন খড়ের ছাউনির মাটির ঘরে। মহা খুশি, কবির কাছাকাছি থাকতে পারবেন বলে।

এরপর ছোটভাইকে স্কুলে দিয়ে পরপর বিশপস কলেজে আই এসসি পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি এসসি মিক্সড কোর্স অর্থাৎ দর্শন, ইতিহাসের সঙ্গে কেমিস্ট্রি নিয়ে বি এ পাশ করেন। বাবা অসুস্থ মাকে দেখতে পরীক্ষার আগের সপ্তাহে কদিনের জন্য দেশে গেলে এম এ ক্লাসে মিশনারি সাহেব ক্যামেরন হস্টেলে বাবার ঘরটা আর একজনকে দিয়ে দিলেন। ফলে মফস্‌সলের আশ্রয়হীন ছেলে এম এ পড়বার সময়ে ক্লাসের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হয়েও পরীক্ষা দিতে পারলেন না। দেশে ফিরে গেলেন।

বাবার পরিচ্ছদ ছিল অতি সাধারণ। সেটা স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ, দেশে বহুসংখ্যক লোকই গান্ধীবাদী, বাবাও তাই। পরনে সাদা খদ্দরের থান। খদ্দর ভারী বলে বাবা নিজের কাপড় সর্বদা নিজেই কাচতেন ও ঠিকে মেয়েটির ওপর বাড়তি ওজন চাপাতেন না। খদ্দরের পাঞ্জাবি ও পায়ে বিদ্যাসাগরি চপ্পল। আমাদের এক অতি ধনী জ্ঞাতির বিয়েতে বাবা কন্যাসম্প্রদান করেন; কন্যার পিতা মারাত্মক অসুস্থ। ওদের বাড়ি থেকে অনুরোধ এল বাবা যেন সম্প্রদান করেন। অবস্থা বুঝে বাবা রাজি হলেন। পরদিন সকালে সাজসরঞ্জাম নিয়ে দর্জি হাজির। বাবা বাড়ির গৃহিণীকে বললেন, আপনি তো জানেন আমি খদ্দর পরি, এসব কেন? তিনি বললেন, তুমি তো রায়সাহেবের কন্যাকে সম্প্রদান করবে। এতটুকু না হলে কি চলে? বাবা বললেন, তা হলে কাপড়ই সম্প্রদান করুক, আমাকে বাদ দিন। কিছু বাক্‌বিতণ্ডার পরে ওঁরা রাজি হলেন। খদ্দর পরেই বাবা সম্প্রদান করলেন।

এরপরে ঘটনার আনুপূর্বিকতায় হয়তো খানিকটা গোলমাল থাকবে। তবে যতদূর মনে পড়ে, এরপরে বাবা হিমালয়ে যান, গুহায় গুহায় নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। ওই সময়টার শিক্ষিত বাঙালি যুবকের একাংশে ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ছিল। ধর্মের সত্য স্বরূপ কী এই নিয়ে নানা সংশয় ছিল আগেই বলেছি। বাংলা, ইংরেজি ও চলনসই হিন্দি ও ওড়িয়া বলতে পারতেন। ওদিকে খাদ্যাভাব অর্থাভাব খুব ছিল— পাহাড়ি গোরুমোষের যৎসামান্য দুধের অংশ এবং শিলাজতু। নিজের সব প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর না পেয়ে কয়েকমাসের মধ্যেই চলে আসেন।

এরপরে কাকাকে নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে আশ্রমবাসী হিসেবে থাকতে চান বাবা। কর্তৃপক্ষ একবছর পরে দীক্ষা দেবেন বলেছিলেন। দেননি। তাছাড়া, তাঁদের সঙ্গে যা যা ঘটে তা আগেই বলেছি।

এরপর খ্রিস্টধর্মকে প্রাচ্যধর্ম প্রমাণ করা ও দেশে সে ধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে গিডনিতে উদ্যোগের কথা আগেই লিখেছি।

এরপর শুরু হল ঋণশোধের পর্ব। পিসেমশায়ের শিয়ালদায় ওমদাবাজা লেনে সুবৃহৎ তিনতলা বাড়ি ছিল। তার বিক্রয়মূল্য ছিল প্রকাণ্ড। উনি মামাকে নিজের কাছে রেখে ম্যাট্রিক পাশ করাবার দায়িত্ব পেলেন। মুশকিল হল বাবার, কাকাকে ম্যাট্রিক পাশ করাবার দায়িত্ব। তাই বালেশ্বরে স্কুলে হেডমাস্টারের পদ নিলেন। কাকার শিক্ষা ও থাকা-খাওয়ার দায়িত্ব নিয়ে সেইসঙ্গে মাসে মাসে ঋণশোধ করতে লাগলেন। এরই মধ্যে এক মহাজন একটা বড় অঙ্কের পরিশোধ দাবি করলেন— এক মাসের মধ্যেই। আমার তখন বছরছয়েক বয়স, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম ভীষণ একটা অর্থকৃচ্ছ্রতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন বাবা, তবু সদাপ্রসন্ন হাসিখুশি, রসিক গল্প দিয়ে পরিস্থিতিকে জয় করেছিলেন তিনি।

বালেশ্বরের পরে আরও দু-চারটে স্কুলে হেডমাস্টারের পদে কাজ করেন বাবা। আশ্চর্য ভালো শিক্ষক ছিলেন তিনি। যাঁরা পড়েছেন তাঁর কাছে তাঁরা এই সেদিনও এমন গল্প করেছেন যে, হঠাৎ শুনলে অত্যুক্তি মনে হতে পারে। এ খবরটা আমরা বাবার জীবৎকালে জানতে পারিনি। জেনেছি অল্প কিছুদিন আগে। এবং এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই যা হয়, স্কুল বাবাকে দিয়ে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিয়ে নিত প্রায় বিনামূল্যেই। একটু বড় হয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, আমি দরাদরি করলে ওরা কাজটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্য কাউকে দিতেন। তিনি টাকাটা বেশি পেতেন কিন্তু কাজটার গুরুত্ব বুঝে সেটা করতে পারতেন না। বাবা বাংলা সাহিত্যে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পড়েছিলেন যে, সাহিত্যিক ভাষায় কিছু লেখা তাঁর পক্ষে অতি সহজ ছিল। সেই ভাষা তাঁর সহকর্মীদের কারও আয়ত্তে ছিল না। ফলে অর্থের দিক দিয়ে প্রবঞ্চনা পেলেও সম্মান পেয়েছিলেন প্রচুর।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাবার অনেক কথা হয়। কবি দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতেন; উপনিষৎ ও গীতার বিভিন্ন যোগ, যোগশাস্ত্রের সমবায় সূত্রগুলি আলোচনা হত। নতুন করে রাজযোগ সম্বন্ধে কবির আগ্রহ ছিল এবং এ নিয়ে আলোচনাও হত বেশি। কবির পাশের ঘরে বাবার অবস্থান। ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেন, তাতে দেশবাসীকে অনুযোগ করেন। শান্তিনিকেতনের সেই সভায় বাবা উপস্থিত ছিলেন।

বাবা বলতেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যে ক্ষোভ, দুঃখ ও অভিমান সেটা ছিল সম্পূর্ণতই যথাযথ। কবি যথার্থই বলেন যে, তিনি যদিও দীর্ঘকাল ধরে কবিতা লিখছেন— প্রায় চল্লিশ বছর, সে কবিতার উৎকর্ষ দেশের লোক বোঝেনি। যখন বিদেশি পাঠক, বোদ্ধা প্রশংসা করল, তখন দেশের লোকের চেতনা হল যে আমি কবিতা লিখে থাকি এবং সে কবিতা বিদ্বজ্জনের কাছে আদরণীয়। বিদেশি রসজ্ঞদের প্রশংসার পর দেশের লোকের স্বীকৃতি কবিকে আহত করে। এটা এতটাই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যে, বাবা একে অস্বাভাবিক বলে মনে করেননি। তাঁর কবিতা নিয়ে বেশ কিছু কবি-অকবি নানা ব্যঙ্গপরিহাস করেছিল। কবি তার উত্তর দিয়েছেন ছড়া বা সরস উক্তিতে। এর কিছুদিন পরে কবি আমন্ত্রিত হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান। বাবা কলকাতায় কাজে ফিরে আসেন। বাবা যথাসম্ভব লেখাপড়া ও পাঠনে মনোযোগী ছিলেন। ১৯৪৫ সালে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন। প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছ-দিন কাটাবার পরে সপ্তম দিনের সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিছু কথা শেষে বলেছিলেন, তার মধ্যে 'মাকে দেখিস' এটুকু ছাড়া অন্য কথাগুলি আবছা শুনেছিলাম, বুঝতে পারা যায়নি।

এ তো গেল বাবার কর্মজীবনের ছোট আলেখ্য। বাবার চিত্ত সর্বদাই নতুনভাবে, চিন্তায় উদ্‌বেলিত থাকত। বাবা কেমিস্ট্রির জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সোনা বানালেন। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, নাইট্রিক অ্যাসিডে না-গলা এবং রং না-হারানো— এই তিনটি পরীক্ষায় পাশ করলে আঠারো ক্যারাট পর্যন্ত সোনাতেই অনেক লাভ। বাবার মন ছিল খুবই বিজ্ঞাননিষ্ঠ। বি এসসি-তে কেমিস্ট্রি তাঁর পাঠ্য ছিল এবং অনেক বই পড়েছিলেন, অনেক ল্যাবরেটরির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছিলেন। লাভের মধ্যে মায়ের গলার মটরমালার একটি করে মটর যেত। অবশেষে খাঁটি সোনার চেয়ে কম মানের সোনা হল, যা নাইট্রিক অ্যাসিডে গলে না, রং পাল্টায় না। খামতি শুধু নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম ওজনের সোনা পাওয়া গেল। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, তা ঠিক পাওয়া গেল না। মেদিনীপুরের সবচেয়ে বড় স্বর্ণকার আমাদের পারিবারিক বন্ধু হেমন্ত, ফটোগ্রাফার শম্ভু সাহার জ্যাঠতুতো ভাই, সোনা কেনবার জন্য বাবাকে বহু অনরোধ করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সোনার টুকরো এবং রাসায়নিক দ্রব্য সব রাস্তায়। বাবা ছিলেন প্রকৃত আদর্শবাদী। অতএব, এত মাস ধরে যা করলেন তা যখন খাঁটি সোনায় উত্তীর্ণ হল না, তখন তিনি তাঁর পরিশ্রমকে ব্যর্থ জ্ঞান করে ওর থেকে সরে এলেন। এবং একদিনও পিছনে ফিরে চাইলেন না। আঘাত নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, কিন্তু বাবার অনুশোচনায় কোনও প্রকাশই ছিল না। দরিদ্র শিক্ষক এতদিন ধরে সাধনায় ব্যর্থ হলেন, এজন্য কোনও আর্থিক ক্ষোভ তাঁর একটুও ছিল না।

এরমধ্যে স্কুলের পরীক্ষার প্রচুর টাকার কালি স্কুল থেকে কেনা হয় দেখে ভাবলেন স্বদেশি রসায়নে প্রস্তুত কালি থাকলে দেশের অনেক টাকা বাঁচে। কাজেই

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবর্ধনা

এরপরই শুরু হল দীর্ঘদিন ধরে কালির পর্ব। নিশাদল এবং আরও চার-পাঁচটি উপাদানকে তাপে ও মিশ্রণের নানা প্রক্রিয়ায় কালিতে পরিণত করার বিচিত্র প্রচেষ্টা। সাত-আটটি বোতলে নানা গুণের সিদ্ধিযুক্ত কালি দেখা যেত। এরই শেষদিকে সাতদিন ভুগে সমস্ত পরীক্ষানিরীক্ষার বাইরে চলে গেলেন। কয়েকদিন পর আমার ভাই ও আমি বোতলগুলো থেকে কালি ঢেলে দেখলাম। তলায় তলানি জমে না এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে গলে না। শুকিয়ে গেলে জলে দিলে রং একেবারে পাকা থাকে। তখন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় অনভিজ্ঞ আমরা ভাইবোনেরা সম্পূর্ণ বিমূঢ় অবস্থায় বসে রইলাম। রাসায়নিক পদার্থ সবই হাতের কাছে, কিন্তু কোনটা কতখানি কখন দিতে হবে, কতক্ষণ জ্বাল দিতে হবে তা-ও আমরা জানি না। বহু বছর বোতলগুলি ফেলতে পারিনি। ওই কালি ব্যবহার করেছি অনেকদিন, কিন্তু ওর রহস্য মোচন করতে পারিনি, কারণ রসায়ন সম্বন্ধে অতটা জ্ঞান ছিল না। ওই একনিষ্ঠ সাধনাও ছিল না।

বাবা যে কাজে হাত দিতেন, সেটা নিখুঁতভাবে না করে উঠতে চাইতেন না। তাঁর এ গুণটা আমাদের কারওরই ছিল না। এসব রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যেই স্কুলের হেডমাস্টার ও অন্য এক ধনী লোক দুটি বৃহৎ গ্রন্থ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে দেন। দুটি কাজই খুব কঠিন ছিল। শুধু ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদমাত্র নয়। বাবার আদর্শ ছিল অনুবাদটি যেন যথার্থ বাংলা বাগ্‌ধারাকে মেনে চলে। বহু পরিশ্রম করে বই দুটি অনুবাদ করার পরে মোটামুটি 'ভালো হয়েছে, বেশ হয়েছে' বলা হল এবং প্রতিশ্রুত অর্থের অর্ধেকের কম দিয়ে বিদায় দেওয়া হল। অনুবাদ দুটির খুব প্রশংসা হওয়ার পরে বাবা আরও অনুবাদ করার জন্য আমন্ত্রিত হন, কিন্তু পরিশ্রমের মর্যাদা ও অর্থমূল্য না পাওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর কোনও অনুবাদ করেননি। অথচ বাবা সংস্কৃত ভালো জানতেন বলে তাঁর বাংলা অনুবাদগুলি সহজ সুখপাঠ্য এবং যথাযথ হত।

শেষাংশ আগামী সংখ্যায়

সম্পাদক অশোক মিত্র ও লেখকের সৌজন্যে 'আরেক রকম', ১৬ জুন ২০১৩ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

বাবার মন ছিল খুবই বিজ্ঞাননিষ্ঠ। লাভের মধ্যে মায়ের গলার মটরমালার একটি করে মটর যেত। অবশেষে খাঁটি সোনার চেয়ে কম মানের সোনা হল, যা নাইট্রিক অ্যাসিডে গলে না, রং পাল্টায় না।

বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠি

সূত্র-সংযোজন: দময়ন্তী বসু সিং

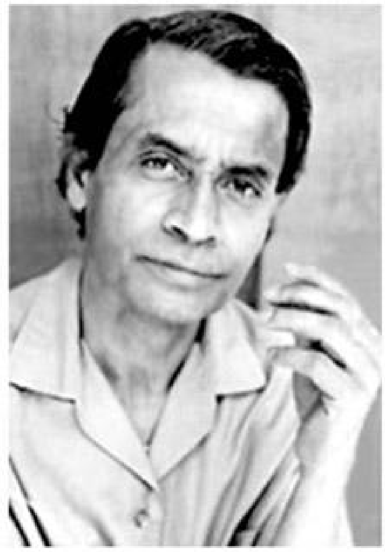

প্রা ক ক থ ন

ঐতিহাসিক, সমালোচক, প্রাবন্ধিক ও চিন্তাবিদ নীহাররঞ্জন রায় স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেস দলের পৃষ্ঠপোষকতার অপরাধে কিছু সময় রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে প্রেসিডেন্সি জেলে অবরুদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে লেখা এই কতিপয় চিঠির মধ্য দিয়ে নীহাররঞ্জন ও বুদ্ধদেব বসুর সম্পর্কের ছবিটি খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। উভয়পক্ষই পরস্পরের কাছে নির্দ্বিধায় নিজস্ব মতামত জানাতেন খোলা মনে। সেই কালের বিদগ্ধ সমাজে কী ধরনের বৌদ্ধিক বিনিময় চলত, পত্র ক'টি তারও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই দুই চিন্তাবিদের মধ্যে মতামতের বিরোধ অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা কখনও মনান্তরের কারণ হয়নি। কারণ তাঁরা দু'জনেই স্পষ্টবক্তা ও সৎ সমালোচক ছিলেন। শিল্প-সাহিত্যের সমালোচনায় ব্যক্তিগত পক্ষপাত যে থাকাই স্বাভাবিক, সেটা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন বলেই তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

চিঠিগুলির সঙ্গে টীকা-সংযুক্ত করা থেকে আমি বিরত রইলাম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গ থেকে পাঠক পত্রে উল্লিখিত মানুষগুলির পরিচয় বুঝতে পারবেন। তাঁরা সকলেই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে আজও অতি সুপরিচিত ব্যক্তি। শুধু দুটি নাম, কিছু পাঠকের কাছে অপরিচিত লাগতে পারে— এঁরা বিমল সিংহ ও রবি ঘোষ।

বিমলচন্দ্র সিংহ (১৯১৭-১৯৬১) অতি সুপণ্ডিত ও চিন্তাশীল লেখক, যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভায় অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন।

রবি ঘোষ (রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ: ১৮৮৩-১৯৪৩): খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ। মৃত্যুর সময়ে রিপন কলেজের (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যক্ষ ছিলেন।

বুদ্ধদেব বসুকে লেখা নীহাররঞ্জন রায়ের এই পত্রগুচ্ছ গুণীজন আকীর্ণ সেই সময়ের পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতির মুক্ত জগতের এক অভ্রান্ত দলিল।

নীহাররঞ্জন রায়ের চিঠি /১

From: Dr. Niharranjan Roy
(State Prisoner)
C/o. Deputy Commissioner, Special Branch
14, Lord Sinha Road, Calcutta.

Presidency Jail
18 Nov 43

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি আজ প্রায় দু'হপ্তার উপর পেয়েছি। এর ভেতর জবাব দেবার সময় ও সুযোগের অভাব হয়নি। কিন্তু চিঠির নির্দিষ্ট সংখ্যার ভেতর কুলিয়ে উঠতে পারিনি। তবে, অমিয় চক্রবর্তী ও জ্যোতির্ময় রায় মশায়ের কাছে আমার খবর আশা করি পেয়েছেন। আপনাকে জানাবার মতন ২/১ টা কথাও তাঁদের চিঠিতে লিখেছিলুম: আশা করি যথাসময়ে তা ছেপেছেন। সে কথাগুলোর উল্লেখ এ-চিঠিতে আর করবো না; স্থানাভাব।

হ্যাঁ, আমাদের আজকাল যে চিঠির কাগজ দে'য়া হচ্ছে সেটা লোভনীয় এবং এই কাগজের দুর্ভিক্ষের দিনে একটু বিস্ময়কর। (গোড়ার দিকে খুবই খারাপ কাগজ দেওয়া হ'তো। চিঠির কাগজটা বাইরে যায়, সেটা ভালো হওয়া দরকার নয় কি?) বাইরেও তো বোধহয়

আজকাল কাগজের বাজারের অবস্থা একটু ভাল মনে হ'চ্ছে। প্রচুর বই ছাপা হ'চ্ছে প্রতি মাসে, অনেক সাময়িক পত্র এবং বিশ্বভারতী পত্রিকার একটু নমুনা যা' দেখলুম, তা'তে মনে হ'চ্ছে ওদের এ সম্বন্ধে কিছু ভাবনাই নেই। অনেকে অনেক বই বা'র করছেন, আপনারাও তো সমানে ছেপে যাচ্ছেন। অধিকাংশই দেখবার সুযোগ হ'চ্ছে না। পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে, শুধু জেলখানার আকাশ নিশ্চল; মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয়, পেছনে পড়ে রইলুম! যখন বেরিয়ে যাবো, নাগাল ধরতে পারবো কি? আমার বই ক'খানা ছাপা বন্ধ হ'য়ে পড়ে রইলো; নোতুন কিছু লেখাও বন্ধ! বাইরে সবাই ছুটছে, এগিয়ে যাচ্ছে। আনন্দ হয় শুনতে দেখতে; নিজের কথা ভেবে দুঃখও হয় খুব।

আপনার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বই ভালই হ'বে; ওগুলো তো সবই প্রায় আমার জানা। ও ধরনের রচনা আমার পক্ষে নয় সত্য— আমি নিজে বস্তু-গত আলোচনার পক্ষপাতী— কিন্তু আমার ভালো লাগে এবং তার মূল্য কখনও আমি অস্বীকার করিনে। বিশেষ করে আপনার বলার ভঙ্গীটুকুও তো মূল্যবান। তবে আধুনিক বাঙালী কবিদের সমালোচনার বইটা শেষপর্যন্ত কেমন দাঁড়াবে আমি বুঝতে পাচ্ছিনে। বিভিন্ন কাগজে সবগুলো রচনাই হয়ত আমি পড়েছি; অনেক ক্ষেত্রেই আমার মনে হ'য়েছিল বলার মধ্যে একটু সংযম-শাসনের শৈথিল্য। মতামতের বিরোধীতার কথা বলছিনে মোটেই; আলোচকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড বা নিকষের কথাই বলছি— তার একটু অভাব যেন লক্ষ্য করেছিলুম। এটা আমার একটা ধারণা মাত্র; হয়ত ভুলও হ'তে পারে। এখন আপনার বয়স ঠিক পঁইত্রিশ, আর আমি পুরা দু'মাস পর উনচল্লিশ পেরিয়ে চল্লিশে পা' দেবো। আমার কিন্তু এখনও মনে হ'চ্ছে না যৌবন অতিক্রম করেছি বা করতে চলেছি। শুনে হয়ত একটু অবাকই হ'বেন। কিছুদিন এই প্রায় বছর দেড় দুই ধরে মনে হ'চ্ছে, সত্যিকার দেবার মত ধন এতদিনে সঞ্চয় হ'লো। প্রস্তুত হ'তেই গেলো পঁইত্রিশের উপর যাকে বলে ব্যক্তিগত জীবন। (এইবার সরকারী জীবন, দেবার জীবন আরম্ভ হ'লো; যা' সঞ্চয় করেছি তা' মজাতে যাবে আরো ২/৩ টা বছর এবং সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'বে ফল ফলানো। কিন্তু 'এহ বাহ্য'।) আপনার 'উত্তর তিরিশে'র যেটুকু নমুনা দেখেছিলুম অলকায়, ভালই লেগেছিল। এবং আশা করি বইখানা উপভোগ্য হ'বে।

আমার কিন্তু এখনও মনে হ'চ্ছে না যৌবন অতিক্রম করেছি বা করতে চলেছি। শুনে হয়ত একটু অবাকই হ'বেন। কিছুদিন এই প্রায় বছর দেড় দুই ধরে মনে হ'চ্ছে, সত্যিকার দেবার মত ধন এতদিনে সঞ্চয় হ'লো। প্রস্তুত হ'তেই গেলো পঁইত্রিশের উপর যাকে বলে ব্যক্তিগত জীবন।

শরৎবাবু সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে একমত। উনি 'বিন্দুর ছেলে' গল্পবইটিতে 'রামের সুমতি' এবং অন্যত্র 'মহেশ' ছাড়া আর কোনো সার্থক ছোটগল্প কখনও লেখেনইনি।' শরৎবাবু সম্বন্ধে আমার বিস্তৃত মত তাঁর জীবিতাবস্থায়ই আমি প্রকাশ করেছিলুম; তা' তখন শরৎবাবুর এবং অনেক আধুনিক লেখকের পছন্দসই হয়নি।' কিন্তু বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনি আমার উপর যে-মত আরোপ করেছেন তা' একটু অবিচার। আপনি বোধহয় আমার বইখানা ভালো করে পড়বার অবসর পাননি; একথা আগেও আপনার সমালোচনা পড়ে' মনে হ'য়েছিলো। এখনো আবার মনে হ'লো। বঙ্কিমকে আমি বাস্তবনিষ্ঠ বলেছি শুনে আমার চমক লাগলো; আপনি যদি দয়া করে আমার বই'র ৩৯৪-৪০০ পৃষ্ঠা একটু চোখ বুলিয়ে দেখেন, দেখতে পাবেন আমি যে-কথা বলতে চেয়েছি তা'র সারমর্ম হ'চ্ছে, ''বাস্তবনিষ্ঠা অপেক্ষা রোমান্সনিষ্ঠা ছিল তাঁহার প্রবলতর।'' চলতি ধারণার বিরুদ্ধে প্রথম যখন কিছু বলতে হয়, তখন এই ধরনের সংযত উক্তিই আমার চরিত্রগত। বঙ্কিমের একান্ত রোম্যান্টিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণ কি তা-ও আমি সেই উপলক্ষে বলেছি— রবীন্দ্রপ্রকৃতির পার্থক্যও সেখানে উল্লেখ করেছি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধেও আপনি একটু আমায় অবিচার করছেন। ছোটগল্প নিবন্ধের প্রথম বাক্যই ''সত্য করিয়া বলিতে গেলে বাঙ্‌লা সাহিত্যে সর্বপ্রথম ছোটগল্পের সৃষ্টিই করিলেন রবীন্দ্রনাথ।'' (২৩৫ পৃষ্ঠা) এর পরের বাক্যটির সঙ্গে আপনার চিঠির 'রবীন্দ্রনাথ' আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখক— কোথায় যে অমিল তা' আমি ধরতে পাচ্ছিনে। যতদূর মনে হ'চ্ছে, আমার 'গীতধর্মী' কথাটিই আপনাদের মনে যত গোলমালের সৃষ্টি করেছে। 'গীতধর্মী' বিশেষণটি আমি প্রয়োগ করেছি, 'নষ্টনীড়'-পূর্ব গল্পগুলি সম্বন্ধে; গীতধর্ম বাস্তবধর্মের বিরোধী নয়; এই গল্পগুলির অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্ত বাস্তবতা কোথাও আমি অস্বীকার করিনি, বরং তারই ভেতর গীতধর্ম কি করে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেছে এবং আমাদের অতিপরিচিত জীবনাংশগুলিকে কি করে উজ্জ্বলতর করেছে তা-ই দেখাতে চেষ্টা করেছি। ২য় সংস্করণে আমার বক্তব্য আমি আরো একটু স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছি; চিঠিতে তা সম্ভব নয়। আশা করি সময় আসবে, যখন আমার বক্তব্য ক্রমশ আরো স্বীকৃত হ'বে। আজ শেষ করি।

নীহাররঞ্জন রায়

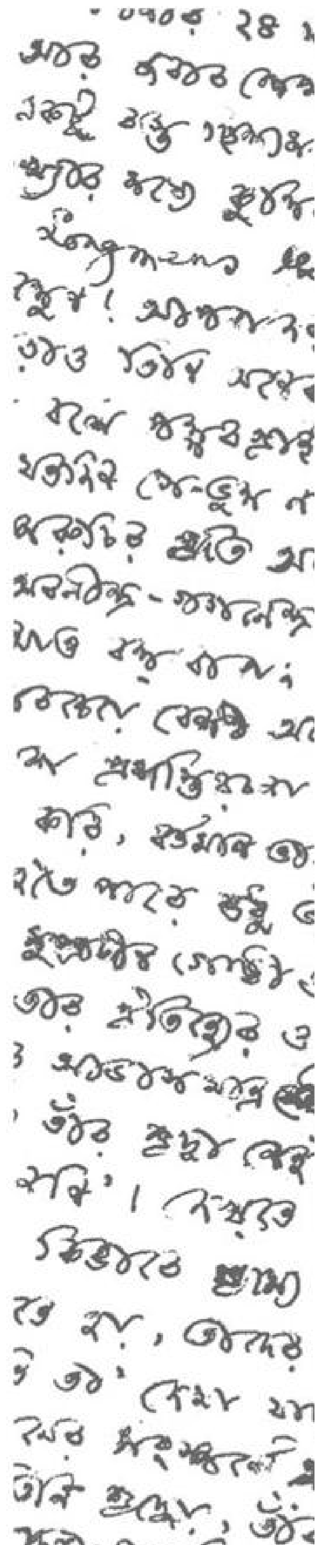

নীহাররঞ্জন রায়ের চিঠি /২

যামিনী রায়

মানুষ যামিনী রায় আর্টিস্ট যামিনী রায়ের চেয়ে বড়ো।

From: Dr. Niharranjan Roy (State Prisoner)
Care of Dy Commissioner, Special Branch
14, Lord Sinha Road, Calcutta.

Presidency Jail
25 Nov 43

প্রিয়বরেষু,

গত হ'প্তায় আপনাকে লিখেছি, পরে খেয়াল হলো আপনার সব কথার জবাব দেয়া হয়নি'। জবাব দিতেই হ'বে এমন কিছু কথা নয়, তবু সাহিত্য কথা বলবার মধ্যে একটু আনন্দ আছে; তা' থেকে বঞ্চিত হ'য়ে লাভ নেই। আশা করি আমার গত হ'প্তার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছেন।

নীরদ চৌধুরী মশায়ের প্রবন্ধ- গগন বাবুর উপর- পড়লুম। নোতুন মনে হ'লো না। নীরদ বাবুর মতামতের সঙ্গে আমি বহুদিন পরিচিত; তাছাড়া গগন বাবুর উপর তিনি ইংরাজীতে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন মডার্ন রিভিয়ুতে গগন বাবুর মৃত্যুর পরটাতেই। এ-প্রবন্ধে একই কথা বলেছেন, তবে তার সঙ্গে Clive Bell, Rogers Fry ইত্যাদি জুড়ে ছবি দেখার এবং ছবি বিশ্লেষণ করবার রীতি পদ্ধতি খানিকটা আলোচনা করেছেন, দেখতে পাচ্ছি। প্রবন্ধটি মোটের উপর ভালই— এসব ধরনের আলোচনা আমাদের দেশে তো খুবই কম— তবে ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে কিংবা অবনীন্দ্র সম্বন্ধে আমি নীরদ বাবুর সঙ্গে একমত নয়। Clive Bell-Roger Fry-র মানদণ্ড দিয়ে কিংবা পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শ দিয়ে ভারতীয় শিল্পবিচার চলে না, তাকে বিচার করতে হ'লে তার নিজস্ব শিল্পাদর্শ ও শিল্পসংস্কার দিয়েই করতে হ'বে। প্রত্যেক জাতি, দেশ ও কাল যেমন তার শিল্প সৃষ্টি করে, তেমনি তার শিল্পাদর্শ এবং শিল্পসংস্কারও গড়ে তোলে। একটা থেকে আর একটা বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না বলেই আমার ধারণা। নীরদ বাবুর মতো আমিও মনে করি গগন বাবু তাঁর যুগের অন্যতম significant artist, এবং বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী; তিনি তাঁর যথার্থ সম্মান পাননি। লোকে তাঁকে যে label দিতে চেয়েছে, সে label তাঁর নয়, তবে আমার মানদণ্ড নীরদ বাবুর চেয়ে পৃথক। যদি কোনোদিন সময় ও সুযোগ আসে, বলবো। অস্থির হ'য়ে লাভ কি?

যামিনী বাবু সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে একমত। মানুষ যামিনী রায় আর্টিস্ট যামিনী রায়ের চেয়ে বড়ো। আজ ষোলো বছর হ'লো আমি তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানি। দুঃখ দারিদ্র্য অস্বাস্থ্যের মধ্যে তাঁকে আমি যুঝতে দেখেছি; অর্থের লোভকে তুচ্ছজ্ঞান করতে দেখেছি, মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে দেখেছি— সব তাঁর শিল্পের জন্য। এমন অনন্যচিত্ত সাধনা বর্তমানকালে খুব বেশি দেখা যায় না, বিশেষত দুর্গত পরাধীন দেশে। তিনি নিরলস, সদালাপী, অমায়িক। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ওঁর সামনে সে কথা বলিনে; তাঁর শিল্পের আমি অনুরাগী, কিন্তু তাও তাঁর কাছে প্রকাশ করিনে। কারণ, এমন মানুষেরও দুর্বলতা আছে, যে দুর্বলতা শিল্পীর পক্ষে, তাঁর মতন কৃতী সুপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর পক্ষেও মারাত্মক। আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি গত কয়েকবৎসর যাবৎ তিনি 'Patronised' হ'চ্ছেন, pampered হ'চ্ছেন— এমন লোকদের দ্বারা যাঁরা 'ডিলেটান্ট', যারা ড্রসিংরুম বিলাসী সৌখীন ব্যক্তি, যাদের কাছে বর্তমান জগতের নিগ্রো আর্টের, ঈষ্টার্ন আইল্যান্ডের, গ্রাম্যভারতের, হাওয়াই-হনলুলুর আর্টের উচ্ছাসময় প্রশংসা 'ফ্যাসন'। যাঁরা মনে করেন তাঁরা এক নোতুন জগৎ আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারের গৌরবটা তাঁরা ভালবাসেন, যামিনী রায়ের শিল্পকে নয়! এবং তার চেয়ে দুঃখের, যামিনী বাবু এর রহস্যটা না বুঝে তাদের সমস্ত উচ্ছাসময় বাণী বিশ্বাস করেছেন। এবং শুধু তা-ই নয়, তিনি আজকাল তাঁর শিল্পের Critical এবং Intellectual ব্যাখ্যাও দিয়ে থাকেন! আমার মনে হয় এটা তাঁর শিল্পের পক্ষে ক্ষতিকর হ'য়েছে। ১৯২৭ সাল থেকে দেখে আসছি, তিনি ক্রমাগতই এগুচ্ছিলেন, নোতুন পথ নোতুন ভঙ্গি আবিষ্কার করছিলেন; তখন লোকে তাঁকে চিনতোনা। তাঁর ভাঙ্গাবাড়ীর ছোট্ট ঘরে লোকের ভিড় জমতোনা; তখন দিনের পর দিন তাঁর ঘরে বসে তুলি টানা দেখেছি, অবাক হ'য়েছি। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এইভাবে গেছে। ১৯৩৮ সালে বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি তিনি থেমে গেছেন; নিরলস কর্ম সত্ত্বেও তাঁর শিল্প প্রাণাবেগ হারিয়েছে, dainty হ'চ্ছে, refined হ'চ্ছে, রঙে উজ্জ্বল হ'চ্ছে। প্রাথমিক দৃষ্টিতে সুন্দর হ'চ্ছে, পূর্ণতর হ'চ্ছে,

কিন্তু Consummation তো শিল্পীর কাম্য নয়, সেই অবস্থায় আসবার আগেই Consummation সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আদিম শক্তির উৎস থেকে আবার প্রাণাবেগ আহরণ করতে হয়। নইলে শেষ সীমায় পৌঁছবার সার্থকতাই একান্ত হ'য়ে উঠে। অপূর্ণতা ও অশেষের মধ্যে যে শক্তি তার আনন্দ হারিয়ে যায়। Consummation সুন্দর, তা' পথিক জনের মন ভোলায়— যামিনী বাবুকে বড়, ক্ষমতাবান শিল্পী বলে মনে করি, পথিক জনের মন ভোলাবার বেসাতি তাঁর ছবি নয়। আপনার চিঠিতে খবর পেলাম তিনি নোতুন পথ আবার বা'র করেছেন; বড় আনন্দ হ'লো। যামিনী বাবুর resurrection হওয়া উচিত।— কিন্তু এসমস্তই বললাম শুধু আপনাকে, আর কারু সঙ্গেই আলোচ্য নয়, অর্থাৎ strictly confidential.

প্রতিভা দেবী ও আপনি প্রীতি নমস্কার লউন। জ্যোতির্ময় বাবুকে চিঠির জবাব দিতে বলবেন দয়া করে। আপনার কন্যাকারা কেমন? অজিত বাবুর খবর কি? দিগন্ত এখনও পৌঁছেনি।'

আপনার 'চার অধ্যায়ে''র সমালোচনাটাই ভাল লাগলো খুব। ''র-সা-ভূমিকা'' ২য় সংস্করণে ও বই সম্বন্ধে আমি যা' লিখেছি, তার সঙ্গে আপনার মতামতের অদ্ভুত মিল পাওয়া যাবে। কবির উপন্যাসগুলো সম্বন্ধে বোধহয় আমরা একমত। আমি বোধহয় আপনার চেয়েও কঠোর হ'য়েছি! কিন্তু আমার বই যে কবে বেরুবে!

নীহাররঞ্জন রায়

> চীনে ছবি আমার বড় প্রিয়; এমন সুন্দর দিব্য সম্পদ পৃথিবীর খুব বেশি জাতের নেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে হাজারো বছরের সেই ধারা আজো সমান অব্যাহত— এত দুঃখ দৈন্য যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষ উপপ্লবের মধ্যেও।

নীহাররঞ্জন রায়ের চিঠি /৩

Letters to be addressed <u>directly</u> to Dr. Niharranjan Roy (State Prisoner)
Presidency Jail, Calcutta.
17 Dec 1943

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিতে অনেক খবর পেলাম এবার; অনেকখানি তৃষ্ণা মিটলো। বাইরের সাহিত্য জগতের খবর বেশি ত পাইনে; যতটুকু পাই, ততটুকুই ভাল লাগে। Longmans Miscellany-র খবর পেয়ে বইটা দেখতে খুবই আগ্রহ হ'চ্ছে; বোধ হয় ২/৪ দিনের ভেতর পাবোও— বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীকে লিখেছি কিনে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু খুব যে উৎসাহ বোধ করছি, বলতে পারিনে। এধরনের প্রচেষ্টা যত দেখেছি, পেছনে হয় নিছক ব্যবসায় বুদ্ধি না হয় কোনো ইডিয়লজি প্রচার। অবশ্যি, জানিনে Longmans তার ব্যতিক্রম হ'বে কিনা। সব জাত ও জাতি মিললেই আন্তর্জাতিক হয় না— তা'লে তো Firpo বা Nanking সবচেয়ে আন্তর্জাতিক! তাছাড়া, আপনি ও বিষ্ণু বাবু ছাড়া অন্য বাঙালি লেখকদের সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় নয়; সুধীন বাবু কী করে যামিনী বাবুর উপর লিখতে রাজী হ'লেন? আপনার চিঠির বিবরণ পড়ে মনে হ'চ্ছে Longmans একটা topical stunt বাজারে ছেড়েছে; চীনা-ইংরাজ-মার্কিনী কলকাতার বর্তমান বাজারে কাটবে ভাল। Serious literary publication বলে নেয়া যায় কিনা, না দেখে বলা উচিত হ'বে না হয়ত, তবে মনে হ'চ্ছে New York Times-র Sunday Supplement-র একটা ভারতীয় রূপ হয়ত দেখবো। Tomorrow-র সংখ্যাটা দেখবার জন্য যথার্থ উৎসাহ বোধ করছি; মনে হ'চ্ছে ও জিনিসটা হয়ত ভালো উৎরাতে পারে। আসল কথা বিদেশীর মন কাড়বার জন্যে বা চোখ ভুলাবার জন্য যার জন্ম সে জিনিস ভাল হ'তে পারে না; নিজের দেশ ও জাতির মন কাড়তে পারলে একই সঙ্গে দেশ ও বিদেশ সকলকে পাওয়া যায়। আমার এখনও ধারণা, সর্বভারতীয় সাহিত্যের মিলনক্ষেত্র হিন্দীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণেই হওয়া উচিত— ইংরাজীতে নয়, কিন্তু সে অন্য তর্ক।

'সংকেত'- প্রকাশের খবর উৎসাহজনক; নামটি কিন্তু বেশ হ'য়েছে। প্রথম সংখ্যাটি দেখবার বড় আগ্রহ হ'চ্ছে। কাল ইনটারভ্যুতে বলে দিয়েছি; আসছে ইনটারভ্যুতে হয়ত পাবো। কিন্তু কামাক্ষীপ্রসাদের স্ত্রী'র অসুস্থতার খবরে খুব উদ্বিগ্ন বোধ করছি। হিমোফিলিয়া সত্যি অচিকিৎস্য ব্যাধি; কিন্তু ও diagnosis কি ঠিক হ'য়েছে; মেয়েদের তো ও-রোগ হয়না বলেই ডাক্তারী শাস্ত্র এতদিন বলে এসেছে। যাক, এখন তো রোগিণী ভালো হ'য়ে উঠুন— শাস্ত্র চুলোয় যাক। রক্তক্ষরণ কি বন্ধ হ'য়েছে? এখন কেমন আছেন? কামনা করছি, তিনি শীগগীর সেরে উঠুন।

বিমল সিংহ মশায় তাঁর একখণ্ড সদ্যপ্রকাশিত বই আমায় কিছুদিন হ'লো পাঠিয়েছেন। রচনা সব ক'টিই আমার পরিচিত; আগেই সাময়িকপত্রে পড়েছিলুম, তা'ছাড়া এসব সম্বন্ধে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ আলোচনাও হ'য়েছে। ওঁর চেষ্টাটা সত্যিই ভালো। আধুনিক সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাও আছে। তবে ধরতাই বুলির প্রভাব একেবারে এড়াতে পারেননি'। তবু, ওঁর সম্বন্ধে আমি আশা রাখি; ওঁর বয়স এখনও ত্রিশের নীচে, পড়াশুনা করেন, নিজে ভাবতে জানেন, সমাজবিদ্যার ছাত্র, এবং সংস্কৃত ভাল জানেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও অভিজ্ঞতা বাড়লে ভাল জিনিস আশা করা যায়— সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহ আছে।

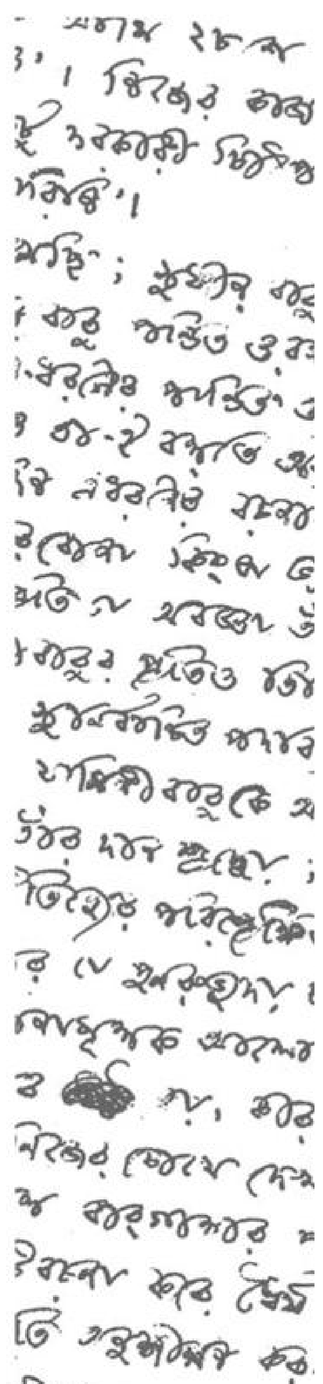

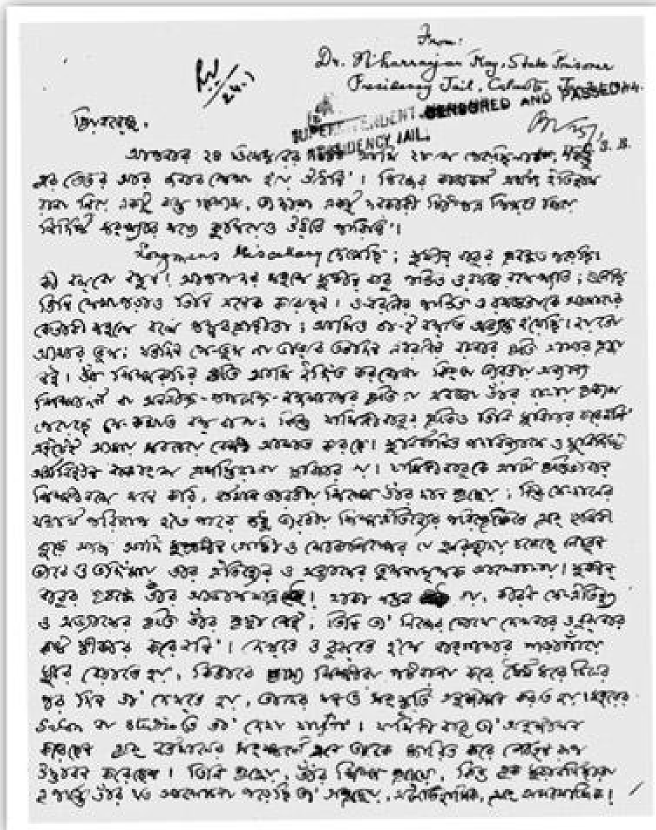
From:
Dr. Niharranjan Roy, State Prisoner
Presidency Jail, Calcutta
SUPERINTENDENT PRESIDENCY JAIL
CENSORED AND PASSED

নীহাররঞ্জন রায়ের চিঠি /৪

From: Dr. Niharranjan Roy, State Preisoner
Presidency Jail, Calcutta
Jan 21, 1944

প্রিয়বরেষু,

আপনার ২৪ ডিসেম্বরের চিঠি আমি ২৮ শে পেয়েছিলাম; কিন্তু এর ভেতর আর জবাব লেখা হ'য়ে ওঠেনি'। নিজের কাজকর্ম অর্থাৎ ইতিহাস রচনা নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম। তাছাড়া একটু দরকারী চিঠিপত্র লিখতে গিয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে কুলিয়েও উঠতে পারিনি'।

Longmens Miscllany দেখেছি; সুধীন বাবুর প্রবন্ধও পড়েছি। কী বলবো বলুন! আপনাদের মহলে সুধীন বাবু পণ্ডিত ও রসজ্ঞ বলে খ্যাত; শুনেছি তিনি লেখাপড়াও তিনি অনেক করেছেন। ও-ধরনের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতাকে আমাদের কেতাবী মহলে বলে পল্লবগ্রাহীতা; আমিও তা-ই বলতে অভ্যস্ত হ'য়েছি। হ'য়তো আমার ভুল; যতদিন সে-

ও-ধরনের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতাকে আমাদের কেতাবী মহলে বলে পল্লবগ্রাহীতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তবে বর্তমান বইখানা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়— যদিও বিনয় ঘোষ বা গোপাল হালদারের বই'র চেয়ে ভালো।

Yeh Chien-yu-র Exhibition-র খবর কাগজে পড়েছিলুম, ইনটারভ্যুতেও এক বন্ধুর মুখেও শুনেছিলুম; আপনার চিঠিতেও তাঁর কথা পড়লুম। বাইরে থাকলে নিশ্চয়ই আলাপ পরিচয় হ'তো! চীনে ছবি আমার বড় প্রিয়; এমন সুন্দর দিব্য সম্পদ পৃথিবীর খুব বেশি জাতের নেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে হাজারো বছরের সেই ধারা আজো সমান অব্যাহত— এত দুঃখ দৈন্য যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষ উপপ্লবের মধ্যেও। এমন মৃত্যুঞ্জয় দেশ ও জাতিই বা পৃথিবীতে কয়টা?

'দিগন্ত' দুইমাস দিগ্বিদিক ঘুরে আজ ১০/১৫ দিন হ'লো আমার হাতে এসেছে। ছিন্ন ভ্রষ্ট দলিত মর্দিত। বুঝলুম, সেন্সর কর্তৃপক্ষদের বাড়িতে বহুবার আনাগোনা করেছে! 'দিগন্ত' সৌভাগ্যবান সন্দেহ নেই। যা'হোক, আগেই আমি এক খণ্ড এখানে দেখেছিলুম, তা'তে কিছুদিনের জন্য কৌতূহল সুপ্ত ছিল। কাগজখানা বেশ হ'য়েছে, পঠনে দরশনে পরশনে। অজিতবাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'কালো হাওয়া' পড়েছিলুম বই কি? তবে নাটক কেমন হ'বে বুঝতে পাচ্ছিনে। স্পীড হ'বে কি? যা'হোক, মহড়া নিয়ে সন্ধ্যেগুলো তা'লে ভালই কাটছে। স্ত্রী-ভূমিকার অভিনেত্রী সব জুটলো কি?

কালেজ নিয়ে আপনার বিবৃতির কারণ পড়ছি, আর সেইদিনই কাগজে রবি ঘোষ মশায়ের মৃত্যুসংবাদ পড়লুম! অত্যন্ত আঘাত পেলুম— প্রায় নিকট আত্মীয় বিয়োগের মতো। একজন যথার্থ গুণী ও সহৃদয় মানুষ আমরা হারালাম! তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল; তিনিও খুব ঔদার্যে আমাকে তাঁর প্রীতির মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৪-১৬র রবি ঘোষ মশায়কে বোধহয় আজকের বাঙালী যুবক জানেই না!— আপনার কালেজের ব্যাপার কি হ'লো জানবার জন্যে আগ্রহান্বিত হ'য়ে আছি। এরকম অদ্ভুত অনুরোধ তো কখনও শুনিনি!' আশা করি শেষ পর্যন্ত কালেজ ছাড়ার প্রয়োজন হ'বে না। খবরটা জানাবেন।

ভাল কথা, আপনাকে একটা কাজ করতে হ'বে। 'কবিতার' লেখিকা বীণা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি ক'লকাতা থেকে আমায় একটা চিঠি লিখেছেন— তিনি একসময় আমার ছাত্রী ছিলেন— কিন্তু চিঠিতে ক'লকাতার বাড়ির ঠিকানাটা দেননি; তবে বুঝতে পারছি, মীরাট থেকে কয়েকমাস হ'লো কলকাতা এসেছেন। চিঠিটার জবাব দেওয়া দরকার, অথচ ঠিকানা জানিনে! আপনার কাছে ঠিকানা নিশ্চয়ই আছে— শ্যামবাজার অঞ্চলে বাড়ী। দয়া করে তাঁর ঠিকানাটা পত্রপাঠ আমায় জানালে বড় উপকৃত হ'বো। কয়েকমাস আগেও তাঁর একটা কবিতা আপনি ছেপেছিলেন 'কবিতায়'। সীমায় এসে পৌঁছে গেছি; থামতে হ'চ্ছে। আশা করি ভাল আছেন। প্রতিভা দেবী ও আপনি দুজনেই প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যারা সকলেই কমবেশি অসুস্থ। ইতি

প্রীতিবদ্ধ **নীহাররঞ্জন রায়**

ভুল না ভাঙবে ততদিন এধরনের রচনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নেই। ওঁর শিল্পরুচির প্রতি আমি ইঙ্গিত করবোনা কিংবা ভারতীয় অন্যান্য শিল্পাদর্শ বা অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র-নন্দলালের প্রতি যে অবজ্ঞা তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে সে-কথাও বলবোনা; কিন্তু যামিনীবাবুর প্রতিও তিনি সুবিচার করেননি' এইটেই আমায় সবচেয়ে বেশী আঘাত করেছে। সুনির্বাচিত পদবিন্যাসে ও সুনির্দিষ্ট অর্থবিহীন বাক্যাংশ প্রশস্তি রচনা সুবিচার নয়। যামিনীবাবুকে আমি প্রতিভাবান শিল্পী বলে মনে করি, বর্তমান ভারতীয় শিল্পে তাঁর দান শ্রদ্ধেয়; কিন্তু সে-দানের যথার্থ পরিমাপ হ'তে পারে শুধু ভারতীয় শিল্পঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এবং পৃথিবী জুড়ে আজ আদি সুপ্রাচীন গোষ্ঠী ও লোকশিল্পের যে পুনরুভ্যুদয় চলেছে নোতুন ভাবে ও ভঙ্গিমায় তার ঐতিহ্যের ও অভ্যাসের তুলনামূলক আলোচনায়। সুধীন বাবুর প্রবন্ধে তাঁর আভাসমাত্র নেই! থাকা সম্ভব নয়, কারণ সে-ঐতিহ্য ও অভ্যাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নেই; তিনি তা' নিজের চোখে দেখবার ও বুঝবার কষ্ট স্বীকার করেননি'। দেখতে ও বুঝতে হ'লে বাংগালার পাড়াগাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়, কিভাবে গ্রাম্য শিল্পীরা পটরচনা করে ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন তা' দেখতে হয়, তাদের মন ও সংস্কৃতি অনুশীলন করতে হয়। সহরের salon বা studio-তে তা' দেখা যায় না'। যামিনী বাবু তা' অনুশীলন করেছেন এবং বর্তমানের সংস্পর্শে এনে তাকে জারিত করে নোতুন রূপ উদ্ভাবন করেছেন। তিনি শ্রদ্ধেয়, তাঁর শিল্প শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এক সুরাবর্দি ছাড়া এপর্যন্ত তাঁর যত আলোচনা পড়েছি তা' অশ্রদ্ধেয়, অনৈতিহাসিক এবং অসামাজিক!

Tomorrow-ও দেখলুম। এর চেয়ে বেশি আশা করিনি। সমাজ ও সংস্কৃতির সংকট যখন দেখা দেয় তখন এইরকম অবস্থাই হয়। ভারতবর্ষের সর্বত্র সমাজ ও সংস্কৃতির অবস্থা আজ এক নয়; বাংগালা দেশ অনেকখানি এগিয়ে আছে একথা সত্য। তার মূল কারণ উনবিংশ শতকের ইতিহাসে; একসময় আমরাও য়ুরোপে আচ্ছন্ন হ'য়েছিলাম; সে স্তর আমরা কাটিয়ে এসেছি— বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দ-কেশবচন্দ্রকে ধন্যবাদ—। বাংগালার বাইরে এখনও সে-যুগ কাটেনি, তার উপর এসে পড়েছে নবতন য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান; তাঁদের ভেতর আজো integrated প্রতিভা কেউ জন্মাননি যিনি বিষ হজম করে অমৃত আহরণ করবেন। অন্যদিকে রয়েছে সনাতন ভারতীয় মনোবৃত্তি। বাংগালার বাইরে এ-দুইই পাশাপাশি চলেছে। বাংগালাদেশে সনাতনী মনোবৃত্তি নেই, এমন নয়, কিন্তু তার শাসন শিথিল; য়ুরোপীয় আচ্ছন্নতা আমরা কাটিয়া উঠেছিলাম। কিন্তু আমাদের ভেতর মস্কো-অক্স্‌ফোর্ড নোতুন করে শিকড় ঢোকাতে চেষ্টা করছে, দৃষ্টি ও বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে, অথচ সমীকরণ ও সমন্বয় প্রতিভার শক্তি আজ খুব সক্রিয় নয়। তার উপর যাঁরা কায়মনোবাক্যে সংস্কৃতিপরায়ণ নন, art to be real must take root in a country এই উক্তিতে যাঁরা বিশ্বাসী নন, তাঁরা আজ সংস্কৃতির আদর্শ নির্ণয় করে দিতে চাইছেন। যাঁরা শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, সমাজের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় ত নয়ই বরং একাংশিক, একদেশিক তাঁরা সমাজের ও সংস্কৃতির নিয়ামক হ'তে চাইছেন, এইখানেই বাংগালার সংস্কৃতির ভয় ও সংকট। বাংগালার বাইরে এই ভয় ও সংকট কম; সেখানকার রাষ্ট্র ও সমাজ-বুদ্ধি বাংগালা দেশের মতো এতটা মূলহীন কায়াহীন নয়। এবং জনকয়েক লোকের ভেতর যে দৃষ্টিবিভ্রান্তি ও য়ুরোপীয় আচ্ছন্নতা দেখা যাচ্ছে তারা সংখ্যায় ও প্রভাবে নগণ্য। দুঃখের বিষয় বাংগালা দেশে তা' নয়। শুধু যে সংখ্যায় তারা কম নয় তা-ই নয়। Quality-তেও তাঁরা সমৃদ্ধ। আহম্মদ আলী বা মুলুকরাজ আনন্দ (যিনি লন্ডনকেই করেছেন নিজের দেশ) উত্তর ভারতের কেউ নয়; ভারতীয় সাহিত্যেরও নয়— তাঁরা anglo-Indian Literature নামে একটি curio-র বাহকমাত্র— ; কিন্তু বাংগালা সাহিত্য ও ভারতীয় সাহিত্য যদি Indo-European Literature হ'য়ে উঠে তা' হলে সে লজ্জা রাখবো কোথায়? সে-আশঙ্কা কিছুদিন আগেও আমার ছিল, এখনও সম্পূর্ণ দূর হ'য়েছে বলতে পারিনে। আর আশার কথা, অনেকটা মোড় ফিরেছে; ঢেউটা বোধহয় কেটেছে। তবু প্রয়োজন আছে, সজাগ থাকবার। আপনার প্রতি আমার প্রীতি ও অনুরাগের অন্যতম কারণ, এসম্বন্ধে আপনি সচেতন। সচেতন না থাকলে একদিকে সনাতনী শনি বুদ্ধিকে মোহিত বা মোহগ্রস্ত করে, অন্যদিকে বিদেশী ফানুস দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে। ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর; এই দুই আপদ চিরকাল ছিল ও থাকবে; এরই ভেতর বুদ্ধিকে আত্মস্থ যে রাখতে পারে দুই দিকের নিন্দা ও গ্লানি সহ্য করে সরস্বতী তাকে পুরস্কৃত করেন, দেশ তাকে স্মরণ রাখে— দেশের সংস্কৃতি তারাই গড়ে তুলতে পারে। দেশজোড়া এই বিভ্রান্তি ও আচ্ছন্নতার দিনে আমরা যদি সচেতন না থাকি, তা' হলে শাস্তি ত একদিন পেতেই হ'বে।

কামাক্ষী বাবুর স্ত্রীর আরোগ্য সংবাদে আশ্বস্ত হ'লাম। আশা করি তিনি এতদিনে সম্পূর্ণ নিরাময় হ'য়ে উঠেছেন। ওঁদের কাগজখানা দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আজো হ'য়ে উঠেনি। বাইরে গিয়ে দেখবো আশা করছি। বিশ্বভারতী পত্রিকা সত্যি খুব সুন্দর হ'চ্ছে, রচনাগৌরব ও

সচেতন না থাকলে একদিকে সনাতনী শনি বুদ্ধিকে মোহিত বা মোহগ্রস্ত করে, অন্যদিকে বিদেশী ফানুস দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে। ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর; এই দুই আপদ চিরকাল ছিল ও থাকবে।

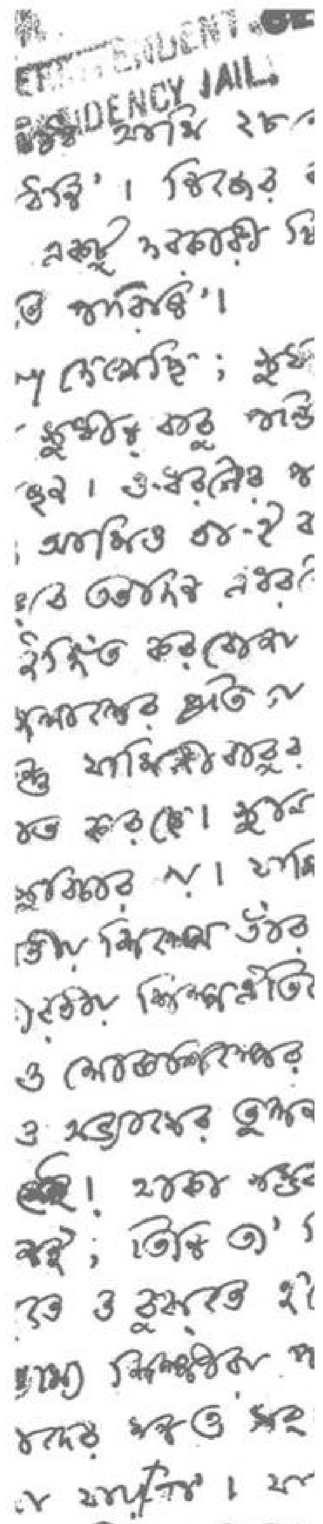

পারিপাট্য উভয়তঃ। কয়েকটি রচনা তো সত্যি খুব উঁচুদরের। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প সম্বন্ধে আপনার লেখাটা কবে বেরুবে; উৎসুক হ'য়ে প্রতীক্ষা করছি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার বইখানাও কবে দেখবো ভাবছি; অবশ্য রচনাগুলি ত সবই প্রায় বোধ হয় পড়েছি। সাহিত্যস্রষ্টার মনের প্রতিক্রিয়ার একটা পৃথকমূল্য ত আছেই; এবং তার মূল্য যথেষ্ট। বিশেষতঃ আপনার বলার সাবলীল ভঙ্গি আমার ভালো লাগে। নোতুন কবিতা কি কিছু লিখেছেন, ইতিমধ্যে?

নোতুন বইর— সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে— কিছু কিছু বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা নজরে পড়ে; কিন্তু সেগুলো কবে দেখতে পাবো, জানিনে। ধূর্জটি বাবুর Indian Culture ও Rabindranath বই দু'খানা কি পড়েছেন? কেমন হয়েছে? বিমল সিংহ মশায়ের বইখানা পড়লুম; খুসী হ'তে পারিনি'। উদ্দেশ্য ভালো, উৎসাহও আছে। এবং সুবিচারের চেষ্টাও করেছেন; কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতা বুদ্ধিকে যে সংহতি দেয়, চিন্তাকে যে যুক্তি ও দৃষ্টিসমৃদ্ধি দেয়, মনকে মুক্তি দেয় ধরতাই মতামতের বন্ধন থেকে তার অভাবও যথেষ্ট রয়েছে মনে হ'লো। ছোট খাটো আরো দু'চারখানা বই'র সমালোচনা পড়লুম, সেগুলো বোধহয় ততটা সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক নয়, যতটা রাজনৈতিক। কাজেই খুব বেশি উৎসাহ বোধ করছিনে, সেগুলি দেখবার জন্যে।

আপনাদের ছোটগল্প সিরিজ বেরুল কি? মানিকবাবুর নোতুন গল্প পড়বার জন্যে আগ্রহান্বিত হ'য়ে আছি। বেরিয়ে থাকলে আশুতোষ কালেজের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র মোহন চৌধুরীর হাতে পৌঁছে দিলেই পাবো; তিনি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

'কালো হাওয়া' অভিনয়ের দিন ত এগিয়ে এলো। আশা করি আপনাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হ'য়েছে। অভিনয় কবে হ'বে? আপনাদের সকলের শ্রম ও উৎসাহ সফল হউক, কামনা করি। আপনি নিজেও কি অভিনয় করছেন না শুধু প্রযোজক? ''কালো হাওয়া'' উপন্যাসখানা আমি পড়েছি, জ্যোতির্ময় বাবুর কাছ থেকে ধার করে নিয়েছিলাম। নাটকে ত নিশ্চয়ই অনেক ঝরে' পড়ে গেছে।

'কঙ্কাবতী'র পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়ে থাকলে সেখানাও বিনয়ের হাতে পৌঁছে দিলে পাবো। আগ্রহান্বিত হ'য়ে রইলুম।

জ্যোতির্ময় বাবুকে দয়া করে বলবেন, তাঁকে যে চিঠি লিখেছিলুম, তার জবাব এখনো পাইনি'। বোধহয় খুব ব্যস্ত আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মশায় আমার চিঠি পেয়েছেন কিনা।

আশা করি কন্যাকাদের সহ আপনি ও প্রতিভা দেবী ভালই আছেন। আপনারা দুজন প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আমি শারীরিক সুস্থই আছি। ইতি ভবদীয় **নীহাররঞ্জন রায়**

নীহাররঞ্জন রায়ের চিঠি /৫

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY
ASUTOSH BUILDING
CALCUTTA
25.3.44

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি ও চেক পেলাম; অনেক ধন্যবাদ।

নিজের ও পারিবারিক কাজকর্ম নিয়ে সত্যি বড় বিব্রত আছি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আপনাদের বৈঠকে যাবার সুযোগ করে উঠতে পাচ্ছিনে। দশমাস অনুপস্থিতির জের আরও যে ক'দিন টানতে হ'বে জানিনে!

'বৈশাখী' যদি বা'র করতে পারেন ভাল হয়— ক্ষীণকায়া হ'লেও ক্ষতি নেই। অবশ্যি, তাও নির্ভর করে কাগজ পাওয়ার উপর। আমি সঙ্গে থাকতে পারলে খুসী হ'তুম। কিন্তু বোধহয় তা' সম্ভব হ'বে না। এত কাজ ও অকাজ নিয়ে পড়েছি যে 'বৈশাখী'র কোনো কাজেই আসতে পারবো বলে মনে হ'চ্ছে না! আপাততঃ এপ্রিলের গোড়ায় একটু দিল্লী-মীরাট-জয়পুর যেতে হ'চ্ছে; ফিরবো ১০/১২ দিন পর। তারপর, নিজের ২/৩ খানা বই একসঙ্গে ছাপা আরম্ভ হ'বে— সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ব্যস্ততা তো রয়েছেই। গেল বছরও কোনো কাজে আসিনি। অথচ অন্যতম সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল; এর লজ্জা বহুদিন আমায় পীড়ন করেছে। কিছুই না করে নাম জড়াতে ভাল লাগে না। আমার ত মনে হয়, আপনি একা করতে পারলেই ভাল, অজিতবাবু যেমন করেছেন। অবশ্যি, আমি যদি কোনো কাজে লাগতে পারি খুবই খুসী হ'বো, এ কথা আপনি জানেন।

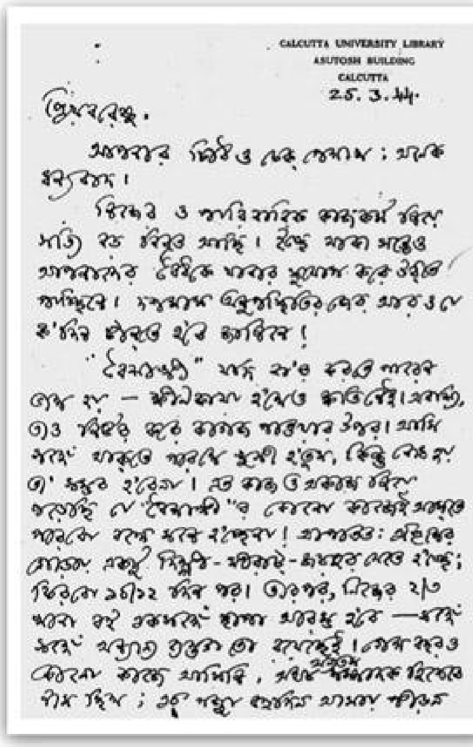
CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY
ASUTOSH BUILDING
CALCUTTA
25. 3. 44.

দু'চার দিনের ভেতরই একবার আপনাদের ওখানে যাবো— সন্ধ্যের পর ত আপনি থাকেনই সাধারণতঃ। প্রতিভা দেবী ও আপনি প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানবেন। আপনার কন্যা দুটি ভাল আছে ত? ইতি প্রীতিবদ্ধ

নীহাররঞ্জন রায়

*বানান অপরিবর্তিত

এক পলকের একটু দেখা
জাপান

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

টোকিওর হোসে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনের উদ্যানে চেরি ব্লসম

চিন আর জাপানে পাঁচ-ছ মাস ঘুরে বেড়াব, এ আমার বহুদিনের শখ। কিন্তু সে সুযোগ মেলে কই!

গত বছর তো চিনের দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হল। জুনের গোড়ায় গিয়েছিলাম হংকংয়ে আন্তর্জাতিক সম্পাদক সম্মেলনে, কথা ছিল সম্মেলন শেষ হলেই যাব বেইজিং, সেখান থেকে চায়না ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে জিয়াউগুনাস গিরিপথ পেরিয়ে তুরপানের মধ্য দিয়ে উরুমচি যাব। দেশ ছাড়ার মুখে চিনের সরকারি পর্যটন দপ্তরের ই-মেল এল— জুন মাসের ওই নির্দিষ্ট তারিখের ট্রেনযাত্রা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, বাতিল হবার সম্ভাবনাই বেশি। সেপ্টেম্বরে ওই ট্রেনটির যাত্রা সুনিশ্চিত, অতএব ওই সময় যেতে চাইলে— ইত্যাদি।

হংকংয়ে এক ট্র্যাভেল এজেন্টের কাছে জানা গেল তারা চিন সীমান্তের কয়েকটি প্রাচীন গ্রাম বেড়াবার ব্যবস্থা করে দেয়। অল্প খরচ, চিনের ভিসাও তারাই করে দেবে। ৬ জুন সম্মেলন শেষ হবে, ৭ জুন সকালে রওনা হয়ে ৯ জুন দুপুর ২টোয় হংকংয়ে ফিরব। মুশকিল হল ৯ জুন বিকেল ৩টের বিমানে আমার চিয়াংমাই যাবার বন্দোবস্ত পাকা হয়ে আছে। সেখান থেকে চিয়াংমাই ঘুরে ১২ তারিখ কলকাতায় ফিরতে হবে। চিন থেকে দুপুর দুটোয় হংকংয়ে পৌঁছে সোজা এয়ারপোর্টে চলে গেলেও ব্যাংককের সেদিনের ফ্লাইট ধরা সম্ভব নয়। ফলে চিনের বুড়িটুকুও আমার ছোঁয়া হল না। আপনমনে সময় ভুলে ঘুরে বেড়াবার আবাল্য অভ্যাস আজকাল বজায় থাকছে না দেখে ভারি দুঃখ হয়, তার বদলে এ যেন অতি ব্যস্ত লোকের ঝটিকা সফর।

জাপানের বেলায়ও তীরে এসে তরী ডোবার ক্ষোভের কথা আগেই বলেছি। সত্যি বলতে কী, জাপান ভ্রমণের স্বপ্ন মন থেকে যখন প্রায় মুছে যেতে বসেছে, ঠিক তখনই এই

এঁরা সব বড় বড় কোম্পানির চাকুরে, বিজনেস ডিনার বা অফিসের কাজের সূত্রে বা বাহানায় এঁরা এখানে এসেছেন। অফিস নিয়ে এত ব্যস্ত যে বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানদের সময় দিতে পারেন না। জাপানে শুনলাম ছোটখাটো চাকুরে, মিস্ত্রি, কারিগর, দোকানদার —এঁরা কাজ শেষ করে বাকি সময় পরিবারেই ব্যয় করেন। প্রায়ই সপরিবারে বাইরে খেতে যান।

জাপান যাত্রার সুযোগ পেয়ে মন আমার কানায় কানায় পূর্ণ। ওসাকার কানসাই বিমানবন্দরে নেমেই সে কী রোমাঞ্চকর অনুভূতি!

তারও আগে এক অপার্থিব আনন্দে আমার মন ভরে গেছে। কলকাতা থেকে থাই এয়ারওয়েজের ফ্লাইট তিন ঘণ্টা দেরিতে বিকেল পাঁচটায় ডানা মেলল। একটু পরেই প্লেনের জানলা দিয়ে আকাশে এক আশ্চর্য, অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখলাম। লক্ষ কোটি শিউলির বোঁটা আর অযুত নিযুত রক্তজবার পাপড়ি একসঙ্গে বেটে আকাশপ্রান্তে লেপে দেওয়া হয়েছে, নিচে পৃথিবী। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চেয়ে থাকতে হল।

বোধহয় ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার সেই রঙের সাম্রাজ্য। এবার সূর্যোদয়।

প্লেন ছুটছে পূর্বদিকে। ফলে একটু আগে সূর্যাস্ত দেখতে আমাকে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাতে হচ্ছিল। সূর্যোদয়ে সামনে চেয়ে থাকলেই হল।

সূর্যাস্তে যেমন দেখেছিলাম— দূরে পুব-পশ্চিম বরাবর রঙের স্থির সমুদ্র, যেন মহাপটে মহাশিল্পীর রং চড়ানো। আমার দিককার ঢালাও কালো রং আর কালোর পর থেকেই রক্তবর্ণ সন্ধ্যা— এই দুই রঙের প্রান্তরের মধ্যে স্পষ্টই একটা বিভাজন রেখা। একটার শেষ থেকে অন্যটার শুরু। সূর্যোদয়েও ঠিক তাই। ক্রমে ক্রমে কালোর স্বরূপ স্পষ্ট হল। ওই বিস্তারিত কালো আসলে নিচের সমুদ্র। একই মাঠের আড়াআড়ি অর্ধেক জুড়ে সূর্যমুখী আর বাকি অর্ধেক জুড়ে ল্যাভেন্ডারের চাষ হলে যেমন দেখাবে।

মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে আকাশে দুবার রঙের মহোৎসব দেখে চোখ সার্থক হল। এক মঞ্চে সূর্যদেবের উদয়-অস্তের এমন মহানাট্য তো আর রোজ রোজ দেখা যায় না।

ওসাকায় বিমান নামল জাপানি সকাল সাড়ে সাতটায়, তখন ভারতীয় সময় রাত সাড়ে তিনটে।

অচেনা দেশে পৌঁছেই বহুকালের চেনা বন্ধুর মুখ দেখতে পাবার কী যে আনন্দ তা বোধহয় শুধু নিজে উপলব্ধি করার। এয়ারপোর্টে শিবাজীকে দেখেই কথাটা নতুন করে টের পেলাম।

পরমাণু বিজ্ঞানী ডক্টর শিবাজী রাহা ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিভাগের গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপক, শিবাজীর নিমন্ত্রণেই আমার এই ওসাকা যাত্রা।

কানসাই এয়ারপোর্ট থেকে আমরা 'এয়ারপোর্ট লিমুজিন'-এ চড়ে ওসাকা-ইটামি এয়ারপোর্টে এসে সেখান থেকে ট্যাক্সিতে মাচিকানেইয়ামা-র শিবাহারা রেলস্টেশনের কাছে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পৌঁছে গেলাম। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হাউসে আমার তিনদিনের ঠাঁই।

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে যেমন, অচেনা বিদেশেও তেমনই দল বেঁধে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া দেখতে আমার বড্ড ভালো লাগে। শিবাহারায় প্রথম দিনই একদল কলকাকলিমুখর ক্ষুদে স্কুলযাত্রীর সঙ্গে আমার নীরব হাসিবিনিময় হল।

সন্ধেয় দুই বন্ধু হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম পুরনো আবাসিক এলাকা ইশিবাশির-র বাজারে। রেলস্টেশনের গায়ে যেমন হয়, ফলসবজি নানান সাংসারিক জিনিসের দোকান-বাজার।

বেসরকারি রেল হাংকিউ ধরে চলে গেলাম উমেদা। উমেদা ওসাকার কেন্দ্রস্থল। উমেদা থেকে সাবওয়ে রেলে শিনশাইবাসি নেমে পায়ে হেঁটে পায়ে-হাঁটারই এলাকা, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের ভিড়, ঝলমলে সারিবদ্ধ দোকান দেখতে দেখতে চলে গেলাম নামবা— রাস্তার ধারে, গলির মধ্যে প্রচুর রেস্তোরাঁ, বার, সেখানেই একটা জাপানি রেস্তোরাঁয় আমরা রাতের খাওয়া সেরে নিলাম।

সাবেক জাপানি পানীয় সাকে, 'মিসো' স্যুপ, চিকেন, পর্ক, সামুদ্রিক মাছ, সীফুড —সবই এক টুকরো করে, সঙ্গে এক বাটি ভাত, শশা-মুলোর কুচির জাপানি আচার।

ফেরার পথে শিনশাইবাসি থেকে সাবওয়ে ধরে অদ্ভুত সব স্টেশনের নাম পড়তে পড়তে এলাম সেনরিচুও, সেখান থেকে মনোরেলে শিবাহারা।

২০ মার্চ

আজ প্রথমেই শিবাহারায় গিয়ে এক ট্র্যাভেল এজেন্সির ছোট্ট ছিমছাম অফিস থেকে শিনকানসেন বা বুলেট ট্রেনে টোকিও যাবার টিকিট কাটলাম। টোকিও যাব পরশু। টিকিট বিক্রির অফিসে ভিড় নেই, লম্বা লাইন নেই, দশ মিনিটে টিকিট কাটা সারা। ওসাকা থেকে টোকিওর ভাড়া সাড়ে চোদ্দ হাজার ইয়েন, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫,৮০০ টাকা।

শিবাহারা থেকে পাতাল রেলে গেলাম হোমমাচি। সেখান থেকে ট্রেন বদলে ওসাকা-কো স্টেশনে, এটা ওসাকার বন্দর এলাকা। এখানেই টেম্পোজান বিনোদন চত্বরে বিশ্বের বৃহত্তম জায়ান্ট ফেরিস হুইল। নানারকম দোকান, রেস্তোরাঁ। পাশেই বিশাল ওসাকা অ্যাকোরিয়াম। রীতিমতো বিস্ময়কর। মনে হয় চেনা অচেনা, শোনা না শোনা অদ্ভুত দর্শন সামুদ্রিক প্রাণীদের সংসারে ঢুকে পড়েছি। একেবারে সামনাসামনি দেখা যায় নানা জাতের নানা রকমের হাঙর, সী লায়ন (সিন্ধু ঘোটক), সামুদ্রিক ভোঁদড়, ডলফিন, অদ্ভুত কিম্ভুত চিত্র-বিচিত্র অসংখ্য প্রাণী, তাছাড়া মাছ কাঁকড়া কচ্ছপ ইত্যাদি।

ফেরার পথে উমেদা স্টেশনে নেমে বাইরে এসে দেখি চতুর্দিকে উৎসবের রাতের মতো আলোকসজ্জা। শিনশাইবাসির মতোই সব রাস্তার পাশে সারি সারি দোকান, রেস্তোরাঁ। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে জনস্রোত। স্যুট পরা হাতে ব্রিফকেস এরকম অনেক জাপানি ভদ্রলোককে দেখলাম। শিবাজীর ভাষ্য— এঁরা সব বড় বড় কোম্পানির চাকুরে, বিজনেস ডিনার বা অফিসের কাজের সূত্রে বা বাহানায় এঁরা এখানে এসেছেন। অফিস নিয়ে এত ব্যস্ত যে বাড়িতে স্ত্রী-সন্তানদের সময় দিতে পারেন না। জাপানে শুনলাম ছোটখাটো চাকুরে, মিস্ত্রি, কারিগর, দোকানদার —এঁরা কাজ শেষ করে বাকি সময় পরিবারেই ব্যয় করেন। প্রায়ই সপরিবারে বাইরে খেতে যান। জাপানে এত বেশি খাবার দোকান যে অনেকের বাড়িতেই নিয়মিত রান্নাঘরের পাট প্রায় উঠেই গেছে।

আমরা রাস্তা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা 'অথেনটিক ব্রিটিশ পাব'-এ পাশ্চাত্য প্রভাবিত অল্পবয়স ও মাঝবয়সি জাপানিদের ভিড়ে ছোট্ট এক পাত্র পানীয় নিয়ে কিছুক্ষণ কাটালাম।

রাতে বাড়ি ফিরে দুজনে বসলাম আমার দুটো ছোটদের কবিতার ইংরিজি তর্জমা করতে। কাওয়াবাতা অনেকদিন ধরে চেয়েছেন— ছোটদের কী একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে। এত দিন শুধু 'নিশ্চয়ই পাঠাব' লিখেই দায় সেরেছি,

২৪ মার্চ টোকিওয় দেখা হবে, তখন কবিতা দুটি না দিতে পারলে মুশকিল।

২১ মার্চ

আজ সকাল থেকেই মেঘলা, সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। দুপুরে গেলাম কিয়োতো। ওসাকার কাছেই শিবাহারা থেকে ট্রেনে আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের রাস্তা। 'কিয়োতো' কথাটার মানে রাজধানী-শহর। সাতশো বছর ধরে কিয়োতোই ছিল জাপানের রাজধানী।

কিয়োতোর কাওয়ারামাচি স্টেশনে নেমে বাইরে এসেই চোখে পড়বে বিশাল চওড়া রাস্তা, নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে কামোগাওয়া। গাওয়া শব্দের অর্থ নদী।

নদীর দুপাশে দুই গেইসা ডিস্ট্রিক্ট। পুব পাড়ে গিয়ন, পশ্চিম পাড়ে পনটোচো। পুব পাড়ের গেইসা পাড়ার আভিজাত্য নাকি তুলনায় কিছুটা বেশি। গেইসা জাপানি সমাজ ও সংস্কৃতির খুবই প্রাচীন ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিবাজীর ভাষায়, গেইসারা বিনোদন সঙ্গিনী, অথচ বারবণিতা নয়।

শান্ত পরিচ্ছন্ন, জাপানি রীতিতে সজ্জিত, একটু পর পর তোরণ-শোভিত গিয়নের একাংশ এক চক্কর ঘুরে আমরা গেলাম গিয়নের ঠিক পাশেই মারুইয়ামা পার্কে। রাতে চেরিব্লসম দেখতে এই পার্কে জাপানিরা ভিড় করে, তখন তিল ধারণের জায়গা থাকে না। দেখলাম গাছে গাছে আমের বউলের মতো কুঁড়ি ধরে আছে। সপ্তাহখানেক পরই ফুলে ফুলে সব গাছ ভরে যাবে। তখন পার্কের সারা আকাশ যেন চেরিফুলে চিত্রিত পট। পুরো এপ্রিল জুড়ে চেরিব্লসম উৎসব। গেইসাদের চেরিব্লসম নৃত্য এই উৎসবের অঙ্গ। এই নৃত্যানুষ্ঠানে আগে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না, বিদেশিরা কোনও জাপানির নিমন্ত্রিত অতিথি না হলে ঢুকতে পারত না। এখন সকলেই টিকিট কেটে গিয়ন কর্নারে গেইসানৃত্য দেখতে পারে।

লাগোয়া পার্কে এপ্রিলে চেরিফুলের বন্যা দেখতে জাপানিদের এমন মত্ততা আর অস্বাভাবিক ভিড় শুনলাম পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

পনটোচোতে নদীর ধারে বহু লোক বসে আছে। শুনলাম গ্রীষ্মে এখানে সারা রাতই মানুষ হাওয়া খেতে আসে। এপারেই বেশিরভাগ বার-রেস্তোরাঁ, দোকান ইত্যাদি। নদীর পাড়েই একটা জাপানি রেস্তোরাঁয় আমরা রাতের খাওয়া সারলাম। ইলমাছ আর সয়া-সস ছিটানো ভাত দিয়ে। সঙ্গে সবুজ এবং অবশ্যই ছোট্ট এক কলসি সাকে। চিনে মাটির তৈরি এই কলসি আর সঙ্গের ছোট্ট কাপ আমার কাছে পানীয়ের চেয়েও বেশি চিত্তাকর্ষক। কলসি বা ঘট থেকে কাপে ঢেলে চায়ের মতো সাকে পান করাই রীতি। চায়ের মতোই উষ্ণ অবস্থায় পরিবেশন করা হয়।

ওসাকায় বেড়াতে গেলে সাতটা দিন না হলেই নয়। শিবাজীর মতে, আরও কয়েকটা দিন দরকার। ওঁর ব্যবস্থাপত্র ছিল এইরকম— প্রথম কয়েক দিন ওসাকায় থেকে, মাঝে তিনদিনের জন্য ওঁকে একটা সেমিনারে বাইরে যেতে হবে, আমিও ওই সময়টা টোকিওর নিমন্ত্রণ সেরে ওসাকায় ফিরে আসব, তারপর ওসাকা আর তার আশপাশ দেখে বেড়িয়ে মার্চের শেষে দুজন একসঙ্গে ফিরব ব্যাংকক। সেখান থেকে আমি চলে আসব কলকাতায়, শিবাজী কয়েকটি দিন থাকবেন, সেখানে ওঁর স্ত্রী, আমাদের আবাল্য বন্ধু, মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বায়ো-কেমিস্ট্রির অধ্যাপিকা ডক্টর সঙ্ঘমিত্রা রাহা মেয়েকে নিয়ে চলে আসবেন, সবাই মিলে ছুটি কাটাতে। সেইমতো আমাদের ওসাকার ভ্রমণসূচিও তৈরি হয়েছিল। ওসাকা, ওসাকা থেকে একদিন কিয়োতো, একদিন জাপানের প্রথম রাজধানী নারা, আরেকদিন হিমেজি। ওসাকা গিয়ে প্রাচীন জাপানের এই তিন বিন্দু নাকি না ছুঁলেই নয়।

বন্ধুর ভালোবাসা, আতিথেয়তা যদি বা পেলাম, সময় কেন পেলাম না! টোকিও থেকে ওসাকায় ফেরার বদলে ফিরতে হল কলকাতায়।

২২ তারিখ বুলেট ট্রেনে ওসাকা থেকে টোকিও স্টেশনে পৌঁছে টোকিও শহরের প্রাণকেন্দ্র গিনজায় হোটেল খুঁজে পেতে আধঘণ্টাও লাগল না।

রিসেপশান কাউন্টারে নিজের নাম বলতেই রিসেপশানের মেয়েটি আমাকে মুখবন্ধ দুটি খাম দিলেন। খুলে দেখি জাপানি কবি, আমার বন্ধু রিৎসুকো কাওয়াবাতা এই হোটেলে আমাকে দুবার ফোন করেছেন, দুটি খামে সেই বার্তা।

কাওয়াবাতাদের মধ্যাহ্নভোজসভায় নিমন্ত্রণ ২৪ মার্চ। আমি তাই আর ফোন না করে ঘরে সুটকেসটি নামিয়েই টোকিও শহরটা ঘুরতে বেরলাম। বিদেশে নিমন্ত্রণের আনন্দ আমি খুবই জানি, কিন্তু গোড়া থেকেই তাতে জড়িয়ে পড়লে নিজের মতো করে শহরটা আর ঘুরে দেখা হয় না।

জাপান দেশটা ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবকিছুই যেন পরিপাটি। যেমন শহরের স্থাপত্য, রাস্তা-পার্ক, দোকান-বাজার, তেমনই মানুষজনের পোশাক-পরিচ্ছদ।

সর্বত্র প্রযুক্তির পরশ আর পরিচ্ছন্নতার প্রদর্শনী। সেইসঙ্গে বার-রেস্টোর‍্যান্টের ছড়াছড়ি। নানা দেশের নানা রকম ভোজনালয়, পদও নানা স্বাদ-গন্ধের। সর্বত্রই আন্তরিক আতিথেয়তা।

একটা জিনিস দেখে ভারি ভালো লাগল।

জাপান দেশটা ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবকিছুই যেন পরিপাটি। যেমন শহরের স্থাপত্য, রাস্তা-পার্ক, দোকান-বাজার, তেমনই মানুষজনের পোশাক-পরিচ্ছদ।
সর্বত্র প্রযুক্তির পরশ আর পরিচ্ছন্নতার প্রদর্শনী। সেইসঙ্গে বার-রেস্টোর‍্যান্টের ছড়াছড়ি। নানা দেশের নানা রকম ভোজনালয়, পদও নানা স্বাদ-গন্ধের। সর্বত্রই আন্তরিক আতিথেয়তা।

শহরের কোথাও রোম-ভেনিসের মতো পকেটমার বা মাদ্রিদের মতো কেপমারির চিহ্ন মাত্র নেই। নেই প্যারিস-লন্ডনের মতো চমকে দেওয়া পাতাল-স্টেশনের পাগল, ভিখিরি বা ছ্যাঁচরা মাতাল! বিদেশিরা এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদে ঘুরে বেড়াতে পারে।

আমারও প্রথম দুদিন গেল শহর আর শহরের মানুষ দেখতে। রাস্তায় পার্কে সর্বত্র চেরিফুলের বাঁধভাঙা হাসি।

২৪ মার্চ সকালে হোটেলে হাজির কাওয়াবাতা, গোরো ইহারা আর আমার অপরিচিত একজন, কাওয়াবাতা পরিচয় করিয়ে দিলেন, চিকায়ে তানিগুচি, কবি ও অনুবাদক। এবছরের নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী লেখক নইপলের লেখা অনুবাদ করার তাঁর খুব ইচ্ছে, তার আগে ত্রিনিদাদের বিখ্যাত লেখক পল কিল্প-ডগলাসের বিচিত্র 'ত্রিনিদাদী' ইংরিজিতে লেখা অতি বিখ্যাত একটি বইয়ের অনুবাদে হাত দিয়েছেন, এই দুই লেখকের টানে তানিগুচি ইতিমধ্যে ত্রিনিদাদ ঘুরেও এসেছেন। রিৎসুকো কাওয়াবাতা আর গোরো ইহারাকে বন্ধু পেয়েছি গত বছর অক্টোবরে সিডনিতে বিশ্ব কবিসম্মেলনে। সেখানে হিরোশিমায় আণবিক বোমার দানবিক ধ্বংসকাণ্ড নিয়ে কাওয়াবাতার 'আই অ্যাম ডানসিং' নামে একটি হৃদস্পর্শী কবিতা পাঠ শুনেছিলাম। গোরো বেশ কয়েকটি হাইকু কবিতা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।

চেরি উদ্যানের মন্দির প্রাঙ্গণে, ওশো

নিজেদের দেশেও দুজনেই দেখলাম আমার জন্য বই ছবি কবিতা নিয়ে এসেছেন। একপ্রস্থ কফি খেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। আমারই হোটেলে কফি খাওয়া হল, কিন্তু আমাকে বিল মেটাতে দেওয়া হল না। তার কারণ, আমি তাঁদের অতিথি।

আতিথ্যের বহর তখনও আমার জানা বাকি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সারা শহর গাড়িতে ঘুরে বেড়ানো। যা কিছু দ্রষ্টব্য পায়ে হেঁটে দেখে বেড়ানো। বিচারালয়, প্রশাসনালয়, জাতীয় নাট্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে মস্ত এক হোটেলের বিশাল রেস্তোরাঁয় বসল মধ্যাহ্নভোজ সভা। ঘণ্টা চারেক চলল জাপানি আর বাংলা ভাষায় ছোটদের কবিতার অনুবাদ প্রসঙ্গ।

কাওয়াবাতা তাঁর অনূদিত ভারতীয় কবিতার ইংরিজি পাঠ শোনালেন, গোরো আমার জন্যে তাঁর বেশ কয়েকটি হাইকু ছবি সহ ইংরিজিতে অনুবাদ করে এনেছিলেন। তানিগুচি একই সঙ্গে জাপানি কবিতা ও তার ইংরিজি অনুবাদ পড়লেন। আমাকে তার তাৎক্ষণিক অনুবাদে বাংলা ভাষার ছন্দ ও ধ্বনি শোনাতে হল। শোনাতে হল আমার কবিতার ইংরিজি ভাষান্তরও।

ময়দানতুল্য কক্ষের ভেতরে কবিতার কথা, জানলার বাইরে আকাশ আলো-করা চেরিফুলের বন্যা, টেবিলে একের পর এক নানা গন্ধ-বর্ণের বিচিত্র সব পদ পরিবেশন— আমার পক্ষে এ এক দারুণ আনন্দের অভিজ্ঞতা।

একটু ছুটি নিয়ে রাস্তার ধারের চেরিফুলের ছবি তুলে ফিরে এসে দেখি, তানিগুচি মুখ নিচু করে বসে আছেন, হাতে রুমাল। অন্য দুজনের মুখেও কথা নেই।

হঠাৎ কী হল, সবাই কেন এমন নীরবতা পালন করছেন কিছুই অনুমান করতে না পেরে আমি বিব্রত বোধ করি।

কাওয়াবাতা জানালেন, আমার একটা কবিতা, ইংরিজি অনুবাদে শিবাজী যার নাম দিয়েছেন 'বারুইপুর', সেটা জাপানি ভাষায় অনুবাদ করতে করতে তানিগুচি কেঁদে ফেলেছেন, একেবারে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

তানিগুচি চোখ মুছে বললেন, কবিতাটা শেষ করে আমার বুক মুচড়ে উঠেছিল! ছোটবেলায় আমাদেরও ছিল ওইরকম গ্রাম, ওইরকম গাছপালা পুকুর-নদীর সঙ্গে আত্মীয়তা!

বলা বাহুল্য, একথা জেনে আমার খুব আনন্দ হল। কেননা, আমার ওই ক্ষীণাকার ছড়ার বইয়ের দুয়েকটা ছড়া নিয়ে দুয়েকজনের প্রশংসা শুনলেও, ছেলেবেলার গ্রাম নিয়ে লেখা ওই কবিতাটি পড়ে কেউ কেঁদেছে বলে কখনও শুনিনি। অথচ জাপানিদের মুখ প্রায় মোমের মতো ভাবলেশহীন! ছড়াটির শেষটা এই:

যত দিকের যত রাস্তা, ভেবে নিতাম— সবই আমার নিজের।

বিকেলবেলা কাটতো আমার ইস্টিশানের ব্রিজে।

কত দূরের ট্রেন আসতো, যাবে কতই দূরে—

জানলা-দুয়ার কাঁপতো ট্রেনের শব্দে— বারুইপুরে।

বারুইপুরে ছিল আমার প্রাচীন তেঁতুলগাছ—

পুকুরঘাটের সিঁড়ির জলে নাচতো পুঁটিমাছ।

তারাও আমার বড্ড চেনা, তাদের ছিল নাম—

বুকের মধ্যে ছটফটাচ্ছে ছেলেবেলার গ্রাম।

কবিতার আসর-শেষে আমরা গেলাম টোকিওর হোসে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৩০ বছরের প্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গোরো ইহারা ইংরিজি সাহিত্য পড়াতেন। আজ সেখানে আমাদের সমাবর্তন উৎসবের ধাঁচে গ্রেডেশান অনুষ্ঠান। পথেই চিরাচরিত বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিত তরুণ-তরুণীদের দেখেছি। প্রত্যেকের হাতে ফুল। গোরো বুঝিয়ে দিলেন এই ফুল এরা অধ্যাপকদের দেবে। অনুষ্ঠানের শেষে বা এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকার দল একসঙ্গে পান ভোজনেও মিলিত হবেন।

গোরো আমাদের নিয়ে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তিরিশ তলায়। সেখানে অনেকক্ষণ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকের সঙ্গে ভারত-জাপানের নানা প্রসঙ্গে কথা হল। জানলা দিয়ে নীচে জাপ-সম্রাটের প্রাসাদ এলাকাও দেখা হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে কিছুটা হেঁটে পৌঁছলাম বিশাল এক চেরি উদ্যানে। শুনলাম এখানে এক হাজার চেরিগাছ আছে। এখানকার বিশেষভাবে চিহ্নিত একটা গাছে প্রথম চেরিফুলের কুঁড়ি দেখে প্রতি বছর চেরিব্লসম উৎসবের দিন স্থির হয়। উদ্যানের মধ্যেই একদিকে মস্ত এক প্রাচীন মন্দির। সেও অনেকটা জায়গা নিয়ে। পুরো এলাকাটি একদিকে মন্দির দর্শনার্থী আরেকদিকে উৎসব-আনন্দপ্রত্যাশীদের ভিড়ে ভারি প্রাণময় হয়ে উঠেছে। চেরিগাছের তলায় তরুণ-তরুণীর দল চাদর শতরঞ্চি পেতে জায়গা দখল করতে ব্যস্ত। সারি সারি হরেক খাবারের দোকানে সবে কেনাকাটা শুরু হয়েছে। যত রাত হবে, ততই বাড়বে এই উৎসব-মত্ততা।

রাতের ভোজনের ব্যবস্থা করা ছিল সাবেকি জাপানি রেস্তোরাঁয়। টেবিলে প্রচুর খাবার এল। কাঁচা, সিদ্ধ আর শুঁটকি নানারকম মাছ আর অক্টোপাস আর কয়েকরকম সুসি, নুডল-স্যুপ,

এখানকার বিশেষভাবে চিহ্নিত একটা গাছে প্রথম চেরিফুলের কুঁড়ি দেখে প্রতি বছর চেরিব্লসম উৎসবের দিন স্থির হয়। উদ্যানের মধ্যেই একদিকে মস্ত এক প্রাচীন মন্দির। সেও অনেকটা জায়গা নিয়ে। পুরো এলাকাটি একদিকে মন্দির দর্শনার্থী আরেকদিকে উৎসব-আনন্দপ্রত্যাশীদের ভিড়ে ভারি প্রাণময় হয়ে উঠেছে। চেরিগাছের তলায় তরুণ-তরুণীর দল চাদর শতরঞ্চি পেতে জায়গা দখল করতে ব্যস্ত।

বর্ণাঢ্য পোশাকে সুসজ্জিত তরুণীরা

রাতের ভোজনের ব্যবস্থা করা ছিল সাবেকি জাপানি রেস্তোরাঁয়। টেবিলে প্রচুর খাবার এল। কাঁচা, সিদ্ধ আর শুঁটকি নানারকম মাছ আর অক্টোপাস আর কয়েকরকম সুসি, নুডল-স্যুপ, সেইসঙ্গে জাপানের বিখ্যাত বিয়ার আর জাতীয় পানীয় সাকে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ল টকটকে লাল কাঁচা মাছের চৌকো চৌকো টুকরো, আর খণ্ড খণ্ড অক্টোপাস।

হোসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রাস্তার ধারে খাবার বিক্রি করছে দুই মহিলা

সেইসঙ্গে জাপানের বিখ্যাত বিয়ার আর জাতীয় পানীয় সাকে। সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ল টকটকে লাল কাঁচা মাছের চৌকো চৌকো টুকরো, আর খণ্ড খণ্ড অক্টোপাস। আঙুলের ফাঁকে কাঠি নিয়ে অন্যদের খাওয়া যত দেখলাম, নিজে ততটা না খেলেও আমার তৃপ্তি কিছু কম হল না। অপলক চোখে তানিগুচির অক্টোপাস খাওয়া দেখছি দেখে তিনিও খুব মজা পেলেন। একটু পরে পরিচারিকা বিল দিয়ে গেলেন।

নৈশভোজের শেষ পর্ব থেকেই গোরো খুব নিবিষ্ট মনে কী যেন লিখছিলেন। নতুন কোনও 'হাইকু' তাঁর মাথায় এল নাকি! একটু পরে লেখা শেষ করে কাগজটা প্রথমে কাওয়াবাতা ও পরে তানিগুচিকে দেখালেন। তারপর তিনজনেই যে যার ব্যাগ থেকে দু-পাঁচ-দশ হাজার ইয়েনের গুচ্ছ গুচ্ছ নোট যথাসাধ্য আমার চোখ এড়িয়ে একটা জাপানি কবিতার বইয়ের মধ্যে গুঁজে দিলেন। কাওয়াবাতা তা থেকে কিছু নোট বের করে বিলের ফোল্ডারের মধ্যে রাখলেন।

আমি অনুমানে বুঝতে পারলাম, এ হল আমার জন্য সারাদিনের আতিথ্যের খরচ। যে বাতানুকূল গাড়ি চড়ে সারাদিন ঘুরেছি সেটা ট্যাক্সি। গোরো হুবহু গাড়িটার একটা রেখাচিত্র এঁকে তার তলায় ইংরিজিতে লিখেছেন ৬০,০০০। অর্থাৎ ৬০,০০০ ইয়েন, ভারতীয় মুদ্রায় ২৪,০০০ টাকা, এ শুধু ট্যাক্সির ভাড়া!

তিনজন মিলে আতিথ্যব্যয় বহন করছেন দেখে আমি বললাম, সবার মতো আমাকেও চাঁদা দেবার সুযোগ দেওয়া হবে না কেন? শুনেই তিনজনে এমন সমবেতভাবে খলবল করে উঠলেন যে আমাকে হতোদ্যম হতে হল।

ঠিক হল, কাল সকালে চিকায়ে তানিগুচি আমাকে জাতীয় যাদুঘরে নিয়ে যাবেন। জাপানের ইতিহাস আর ঐতিহ্য না দেখলে চলে নাকি? পরদিন যাওয়া হবে মাউন্ট ফুজি দেখতে। যদিও বেশ দূর এবং এই সময়টা ফুজির চূড়া মেঘে ঢাকা থাকবে, তবু, তানিগুচির মতে, ফুজির সামনে একবেলা না

জাপানের হাইকু কবিতা আর কাবুকি নাটকের কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। কখনও ভাবিনি যে এক প্রখ্যাত হাইকু কবিকে বন্ধু হিসেবে পাব, উপহার পাব সচিত্র হাইকু কবিতা। হাইকুরও দুটো ধরন আছে, লম্বালম্বিভাবে অক্ষর সাজানো, আর আড়াআড়িভাবে সাজানো। দুটোর দুই নামও বলে দিয়েছিলেন গোরো ইহারা, এঁর বয়স নাকি আশির ওপরে।

থাকলে জাপান দেখাই হয় না। ফুজি থেকে নিচের দৃশ্যও নাকি মনে দাগ কেটে দেয়।

আকাশ পরিষ্কার থাকলে ওসাকা থেকে টোকিও আসার পথে ট্রেন থেকেও ফুজির কিছুটা দর্শন পাওয়া যায়। একথা ওসাকায় শুনে এসেছি, টোকিওতেও শুনলাম।

ফুজির বিষয়ে সাতকাহন বলে তানিগুচি গত বছরের আগের বছর গ্রিসে বিশ্ব কবিসম্মেলনে পড়া নিজের একটা কবিতার কয়েক লাইন শুনিয়ে দিলেন:

What a pity that I could not bring our seasons with me:
The spring landscape dotted pink with cherry-blossoms
The superb and remarkable form of Fuji
covered with snow

পরদিন সকালে তানিগুচি ঠিক সময়েই এলেন। রিসেপশান থেকে ফোন পেয়ে লাউঞ্জে এসে দেখি খুব মন দিয়ে কাগজপত্র দেখছেন, হাতে বল পয়েন্ট।

কয়েকটি কাগজ আমাকে দিয়ে বললেন, কাল রাতে বাড়ি ফিরে আমার কম্পিউটারে এগুলো কম্পোজ করেছি, কোথাও ভুল হয়েছে কি না দেখছিলাম। ভুল আমার সহ্য হয় না।

দেখলাম আমার গতকালের কবিতা-দুটি, ছোটদের কবিতা লেখার বিষয়ে আমার এলোমেলো দু-চার কথা, কালকের অনুবাদ-আলোচনার সারসংক্ষেপ ইত্যাদি এক গোছা ফুটফুটে ছাপানো কাগজ।

ব্যক্তি মানুষের এই শ্রম, এই নিষ্ঠা, এই শুদ্ধতার জেদই বোধহয় জাপানের দ্রুত ও অবিশ্বাস্য উন্নতির বড় উপাদান।

যাদুঘর দেখতে আমার যাওয়া হবে না, তার কারণ বিকেল চারটেয় আমি কাবুকি থিয়েটারের টিকিট করে রেখেছি। তার মধ্যে তো আর ফেরা সম্ভব নয়।

অতএব তানিগুচি আমাকে মধ্যাহ্নভোজে নিয়ে চললেন।

বড় রাস্তার ধারেই পাঁচতলা বাড়ি। একতলায় বিয়ারখানা, সেখানকার খাবারের হুবহু মডেল বাইরে কাচের কেসে সাজানো আছে। দোতলায় চিনে রেস্তোরাঁ, তারও প্রতিরূপ কাচের ভেতরে দেখতে পাচ্ছি। তেতলায় জাপানি রেস্তোরাঁ, সেসব খাবারের মডেলও প্রদর্শিত। চারতলায় বোধহয় মেক্সিক্যান রেস্তোরাঁ। পাঁচতলায় জাপানি সাবেকি ঘরোয়া পরিবেশের রেস্তোরাঁ।

আমাকে সব কটির বিষয়ে ভালো করে ব্যাখ্যা করে, যেন আমার সম্মতি অনুসারেই, চিকায়ে আমাকে নিয়ে চললেন পাঁচতলার ভোজনশালায়।

আমাদের উঠোনের মতো একটা বাঁধানো চত্বরে জুতো খুলে রেখে ভেতরে ঢুকতে হয়। পাশে বেশ কয়েক জোড়া চটি দেখে একটায় পা গলাতে গেছি, চিকায়ে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, ওগুলো টয়লেটে যেতে হলে পরতে হয়। ভেতরে তোমাকে খালি পায়েই যেতে হবে। এ আমাদের বহুকালের রীতি।

ভেতরে ঢুকতে চিরাচরিত জাপানি পোশাকে সজ্জিত এক মধ্যবয়সী মহিলা আপ্যায়ন করে বসালেন। মাদুরের আসনে ছেলেবেলার মতো বাবু হয়ে বসলাম। সামনে জলচৌকির মতো ছোট নিচু টেবিল। একটু পরেই ওই মহিলা ও তার তরুণী কন্যা একের পর এক খাবার বাটি সাজিয়ে দিয়ে গেলেন। এখানেও আমি ইলমাছ-ভাত খেলাম। সঙ্গে জাপানি গ্রিন টি। কাপ শেষ হলেই আবার ভরে দিয়ে যায়।

চিকায়ে এমনিতে খুব ব্যস্ত মানুষ। নানা ধরনের লেখালেখির দায়িত্ব, তাছাড়া জাপানি কবিসংঘ ও অনুবাদ সংস্থার সদস্য।

জাপানের হাইকু কবিতা আর কাবুকি নাটকের কথা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। কখনও ভাবিনি যে এক প্রখ্যাত হাইকু কবিকে বন্ধু হিসেবে পাব, উপহার পাব সচিত্র হাইকু কবিতা। হাইকুরও দুটো ধরন আছে, লম্বালম্বিভাবে অক্ষর সাজানো, আর আড়াআড়িভাবে সাজানো। দুটোর দুই নামও বলে দিয়েছিলেন গোরো ইহারা, এঁর বয়স নাকি আশির ওপরে।

কাবুকি থিয়েটারে গিয়ে প্রথমেই মনে জাপানিদের ওপর শ্রদ্ধার ভাব জাগে। আমাদের দেশে এমন সযত্নলালিত, এমন বৃহদাকার প্রাচীন নাট্যমঞ্চ একটাও আছে কি? নাট্যচর্চার প্রাণকেন্দ্র কলকাতার থিয়েটার হলগুলোর কথা ভেবে মন বিষাদে ভরে যায়।

আমাদের ভারতনাট্যমের মতো কাবুকি নিয়েও বিদেশিদের বহুদিনের একটা অসুবিধা ভাষা। আগাগোড়া জাপানি ভাষায়, সেই ভাষার বাধা দেখলাম অনেকটাই দূর হয়েছে। চোখের সামনে নাটকের অভিনয় দেখছি, আর কানের হেডফোনে শুনছি নিচু গলায় কাহিনী ও সংলাপের ইংরিজি অনুবাদ।

দুটি নাট্যাভিনয় দেখলাম। এরকম প্রতিদিন তিনটি বা চারটি 'শো' হয়। বারো মাস তিরিশ দিন।

আমি এসেছি ওরিজিন্যাল কাবুকি থিয়েটার দেখতে। এর টিকিটের দামও বেশি। কাবুকি ঐতিহ্যের শুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব এঁদেরই। ন্যাশনাল থিয়েটারে যে কাবুকি নাটকের অভিনয় হয়, সেই নাটক আসল কাবুকি নাটক নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য আয়োজিত কাবুকি নাটকরচনার প্রতিযোগিতা থেকে পুরস্কৃত নাটক বেছে নেওয়া হয়। এ নাটক লেখাও হয় সমকালীন সমস্যা বা বিষয় নিয়ে।

ন্যাশনাল থিয়েটারের এইসব কাবুকি নাটকের অভিনেতাদের আদি কাবুকি থিয়েটারের শিল্পীদের কাছে তালিম নিয়ে অভিনয় করতে হয়। জাতীয় নাট্যশালার তুলনায় এই কাবুকি রঙ্গমঞ্চ শুধু আকারেই বড় নয়, স্থাপত্যের দিক দিয়েও বিশিষ্ট।

প্রথম যে নাটকটি অভিনীত হল তার কাহিনীটি খুব সংক্ষেপে এইরকম:

মহাসমুদ্রের মাঝখানে জনহীন একটা দ্বীপে কয়েকজন যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর জীবন কাটছিল। একদিন বহু দূর সমুদ্রে কালো ফুটকির মতো কী একটা তারা দেখতে পেল। ক্রমে বোঝা গেল ওটা একটা জাহাজ। সেই জাহাজ নিয়ে নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত জল্পনা-কল্পনা, ক্রোধ ও কান্নার মধ্যেই দেখা গেল জাহাজ এই দ্বীপের দিকে আসছে।

জাহাজ এল, নোঙর করল, সিঁড়ি লাগানো হল, ভেতর থেকে একজন রাজপুরুষ নেমে এসে জানালেন, কয়েদিদের সবাইকে মুক্তি

দেওয়া হয়েছে। সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই এই জাহাজ এসেছে। কয়েদিদের নামের তালিকাটিও পড়ে শোনালেন। তার মধ্যে একজনের নাম নেই! যার নাম নেই তার অবিশ্বাস, আক্রোশ, কাকুতিমিনতি, হিংস্রতার মধ্যেই অন্যদের সকলকে একে একে জাহাজে তোলা হল। থামিয়ে দেওয়া হল একজন অপরাধীর স্ত্রীকেও, স্বামীর দ্বীপান্তরের ঠিক আগেই যার বিয়ে হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে থাকার জন্যই মেয়েটি স্বেচ্ছায় জোর করে নির্বাসনে এসেছে। সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীর তালিকায় তার নাম নেই, ফলে মুক্তিপ্রাপ্তদের তালিকায়ও তার নাম ওঠেনি।

ইতিমধ্যে জাহাজ থেকে নেমে এলেন আরও উচ্চপদস্থ এক রাজ কর্মচারী, তাঁর হাতে সংশোধিত আরেকটি তালিকা। আগের তালিকাটি ভুল করে পড়া হয়েছে। নতুন তালিকায় মেয়েটির নাম ছাড়া আর সকলেরই নাম রয়েছে।

প্রথম তালিকার বাতিল লোকটি এবার পাগলের মতো উল্লাসে জাহাজে উঠতে যাবে, অর্ধেক সিঁড়ি উঠেও গেছে, এমন সময় দ্বীপে একমাত্র পরিত্যক্তা মেয়েটির তীক্ষ্ণ কান্না, আর্তনাদ। সেও জোর করে জাহাজে উঠবে। তার স্বামীও প্রহরীদের বাধা সত্ত্বেও তাকে জোর করে টেনে তোলবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে।

স্বামীকে ছেড়ে একলা থাকবে না বলেই মেয়েটি এই দুঃসহ দ্বীপান্তর মেনে নিয়েছে। তাকে এখন সকলকে ছেড়ে একেবারে একলা এই সম্পূর্ণ জনহীন দ্বীপে আমৃত্যু থাকতে হবে?

প্রথমে যার নাম বাদ পড়েছিল, সে নতুন তালিকা অনুযায়ী ঘরে ফেরার আনন্দে জাহাজে প্রায় উঠে গেছে, সে এই দম্পতির কান্না হাহাকার শুনতে শুনতে জাহাজ থেকে নেমে এল, তার বদলে মেয়েটিকে তার স্বামীর সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। সেই একজন মাত্র নির্বাসিতকে রেখে অন্য সকলকে জাহাজে তুলে নিয়ে, নোঙর তুলে জাহাজ চলে যাওয়ার দৃশ্যে পরিত্যক্ত নিঃসঙ্গ মানুষটির আর্তনাদ ও আকুলিবিকুলি দর্শকমাত্রকেই বেদনাবিদ্ধ ও রুদ্ধশ্বাস করে তুলবে। অসীম সমুদ্রে জাহাজটির শেষ বিন্দুটিও মিলিয়ে যাবার মুহূর্তে নিঃসঙ্গ দ্বীপে আমৃত্যু নির্বাসিতের একেবারে নিষ্ক্রিয় স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার অভিনয় অসাধারণ ও অতি উচ্চমানের। গল্পটিও গভীর মানবিকতার গল্প। তেমনই তাতে নাট্যময়তা। কত কাল ধরে এই ধরনের ধ্রুপদী গল্প, এমন অভিনয়শৈলী, সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা নিয়ে কাবুকি নাটক আজকের দ্রুতগতিসম্পন্ন, প্রযুক্তি-আচ্ছন্ন শহরজীবনের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে আছে ভাবলে একটু অবাকই হতে হয়।

পরদিন তানিগুচির সঙ্গে মাউন্ট ফুজি দর্শনের সুযোগ কাজে লাগাতে পারলাম না। কেননা কলকাতা থেকে ফ্যাক্স পেলাম, আজই এপ্রিলের ভ্রমণ-এর জন্য সম্পাদকের কথা না লিখলেই নয়।

লিখে, হোটেল থেকে ফ্যাক্স করতে করতে সন্ধে হয়ে গেল। না হল ফুজি যাওয়া, না হল দুপুরের খাওয়া। পরদিন কলকাতায় ফেরা। জাপান আমার অজানাই রয়ে গেল।

রোজকার দুয়েকটা জাপানি কথা শিখে এসেছিলাম, শব্দগুলোর ধ্বনির মধ্যে জাপানের সমাজ-পরিবেশের স্পর্শ পাই বলে কলকাতায় ফিরে এসেও চেষ্টা করি যাতে কথাগুলো ভুলে না যাই। এরকম কয়েকটি শব্দ:

ধন্যবাদ: **আরিগাতো গোদাইমাস + অ**
গুড মর্নিং: **ওহায়ো গোদাইমাস + অ**
গুড ডে: **কোনিচিওয়া**
গুড ইভনিং: **কনবান ওয়া**
বুঝেছি: **ওয়াকারিমাস্তা**
বুঝিনি: **ওয়াকারিমাসেন**
খুব দুঃখিত: **গোমেন নাসাই**
দুঃখিত: **গোমেন**
এক্সকিউজ মি: **সুমিমাসেন**

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' অক্টোবর ২০০১

ছবি: লেখক

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প।
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

আমার ছবি জীবন

শুভাপ্রসন্ন

"শত দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র, লজ্জার মাঝে সেই গোড়ার দিকের আমার ক্ষুদ্র আর্ট কলেজ ভালোবাসায়, মাদকতাময় জীবন ও যৌবনের তরঙ্গে আমার নিরানন্দ ঘুচিয়ে দিয়েছিল। স্পর্ধিত করেছিল সবকিছু থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ছবিজীবনের পথে। ছাত্রদের নিয়ে বেরিয়ে পড়া, কখনও নেপালে, কখনও পাঁচমারিতে, রাজস্থান, দিল্লি, বেনারস, কোথায় নয়! তারাও জীবনের ইতিবাচক স্বপ্ন নিয়ে আমাকে ধ্রুবতারা করে রেখেছিল। তখনও সামাজিক বিবাহ হয়ে ওঠেনি। হাতে হাত মিলিয়ে, দেহ-মন এক করে কাজ করে চলেছি। ছাত্রেরা বুঝেছে কিন্তু এত স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে যে, কোনও সংশয়ের-সন্দেহের-লুকোচুরির অবকাশ হয়নি।

বেশ কয়েকমাস কি একবছরের কাছাকাছি পেরিয়ে যখন বেশ জমে উঠেছে সেই প্রাসাদের কোনায় ক্ষুদে আর্ট কলেজ, এমনই সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল।"

১১

যদি বিবাহ বলা যায়, কিংবা যদি বিবাহ শব্দটিকে অলংকারহীনভাবে দেখা যায়, তাহলে সেদিনই আমাদের বিয়ের দিন। সে অনুষ্ঠানের সাক্ষী আমরা দুজন। সে চেনা-অচেনা হিসেবের বাইরে। ক্রমশ, আমার বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক কমে যেতে লাগল। আমি আর সে—এই দুটি প্রাণী যেন পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ক বিচ্যুত একান্ত সম্পর্কের। আমার এত পরিচিত এত মহল এত মহল্লা, এমনকী যারা গতকালও অনেক সঙ্গ দিয়েছে, যাদের সঙ্গ পেতে আমি অত্যন্ত উদগ্রীব, আমার যেন তাদের কাছে যেতে অনীহা। মন সায় দেয় না। অথচ হুহু করে সময় উধাও হয়ে যেতে লাগল। সবচেয়ে অসুবিধা দেখা দিল ওকে ছবি আঁকা শেখানো নিয়ে। ঠিক এরকম সময়ে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে আমার কাছে ছবি আঁকা শেখার প্রস্তাব নিয়ে যোগাযোগ করা শুরু করে। আমার তখন মনে হল— এদের সবাইকে নিয়ে যদি একটি স্টুডিও গড়ে তোলা যায়, তাহলে শিপ্রাকেও শেখানো যাবে আর ওর সঙ্গে যোগাযোগ নিয়মিত হবে। সোসাইটি অব কনটেমপোরারির যে ঘর আমেরিকান লাইব্রেরির ওপরে, যেখানে আমি আর করুণাদি যেতাম, কাজ করতাম আরও অন্য দাদাদের সঙ্গে, সেটা ওরা চালাতে পারেনি

নিয়মিত ভাড়া জোগানো সম্ভব হয়নি বলে। ওই ফ্ল্যাটটি দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন দিলীপ দাশগুপ্তের ছাত্র শঙ্কর ঘোষ। তাঁর কাছে প্রস্তাব দিই এই ঘরটির ভাড়া মিটিয়ে যদি আমরা একটা স্টুডিও করতে পারি। আসলে সেটি ছিল প্রবীণ শিল্পী দিলীপ দাশগুপ্তের স্টুডিও। তিনি প্রতিবন্ধী ছিলেন। ওই ফ্ল্যাটে তাঁর স্টুডিওয় এই সময়ের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা প্রায় সকলেই শিক্ষার্থী হিসেবে যাতায়াত করতেন। সনৎ কর, প্রকাশ কর্মকার, করুণা সাহা, নিপা চৌধুরি, শক্তি বর্মণ —এরা সকলেই দিলীপবাবুর ছাত্রছাত্রী। কোনও এক অজানা অভিমানে তিনি একদিন স্টুডিওর দরজা বন্ধ করে দেন। সেই ফ্ল্যাটে আর ঢোকেননি। দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে যান শঙ্কর ঘোষকে।

ওইটারই আর একটি অংশ ভাড়া নিয়েছিলেন শঙ্কর ঘোষ। উনি চাকরি করতেন নীচের তলায় ইউ এস আই এসের অফিসে। তাই ফাঁকা স্টুডিওটির দেখাশোনার দায়িত্বে তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। আমি রফা করি ওঁর সঙ্গে। ঠিক হয় আমি শিল্পচর্চার ছোট একটা ক্ষেত্র গড়ব। বিনিময়ে মাসে কিছু টাকা দেব। করুণা সাহা আমার সঙ্গে যুক্ত হন। করুণাদি মডার্ন হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন। খুব বলিষ্ঠ চেহারা। রেখা ও রং লেপনে তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন। ওঁর স্বামী ছিলেন অত্যন্ত বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শম্ভু সাহা। সে-সময়ে ডাকাবুকো বাঙালি এবং সাহসিনী মহিলা বলতে এক নামে করুণা সাহাকে সকলে চিনতেন। এই করুণাদি জাঁ রেঁনোয়ার ছবিতে কিছু কাজ করেছিলেন। অফুরন্ত প্রাণশক্তি। কিন্তু রোগমুক্ত ছিলেন না। তাই নিয়মিত ক্লাস নিতে পারতেন না। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। উৎসাহ, পরিশ্রম আর উদ্যমে আমার খামতি ছিল না। তাই জমে উঠেছিল খুব অল্পদিনে সেই শিল্পচর্চার ছোট্ট কেন্দ্রটি। বিষয়টা জানাজানি হওয়ায় প্রথমদিনই মনে আছে, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে প্রায় বাইশজন তরুণ-তরুণী। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল অন্য আর্ট কলেজের শিক্ষার্থী। আর কেন্দ্রবিন্দু শিপ্রা। আমি আমার সমস্ত উদ্দীপনা, শিক্ষা ঢেলে দিয়ে ওদের উৎসাহিত করতাম। ক্লাস শুরু হত শেষ-বিকেলে। চলত শেষ-সন্ধ্যা পর্যন্ত। বারান্দায় দাঁড়ালে ব্যস্ত কলকাতা। কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হর্ম্যে আমি স্টুডিও চালাই। দুই বাই দুই ইতালিয়ান মার্বেলে মোড়া মেঝে। ছবি আঁকার চর্চা চলে। ঘুম থেকে উঠে ভাবি, কখন স্টুডিও যাব, কখন সেইসব সঙ্গ পাব। আমার সমস্ত প্রেম, ভালোবাসা, অহংকার সর্বোপরি স্বপ্ন সবই যেন একমুখী হয়ে গেল।

প্যারিসে দেখা ইকোল দ্য বোজার্তের কথা মনে পড়ে। আমি ভবঘুরের মতো ঢুকে

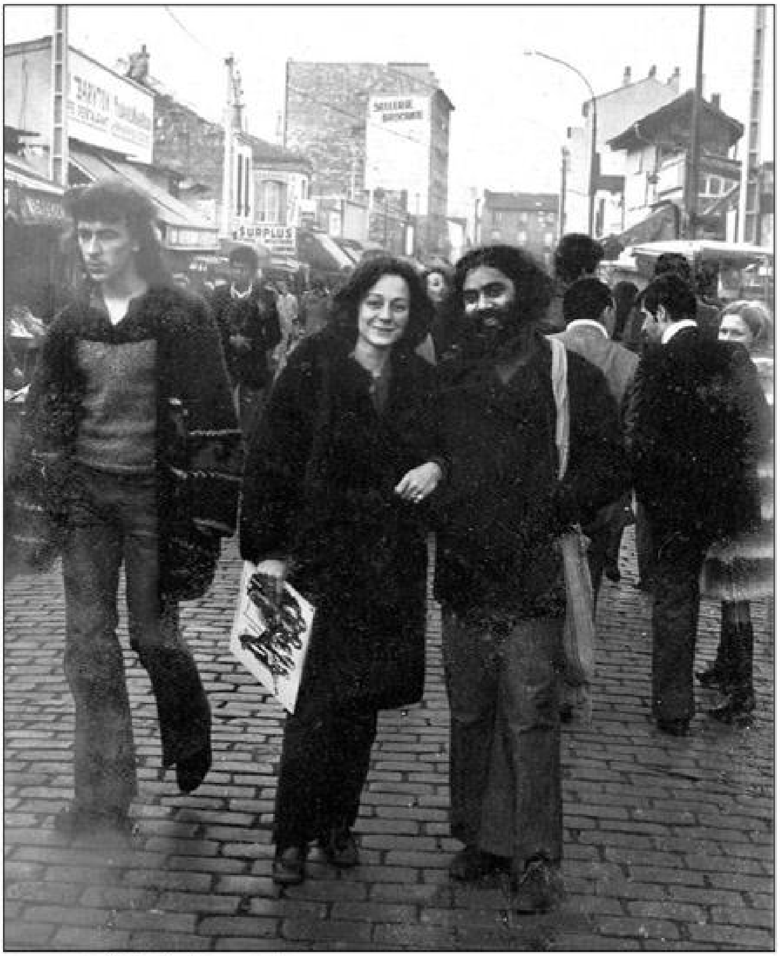

১৯৭৫ সালে শিল্পী অলিভার সঙ্গে লেখক

পড়েছিলাম সেই প্রাচীন শিল্প-শিক্ষা মন্দিরে। ঢুকেই সেই প্রশস্ত উঠোন, উঁচু দেয়ালে সর্বযুগের জগৎপ্রসিদ্ধ শিল্পী যাঁরা এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন— কেউ ষোড়শ শতাব্দীর, কেউ তার আগে-পরে। এঁদের থেকে শুরু করে কে নয়! এ প্রাসাদে কোনও কোলাহল নেই। হয়তো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু মানুষের পদচারণা। আমি উঠে যাই দোতলায়। বিশাল চওড়া বারান্দা। কৌতূহলী মন নির্ভয়ে এগিয়ে যায়। ডানদিকে ভেজানো দরজার কাছে দাঁড়াই, ময়লা সাদা কমপক্ষে ষোলো ফুট উঁচু আট ফুট চওড়া সে দরজা। কী সাহসে জানি না আমি খুলে ফেলি। সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে দরজা খোলার শব্দে যেন তালভাঙা বেসুরো একটা শব্দ নিজের কানে খটকা লাগল। বুকভরা বিস্ময় আমায় উত্তেজিত করে তুলল। বিশাল হলঘর। কোথায় শুরু, কোথায় শেষ দেখা যায় না। কমপক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশজন যার যার মতো বুঁদ হয়ে ছবি এঁকে চলেছে। কেউ ইজেলের সামনে তেলরঙে ছবি আঁকছে, কেউবা ড্রয়িং,

কোনও ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই— শুধু সুন্দর আর সুন্দর। সেই বোজার্তে কাজ করে চলেছে মগ্নতায়। তাদের দেহ, বর্ণ সব যেন মরসুমি ফুলের রঙে আর বসন্তের খেয়ালি হাওয়ায় আন্দোলিত। বিবসনার দেহ যেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা ঐশ্বরিক নারী।

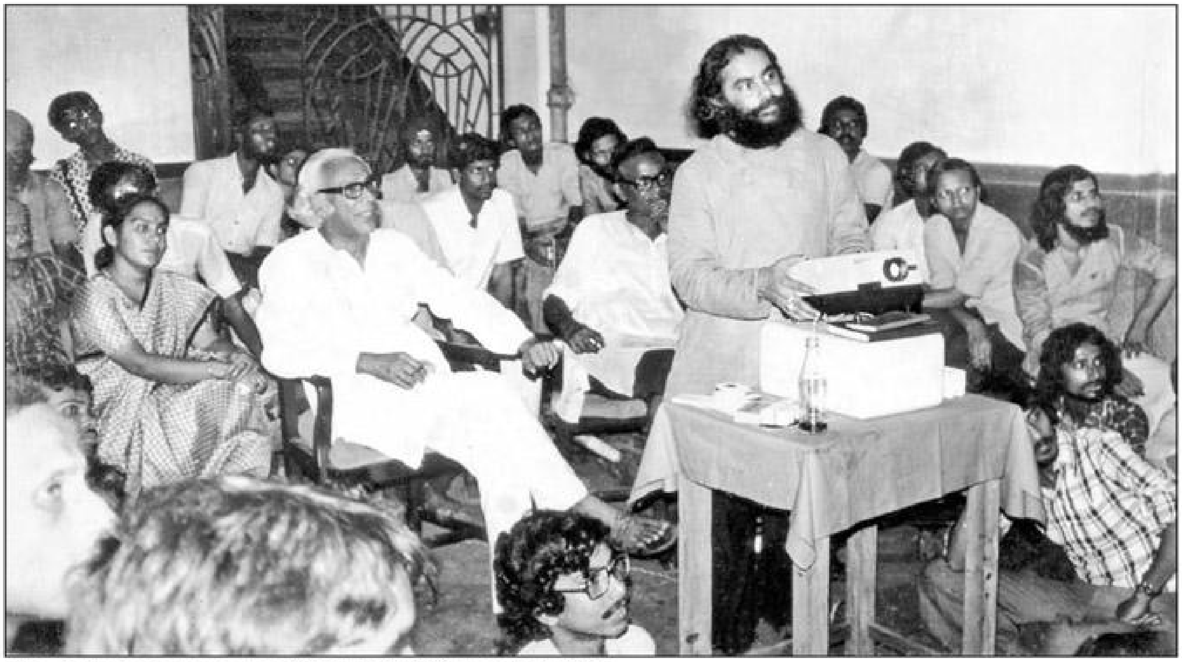

১৯৭৮ সাল। কলেজ রো-র কলেজ অব ভিস্যুয়াল আর্টে অতিথি ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত

প্রশস্ত দালানে আমাদের কত কী আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরস্বতী পুজো আর প্রায়শই বিদেশি শিল্পী, সমালোচকের আনাগোনা। কে না আসতেন! প্রদোষ দাশগুপ্ত, ভবেশ সান্যাল থেকে শুরু করে প্রবীণ-নবীন অনেক মানুষদের আনাগোনা। কোনওদিন মৃণাল সেন তাঁর ছবি বিষয়ে আলোচনা করছেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, কোনওদিন কোনও অভিনেতা কিংবা কবি ক্লাস নিচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত মেতে থাকা সময়— ছাত্রছাত্রী, ভাস্কর্য, ছবি, মিউরাল এইসব নিয়ে।

কেউবা টেবিলে বসে কিছু। একটি তরুণী ডানদিকে এলানো। দুদিকে দুটি বিবসনা নারী। কী অপূর্ব। তাকে ঘিরে কেউবা দূর থেকে তার শরীর আঁকছেন। আমি এক বহিরাগত প্রাণী, বসনে-অবয়বে ভিন্ন, বিদেশি কিন্তু কেউ আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আমি সেই বিশাল কক্ষে ঘুরে বেড়াই বিস্ময়ে স্বপ্নিল উত্তেজনায়। আমি মাপে এত ছোট, শিল্পলোকের পৃথিবীতে আর কি সুখের হয়! কোনও ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই— শুধু সুন্দর আর সুন্দর। সেই বোজার্তে কাজ করে চলেছে মগ্নতায়। তাদের দেহ, বর্ণ সব যেন মরসুমি ফুলের রঙে আর বসন্তের খেয়ালি হাওয়ায় আন্দোলিত। বিবসনার দেহ যেন মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আঁকা ঐশ্বরিক নারী। তার মুখ, গ্রীবা, স্তন, তনু যেন বাস্তবের নয়, রূপকথার, স্বপ্নের। বিনা অনুমতিতে আমি ঘুরে বেড়াই এই স্বপ্নের বাগিচায়। কেউ বাধা দেয় না, কেউ কৌতূহলী হয় না। কত সময় এভাবে কেটে যায়। হঠাৎ দেখি, এক প্রৌঢ় দু-পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঝাঁকড়া চুল, সহাস্য মুখে লম্বা ঝোলা কোট পিছনে চাপিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরছেন আর কখনও কাছে, কখনও দূরে অঙ্কনরত চিত্রীদের কাজ দেখছেন। কিছু কিছু কথার বিনিময়ে সব যেন খুশিতে। ফরাসি শব্দের ধ্বনি মনে হয় যেন কোনও পাখির কলতান। একটি তন্বী নারীর কাছে পৌঁছে যান। পরনে তার জিন্সের প্যান্ট। উর্ধ্বাঙ্গে শুধুই হালকা ঢলঢলে সাদা গেঞ্জি, অনিয়ন্ত্রিত যৌবন তরঙ্গায়িত। উনি দাঁড়িয়ে কিছু কথোপকথন করলেন। পরস্পর চুম্বন বিনিময় হল, তারপর সে তরুণীর স্তনবৃন্ত একটু দুলিয়ে দিলেন। একটা উজ্জ্বল হাসির ঝলক বেরিয়ে এল। শিশুর টোল খাওয়া গালের পাশ দিয়ে নিষ্কলঙ্ক লালার মতো কী যেন নির্গত রস অনুভব করলাম। আমি কখন চলে এসেছি জানি না কিন্তু কত ঘণ্টা কেটেছে, কত দিন কেটেছে, কত মাস, কত বছর, কত যুগ পেরিয়ে আজও শরীর অনুরণিত হয়, আজও বাস্তব, অবাস্তব ভুলে যাই, সেই স্মৃতি শরীরে। ওখানে আমাদের মতো শিক্ষাব্যবস্থা নয়! এখানে শিল্পশিক্ষার মহাবিদ্যালয়গুলিতে যেমন প্রতিটি ক্লাসে নানা ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়, ওখানে তা নয়। এক-একজন শিক্ষক, যেন গুরুকুলের মতো। তিনি তাঁর নির্বাচনে ছাত্র নেন। সেইমতো তাঁর অধীনে প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত একসঙ্গে ছাত্ররা চর্চা করেন। তাই প্রথম বর্ষের ছাত্র আর পঞ্চম বর্ষের ছাত্র আলাদা কক্ষে নয়, একই কক্ষে সদ্য শিক্ষার্থী থেকে প্রায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা চর্চা করে। সংশাপত্রে সেই গুরুর স্বাক্ষর আর প্রতিষ্ঠানের ছাপ। সেটাই একমাত্র শিলমোহর বা ছাড়পত্র। সে-সময় বিদেশে ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতা আর ইচ্ছাকে সম্বল করে আমি গড়ে তুলি আমার এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটি ‘কলেজ অব ভিস্যুয়াল আর্ট’ নামে। স্পর্ধা বাড়ে, সাহস বাড়ে। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহে, সদর্থ ভালোবাসায়, প্রশংসায়।

শত দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র, লজ্জার মাঝে সেই গোড়ার দিকের আমার ক্ষুদ্র আর্ট কলেজ

ভালোবাসায়, মাদকতাময় জীবন ও যৌবনের তরঙ্গে আমার নিরানন্দ ঘুচিয়ে দিয়েছিল। স্পর্ধিত করেছিল সবকিছু থেকে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ছবিজীবনের পথে। ছাত্রদের নিয়ে বেরিয়ে পড়া, কখনও নেপালে, কখনও পাঁচমারিতে, রাজস্থান, দিল্লি, বেনারস, কোথায় নয়! তারাও জীবনের ইতিবাচক স্বপ্ন নিয়ে আমাকে ধ্রুবতারা করে রেখেছিল। তখনও সামাজিক বিবাহ হয়ে ওঠেনি। হাতে হাত মিলিয়ে, দেহ-মন এক করে কাজ করে চলেছি। ছাত্রেরা বুঝেছে কিন্তু এত স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে যে, কোনও সংশয়ের-সন্দেহের-লুকোচুরির অবকাশ হয়নি।

বেশ কয়েকমাস কি একবছরের কাছাকাছি পেরিয়ে যখন বেশ জমে উঠেছে সেই প্রাসাদের কোনায় ক্ষুদে আর্ট কলেজ, এমনই সময় এক কাণ্ড ঘটে গেল। তখনও শিপ্রা আমি সংসার পাতিনি। ধর্মতলার সেই ক্ষুদে প্রতিষ্ঠান একদিন সংবাদমাধ্যমের প্রশংসায় উঠে এলে ফ্ল্যাটের মালিক শিল্পী দিলীপ দাশগুপ্ত মহাশয় বিচলিত হন। আমাকে ডেকে পাঠান। সাক্ষাতে বলেন, তুমি যে ওখানে ছবি আঁকার চর্চাকেন্দ্র গড়ে তুলেছ সেটা আমার প্রাণের জিনিস কিন্তু আইনমতো সেখানে কোনও পাবলিক কাজ করা যায় না। যতদিন এটা প্রকাশ্যে আসেনি ততদিন একথা তোমায় জানাইনি। কিন্তু এই সংবাদের ভিত্তিতে এল আই সি-র কর্তৃপক্ষ আমার ফ্ল্যাট নিয়ে নিতে পারেন। তাদের সে ক্ষমতা আছে। আমি এ আশঙ্কা করছি, তুমি তাই আপাতত প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দাও। আমার তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। ফিরে আসি। যোগাযোগ করি সেই ২নং কলেজ রো-এ। যে পরিবারে আমার কৈশোর স্মৃতি, প্রশ্রয়, ভালোবাসা জড়িয়ে আছে। আমি সে বাড়ির গৃহকর্তা শচীন দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্নেহের হাত বাড়িয়ে বলেন, এ আর কী! তুমি একতলার ভিতরের দিকের জায়গাটা ব্যবহার করতে পারো। শুধু ইলেক্ট্রিকের খরচটা আমাকে দিয়ে দিয়ো। এ আমার কল্পনার অতীত ছিল। মাঝে রোববার ছিল। সমস্ত সরঞ্জাম তুলে নিয়ে সাজিয়ে ফেললাম কলেজ রো-এ সেই নতুন আস্তানায়। সরঞ্জাম আর কী? ৩০টি টুল, ২০-২২টি ইজেল, আর হয়তো খাতাপত্তর, টেবিল, ফুলদানি, কঙ্কালের খুলি এইসব। ওখানে একটা ছোট্ট নোটিস ঝুলিয়ে দিই কোথায় হবে পরের ক্লাস। একদিনে স্থানান্তরিত হয়ে গেল আমার ক্ষুদে আর্ট কলেজ। কেউ জানল না কীভাবে সম্ভব হল, কী বা ঘটেছিল! তফাত এটুকুই— চৌরঙ্গির মুখে বিশাল চিহ্নিত প্রাসাদে, আভিজাত্যে মোড়া আখড়ায় যে তরুণ-তরুণীরা জড়ো হত, তাদের সেই পরিবেশ থেকে মধ্যবিত্ত এক পরিবেশে চলে আসতে হল। কিন্তু এখানেও প্রশস্ত দালান ছিল। ঘরগুলোও বড়।

সবচেয়ে বড় কথা ভিতরে ঢুকে কোলাহলহীন শান্ত পরিবেশ পেলাম— যা কাজের পরিবেশের পক্ষে আদর্শ। আমরা ক্রমশ গোটা নীচতলাটাই অধিকার করে ফেলেছিলাম। প্রশস্ত দালানে আমাদের কত কী আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরস্বতী পুজো আর প্রায়শই বিদেশি শিল্পী, সমালোচকের আনাগোনা। কে না আসতেন! প্রদোষ দাশগুপ্ত, ভবেশ সান্যাল থেকে শুরু করে প্রবীণ-নবীন অনেক মানুষদের আনাগোনা। কোনওদিন মৃণাল সেন তাঁর ছবি বিষয়ে আলোচনা করছেন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে, কোনওদিন কোনও অভিনেতা কিংবা কবি ক্লাস নিচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত মেতে থাকা সময়— ছাত্রছাত্রী, ভাস্কর্য, ছবি, মিউরাল এইসব নিয়ে।

আমার জীবনে প্রেম, ভালোবাসা, শিল্পচর্চা একাকার হয়ে বুঁদ হয়ে চলছিল সে-সময়। মাঝেমধ্যে স্থানীয় সর্বভারতীয় আর আন্তর্জাতিক কোনও প্রদর্শনীতে যোগ দেওয়া আর আমার এই ক্ষুদ্র আর্ট কলেজের ছাত্রছাত্রী আর মধ্যবর্তিনী শিপ্রা। তখন সোসাইটি, ক্যালকাটা পেইন্টার্স বা অন্য সমসাময়িক শিল্পী ও শিল্পীদলের সঙ্গে আমার মেলামেশায় কোনও ফাঁক ছিল না। ভোর থেকে শুরু হয়ে কখন দিন ফুরিয়ে যেত বুঝতে পারতাম না। এভাবে বেশ কয়েকবছর স্বপ্নের মতো কেটে গেল। এর মধ্যে দুঃখ, যন্ত্রণা, ক্ষোভ, অভিমান, অভাবের যুদ্ধ সবই পেরিয়ে যেতাম শিপ্রার সান্নিধ্য, ভালোবাসা, বিশ্বাস আর আস্থার শক্তিতে। এর মাঝে একাধিকবার বিদেশ ঘুরেছি প্রদর্শনী নিয়ে। ছবির বিনিময়ে যে বিদেশি মুদ্রা অর্জন করতাম তাতে ভারতীয় অঙ্কে আমার জীবনস্বপ্নের রসদ উঠে আসত। এ শহরে আমার পরিচিতি ছড়িয়ে ছিল সেই শৈশব থেকে। শৈশবে কৈশোরের মতো জীবনযাপন করেছি, কৈশোরে তারুণ্যের মতো, তারুণ্যে যৌবনের মতো আর যৌবনে প্রৌঢ়ের মতো। মেলামেশা, স্বপ্নকল্প জীবনে আমার সঠিক বয়স উপলব্ধি করতাম না। ম্যাক্সমুলার ভবনের সঙ্গে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেটা জার্মানিতে যোগাযোগ থাকার জন্য নয়। আসলে কলকাতায় যেসব বিদেশি সংস্কৃতিকেন্দ্র, তাদের সকলের সঙ্গে নানা কারণে আমার যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ম্যাক্সমুলার ভবনের কর্মকাণ্ড, সুযোগ-সুবিধা অন্যান্য বিদেশি সংস্কৃতিকেন্দ্র থেকে ছিল অনেক বেশি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের গাম্ভীর্য আলাদা। ওদের ব্যবহারে আমরা নেটিভ। আর ছোট্ট কোনও অনুষ্ঠান কিংবা কোনও এক সাধারণ মাপের মানুষ হয়তো অতিথি হয়ে ইংল্যান্ড থেকে আসবেন,

নতুন নতুন নাটক, জার্মান নাট্যকারের প্রভাবে কিংবা সরাসরি নাট্যরূপে উপস্থাপনা হত প্রায়শই। সকাল-সন্ধ্যা রোগা ঢ্যাবঢেবে চোখে উদভ্রান্ত এক যুবক অঞ্জন দত্ত একদল তরুণকে নিয়ে মেতে থাকত... তখন অধিকর্তা পদে রোনাল্ড শাফনার। তাঁর ধ্যানজ্ঞান শুধু নাটক। তার কারণ ছিল ওঁর স্ত্রী ব্রাজিলিয়ান, অত্যন্ত দক্ষ নৃত্যশিল্পী কারমেন।

তার জন্য সারা বছর ধরে প্রস্তুতি। আগাম বার্তা। আতিশয্যের এত বাড়াবাড়ি ভাবা যায় না। ওদের লাইব্রেরি বহু শিক্ষার্থী, গবেষক আর শিক্ষাব্রতীর কাছে বিরাট আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। তখন সবে ব্রিটিশ কাউন্সিল ডালহৌসি চত্বর থেকে থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্রাসাদোপম সে বাড়ি। সামনে তার বিশাল সবুজ লন। চাটুজ্যেদের বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। আমার যাতায়াত ছিল সেই বাড়িতে। কিন্তু তুলনায় ছোট্ট বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এককোণে জমাটি ম্যাক্সমুলার ভবন। সেখানে পরিচ্ছন্ন, সুন্দর একটি অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, ভাষাশিক্ষার ক্লাসরুম, প্রদর্শনীকক্ষ, অধিকর্তার ঘর— সব মিলিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র। হ্যাঁ, তার ক্যান্টিন সেইসব দশকের ছাত্রছাত্রীদের অন্যতম হৃদয়ের জায়গা ছিল। নতুন নতুন নাটক, জার্মান নাট্যকারের প্রভাবে কিংবা সরাসরি নাট্যরূপে উপস্থাপনা হত প্রায়শই। সকাল-সন্ধ্যা রোগা ঢ্যাবঢেবে চোখে উদভ্রান্ত এক যুবক অঞ্জন দত্ত একদল তরুণকে নিয়ে মেতে থাকত, ম্যাক্সমুলার ক্যান্টিনের কর্ণধার ছিল তার স্ত্রী। রান্নাও করত নিজে হাতে। আমার যাতায়াত আর একটু আগে থেকে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতা আশ্রয়-প্রশ্রয় ওই সময়ে। তখন অধিকর্তা পদে রোনাল্ড শাফনার। তাঁর ধ্যানজ্ঞান শুধু নাটক। তার কারণ ছিল ওঁর স্ত্রী ব্রাজিলিয়ান, অত্যন্ত দক্ষ নৃত্যশিল্পী কারমেন।

১৯৭৮ সালে কলেজ অব ভিস্যুয়াল আর্টে ভারতীয় শিল্পকলার ওপর বক্তব্য রাখছেন শিবনারায়ণ রায়

> ম্যাক্সমুলারকে কেন্দ্র করে এক আন্তর্জাতিক পরিবেশ, শিক্ষা আমার জীবনে কাজে লেগেছে। কেন জানি না বছরের পর বছর যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে জার্মান সংস্থায় যুক্ত হতেন, তা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব হোক কিংবা ভাষা শেখানোর দায়িত্ব, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠত আমার। সেগুলো ঠিক কৃত্রিম ছিল না।

একদিকে কারমেন নতুন ভাবনায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নৃত্যনাট্য পরিবেশন করছেন। কখনও জার্মান সাহিত্যিকের লেখা, কখনও আমাদের পুরাণগ্রন্থ থেকে, কখনও আধুনিক ভাবনায় পৃথিবীর মূল স্রোতের ছন্দকে ধরে একের-পর-এক ম্যাক্সমুলার ভবনের অডিটোরিয়ামে উপস্থাপনা করে চলেছেন। অন্যদিকে অঞ্জন দত্ত সম্পূর্ণভাবে ম্যাক্সমুলারে একদল ছেলেকে তৈরি করে কখনও ব্রেখট, কখনও পিটার ভাইসের নানা অনূদিত নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছে। আমিও প্রায় প্রতিদিন ওখানে যাই। কখনও মঞ্চ পরিকল্পনা, পোশাক পরিকল্পনা আর সমস্ত অনুষ্ঠানে পোস্টার আঁকা— এ আমার রুজিজীবন আর শিল্পচর্চার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছিল। ওরা ভালোবাসতেন। কাজের মর্যাদা দিতেন। আর অজুরার টাকা পেতে কোনও অসুবিধা হত না। আমাদের মধ্যমণি বন্ধু ছিলেন এস ভি রামণ। শাফনার একজন প্রকৃত শিল্পীমনের মানুষ ছিলেন। সে-সময় আমরা তাঁর পারিবারিক বন্ধু হয়ে পড়েছি। অন্যদিকে রাজুর মতো বন্ধুবৎসল সংগঠক আর ইতিবাচক মানুষ খুব কম দেখা যেত। যে-কোনও মানুষকে পৃথিবীর যে-কোনও মানুষের ঠিকানা দিতে এবং এত দ্রুত দিতে আমি কাউকে দেখিনি। আমাদের মতো সংসারী ভবঘুরেদের ও ছিল নিশ্চিন্ত ঠিকানা।

ম্যাক্সমুলারকে কেন্দ্র করে এক আন্তর্জাতিক পরিবেশ, শিক্ষা আমার জীবনে কাজে লেগেছে। কেন জানি না বছরের পর বছর যাঁরা দায়িত্ব নিয়ে জার্মান সংস্থায় যুক্ত হতেন, তা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব হোক কিংবা ভাষা শেখানোর দায়িত্ব, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠত আমার। সেগুলো ঠিক কৃত্রিম ছিল না। জার্মান চরিত্রে নিয়মানুবর্তিতা, কথা রাখা, খেজুরে গল্প না করা আর অন্যের কথা শোনার এক সভ্য শিক্ষা ছিল। শাফনারের সময় যেমন আন্তিগোনে গোটা শহরে প্রবল সাড়া ফেলে তার উপস্থাপনার অভিনবত্বে। এই উপলক্ষে তাঁরা বহু প্রতিভাবান স্থানীয় তরুণ-তরুণীকে বেছে নিয়েছিলেন অভিনয় আর প্রযোজনার কাজে। ম্যাক্সমুলার তখন পরিণত হয়েছিল তারুণ্য-যৌবনের সবচেয়ে বড় আখড়ায়। তবে নিয়ম-নির্দেশে অধিকর্তারা বদলে যান। প্রতিটি অধিকর্তার ভালোলাগা, ইচ্ছার ভিন্নতায় প্রতিষ্ঠানের মূর্ছনা বদলে যায়। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেমন আমার রুজিরোজগারের একটা পথ তৈরি হয়েছিল তেমনই আবার সময়ে সময়ে দুই দেশের আদানপ্রদানের সেতু

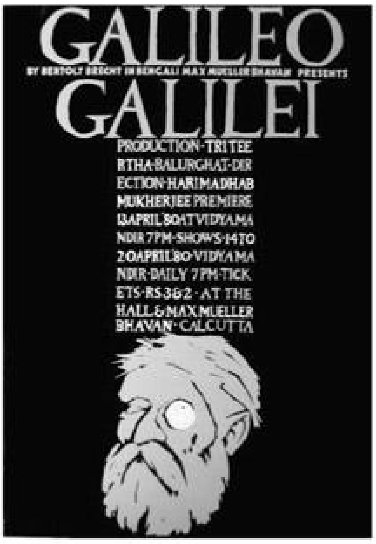

১৯৮০ ম্যাক্সমুলার ভবনে অভিনীত গ্যালিলেও গ্যালিলি নাটকের পোস্টার। শিল্পী লেখক

গড়ার কাজে যেসব শিল্পী-শিবির হত তাতে আমন্ত্রণ থাকত আমার। যোগ দিয়েছি, লাভবান হয়েছি। যদিও আমার জার্মানিতে যাতায়াত, জার্মান যোগাযোগ আর সেই যোগাযোগকে কেন্দ্র করে যে কর্মকাণ্ড তার সঙ্গে ম্যাক্সমুলারের কোনও যোগসূত্র ছিল না। এটি জার্মান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হলেও গোয়েটে ইনস্টিটিউট একটি স্বাধীন সত্তা। সরকারের সরাসরি প্রতিনিধি হলেন রাষ্ট্রদূত আর তার অধীনে বিভিন্ন কনস্যুলেটেরা। বরং আমার যোগাযোগ রাখতে হত জার্মান কনস্যুলেট বা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। কারণ ছাড়পত্রের অধিকার তো তাঁদেরই। পরবর্তীকালে জার্মান সরকারের সম্মানজনক আমন্ত্রণ পেয়েছি, যা সাধারণত একজন শিল্পী বা সংস্কৃতিকর্মীর ভাগ্যে জোটে না। তা আমার কাছে সৌভাগ্যের এবং গর্বের বলে মনে হয়েছিল। আসলে বহুবার প্রদর্শনীর জন্য যাতায়াতের ফলে বহু বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুবাদে জার্মানি আমার খুব পরিচিত ও সহজ সম্পর্কের দেশ হয়ে উঠেছিল। পূর্ব জার্মানি আর পশ্চিম জার্মানি তখন দুটি আলাদা অস্তিত্ব। আমি বিভাজিত এই দুই দেশে সীমান্ত পেরিয়ে যাতায়াত করেছি। দুই দেশ যুক্ত হওয়ার সন্ধিক্ষণ থেকে যোগাযোগ আছে আমার। এলবে নদীর ধার দিয়ে যেমন হেঁটেছি, রাইনে-ও। পরবর্তী আরেকজন জার্মান অধিকর্তা ডঃ নাগেল, তাঁর সময়েও আমার জীবনে নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। আমিও যেমন প্রায় তাঁর কাছে যেতাম, উনিও আসতেন আমার ছোট্ট বাড়িতে ঘন ঘন। ষাটের দশকের গোড়ায় যখন শিল্পীগ্রাম গড়ার স্বপ্ন দেখছি তখন সাহস জুগিয়েছে আমার ইউরোপের অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে জার্মানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।নাগেলের সময় একটা ঘটনা খুব মনে আসে। আমি তখন ম্যাক্সমুলার ভবনের অজুরার অপেক্ষায় থাকি না। কিছুটা প্রতিষ্ঠিত নাগরিক হিসেবে পরিচিত। দুই বিখ্যাত জার্মান কম্পোজার এসেছিলেন কলকাতায়। নাগেল ছিলেন মিউজিকে পাগল। একই দিনে কলকাতায় তিনটে-চারটে অনুষ্ঠান। সবই সঙ্গীতের মূর্ছনা। কলকাতায় তাঁর সময় জগদ্‌বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ জীবিত কম্পোজাররা সঙ্গীত শুনিয়ে যেতেন। সেই দুই কম্পোজারের সম্মানে নাগেল তাঁর ফ্ল্যাটে আমাদের ডিনারে আমন্ত্রণ করেছেন। সময়মতো আমি শিপ্রাকে নিয়ে পৌঁছে যাই। তখন আবাসে কেউ ছিলেন না। আমি সবে আসন গ্রহণ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে আর এক অতিথির আগমনের বার্তা এল। বেয়ারা ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। একটি দীর্ঘ চেহারার মানুষ এগিয়ে এলেন। ছোট চিরুনিতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে। সাধারণ সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত। সেই অতিথি সত্যজিৎ রায়। আমন্ত্রণকর্তার অনুপস্থিতিতে আমরা আর কী করতে পারি? দুর্লভ আলাপচারিতায় নিজেরাই মেতে উঠলাম। গৃহকর্তাহীন সে গৃহ। নানান অন্তরঙ্গ গল্প চলতে থাকল। কখন একঘণ্টা কেটে গিয়েছে।

আমার কাছে সে এক পরম পাওয়া, পরম অভিজ্ঞতা। ভরাট পুরুষালি কণ্ঠে নানান আলাপচারিতা। তাঁর সবই মার্জিত, অন্যরকম। অথচ ঘরোয়া। হঠাৎ জানতে পারলাম ডঃ নাগেল সঙ্গী অতিথিদের নিয়ে বিকল স্টিমারে নদীপথে আটকে গিয়েছেন। তাই এই কাণ্ড। যোগাযোগ করে তিনি মার্জনা চেয়েছেন। অপেক্ষা করতে বলছেন। তিনি নিরুপায়। নটার পর তাঁরা ফিরলেন। খাদ্যরস নয়, অন্যরসে আমরা মোহিত হয়ে আছি। ওঁরা এলেন, সৌজন্য বিনিময়ের পর সামনাসামনি আসন গ্রহণ করলেন তাঁরা। সত্যজিৎ রায় মধ্যমণি হয়েই ওঁর নিজস্ব ভঙ্গিমা, ওঁর ভালোলাগা আর অভিজ্ঞতায় ইউরোপিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে গেলেন। স্বাভাবিকভাবে বিটোফেন, মোৎসার্ট এসব তো ছিলই। হঠাৎ আমাদের চমক ভাঙল। দেখলাম যাঁদের সম্মানে এই ডিনারের আয়োজন তাঁরা নিশ্চুপ। এবং সত্যজিতের আলাপচারিতায় তাঁরা সরিয়ে রেখেছেন নিজেদের। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি গুমোট আবহাওয়া তৈরি হল। আমাদের কিছুই করার ছিল না। গৃহকর্তা এই আবহাওয়াকে বুঝে নিয়ে খাবার টেবিলে ডেকে নিলেন, খাওয়াদাওয়া চলল। কিন্তু বাক্য বিনিময় হল না। আমাদের সঙ্গে কিছু হুঁ-হাঁ

একটা সময় কলকাতায় ভয়ংকর লোডশেডিং। আমাদের সন্ধ্যার ক্লাস, কৃত্রিম আলো ছাড়া রং-রেখা চর্চার কোনও উপায় ছিল না। তাই আলো চলে গেলে চল্লিশ-পঞ্চাশজন ছেলেমেয়ে কখনও রাস্তায়, কখনও গাড়িবারান্দার নীচে।

মাত্র। খাওয়া শেষ হলে সত্যজিৎ রায় উঠে পড়লেন। গৃহকর্তার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করলেন। দুই বিদেশি অতিথি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সঙ্গীতকারদের আড়ষ্ট বিদায়মুদ্রা দেখিয়ে চলে গেলেন। আমরা কিছুই বুঝলাম না। ডঃ নাগেল এরকম পরিবেশ হবে ভাবেননি, হয়তো কোনওভাবে তাঁরা সত্যজিৎ রায়কে ঠিক নিতে পারেননি। কিংবা কোনওভাবে আকর্ষণের আয়োজনেই বিকর্ষণ ঘটেছিল। কিংবা ব্যক্তিত্বের কোনও এক সংঘাত, আজও বুঝিনি! এরকম কত ঘটনা যে আমার চোখে দেখা যা বিস্ময়ের, তার কত আর উল্লেখ করতে পারি। একদিকে আমার ছাত্রছাত্রী, তাদের নিয়ে মেতে থাকি। ক্রমশ আমার এই ছোট্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুনাম অর্জন করতে লাগল। বহু মানুষকে আমন্ত্রণ জানাই। আদানপ্রদান হয়। তাঁদের ভাবনার সঙ্গে আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও ঋদ্ধ হয়। আমরাও। একটা সময় কলকাতায় ভয়ংকর লোডশেডিং। আমাদের সন্ধ্যার ক্লাস, কৃত্রিম আলো ছাড়া রং-রেখা চর্চার কোনও উপায় ছিল না। তাই আলো চলে গেলে চল্লিশ-পঞ্চাশজন ছেলেমেয়ে কখনও রাস্তায়, কখনও গাড়িবারান্দার নীচে। অনেক কষ্ট হলেও নিশ্চয় তাদের কিছু আকর্ষণ ছিল, তাই তারা দূর থেকে এসে জড়ো হত। মনে আছে, কখনও কখনও কাউকে কাউকে পেয়ে যেতাম।

কলেজ স্ট্রিটের পাড়া। ফলে একদিন সেই ক্লাসে ঢুকে পড়লেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে অন্ধকারের আলোয় গোল করে ঘিরে আছে ছাত্রছাত্রীরা।

ক্রমশ

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাজ্যপাট

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

আউট্রাম ঘাটের গঙ্গা, বিশেষ করে এই ভরা দুপুরে সত্যিই আর পাঁচ নদীধারের চেয়ে আলাদা। সেই পৃথকত্বের প্রথম কথা হল, এখানে বসে মনে হচ্ছে খানিক আগে হাইকোর্টের নামজাদা জজসাহেব তাঁর গুরুতর কণ্ঠ বরাবর সরকারি উকিলকে ইংরেজিতে জানিয়ে দিয়েছেন, এস ডি ও সাহেব অর্থাৎ মহকুমা হাকিম এই বিমলের ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে ছাড় হলেও আদালত অবমাননার মামলা এখনই মিটে গেল না। শুনানি চলবে।

বিমল ভালো করেই জানে তার মতো নির্বিবাদী প্রায় মাঝবয়সি লোকের আলিপুর সদর মহকুমার দায়িত্ব সামলানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তার ওপর সামনেই ২০০৫ বিধানসভার নির্বাচন। সেই গুরুতর কাজে এখন গোটা পশ্চিমবঙ্গের মতোই এই মহকুমাও কোমর বেঁধে লেগেছে। দিনরাত প্রায় একাকার। বাংলোর বদলে বেশিরভাগ সময়েই অফিসে থাকতে হয়। যা বাদে বাইরে বিবিধ কাজ ও ঝামেলায় যাওয়া তো আছেই।

মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের অফিসার তখন স্পেশ্যাল ডিউটি ভাস্কর দা'র অনুরোধেই বারাকপুর থেকে এখানে এসে জয়েন করতে হল। তার পিছনে মেয়ে মুনির যাদবপুরে পড়ার স্বার্থও কাজ করেছে। সব মিলিয়ে এ এক গোলমেলে দমবন্ধ পরিস্থিতি। বারাকপুরে তৎকালীন এস ডি ও বদলি হয়ে চলে গেলে সিনিয়র হিসেবে বিমলকেই চার্জ নিতে হয়। ভেবেছিল নতুন লোক এলে বিমল আবার আগের মতো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে যাবে। কিন্তু সে আর হল কই। তবু ভালো, মেয়েটাকে রোজ দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে বারাকপুর থেকে যাদবপুর আসতে হয় না। আলিপুর থেকে দিব্যি বাসে করে ক্লাসে যেতে পারে। আর মাঝেমধ্যে বিমলের ওদিকে কাজ থাকলে কিংবা অফিস যাওয়ার পথে মেয়েকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ড্রাইভার যোগেশ সাহায্য করে।

প্রথম প্রথম সরকারি গাড়িতে মেয়ের ওঠা নিয়ে মনে মনে মহাদ্বন্দ্ব হত। তাই সোজা সাপটা ব্যাপারটা ভাস্করদাকে বলেছে। অভিজ্ঞ মানুষটি সামান্য হেসে বলেছেন, একজন এস ডি ও-র ঘরসংসার বলে কিছু নেই। ফলে তাকে এটুকু দুর্নীতি করতেই হয়। সেইসঙ্গে আরও একটি কুনীতি আছে। তবে তা নিজের পয়সায়। সবাই জানে তার মদ্যপানপ্রিয়তার কথা। সারাদিন পর কোয়ার্টারে ফিরে শস্তা-দামি রাম। সেইসঙ্গে বাবার কেনা ফিলিপ্সের স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ারে গান শোনা। তারপর মাঝে মাঝে বাংলোর সামনের প্রকাণ্ড মাঠে একা একা চরতে বেরনো। শুতে শুতে মাঝরাত পার। সীমা ঘুমিয়ে পড়ে। পাশের ঘরে মেয়ে মুনি। তার পরের ঘরে বৃদ্ধা মা, ঘুমের ওষুধ খেয়ে সকাল সকাল।

এই আউট্রাম ঘাটে দুপুরের নিঝুম গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেবলই মন চলে যায় পৈত্রিক বাড়ি হালিশহরে। বাবা এই ২০০৪-এ চলে যাওয়ার পর ও-বাড়িতে বাবার পুরনো সহচর ওড়িশার মানুষ পূর্ণ ঠাকুর আর তস্য পাগল ছেলে রাজু বাস করে। বাপ-বেটা অনুষ্ঠান বাড়ি রান্নার কাজ করে। বাদবাকি সময় এলাকার মানুষের বাগানে কাজ করে। মাঝেমধ্যে কটকের কোনও গ্রাম থেকে পূর্ণ ঠাকুরের বউ, অবিবাহিতা বোন বা অবিবাহিতা মেয়ে এসে থাকে। ও-বাড়ির গোটা একতলাটাই ওদের বাসক্ষেত্র। দোতলাটা উইয়ের দখলে। বড় বড় সাবেক জানলা-দরজা উইমাটিতে মচমচ করছে। সেইসঙ্গে প্রাচীন সব ফার্নিচারগুলো পুরু ধুলোয় ঢাকা। গঙ্গার ধারে ছোট বোন দীপার শ্বশুরবাড়ি। ওদের এ-বাড়ি দেখার সময় নেই। শুধু বাগানের ফলমূল, পুকুরের ভাগ নিয়েই ওরা সজাগ। ভগ্নীপতিটি বাস্তু ঘুঘু। বাড়ি বসে অর্ডার সাপ্লাই কারবারের কারণে তার অখণ্ড সময়।

এখানে বসে থাকতে থাকতে বিমলের মনে হয় যোগেশ একটু তফাতে গাড়ি রাখলেও সিকিউরিটি গার্ড বুদ্ধদেব কিন্তু কাছাকাছিই আছে। সে যথারীতি স্বভাবমতো অকারণ টেনশনে পড়ে ঘন ঘন মাথার টুপি সিধে করছে। প্রকাণ্ড ভুঁড়ির বেল্ট টেনে নামাচ্ছে ও ওঠাচ্ছে। আর অভ্যাস অনুযায়ী সবসময় কিছু না কিছু চিবিয়ে চলেছে। বিমল পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারে বুদ্ধদেব তাকে চোখের আড়াল করেনি। এটাই বুঝি রক্ষীদের নিয়ম।

প্রায় মাঝনদীতে একজোড়া মাছ-ধরিয়ে নৌকো ভাসছে। একটু ডানদিক ঘেঁসে পারাপারি ছোট লঞ্চ যাচ্ছে। ওপার এবং এপারে এই অবেলায় যাত্রীদের ভিড় তেমন নেই। সর্বত্রই একধরনের আলস্য বিছিয়ে রয়েছে। বিমল মনে মনে চমকে ওঠে। সে নিজেই অবাক হয়ে যায়— কী করে রাজ্যের ব্যস্ততা আর কাজ সরিয়ে রেখে সে এভাবে গঙ্গার ধারে বসে আছে। হাইকোর্টে আসার সূত্রে সেল ফোন বন্ধ করে রাখা। অফিসে, ল্যান্ড ফোনে কত না ডাক এসে ফিরে গিয়েছে। ওদিকে টেবিলে ফাইল জমছে। ভিজিটরস রুমে লোকের পর লোক জমছে। অফিসের লোকজন ভাবছে— এস ডি ও সাহেব গেলেন কোথায়!

বিমল এবার উঠে পড়ল। অমনি বুদ্ধদেব সজাগ হল। অভ্যাসে কোমরের খাপে রাখা রিভলবারের বাঁটে হাত রাখল। যোগেশ ঘুম ঘুম চোখে গাড়ি স্টার্ট দিল। বুদ্ধদেব দরজা খুলে দিল কী যেন চিবোতে চিবোতে এবং এখন মুখ বন্ধ করে। বিমল শুধু বলে, আগে একবার বাড়ি যাব যোগেশ।

যোগেশ মাথা হেলায়, তাহলে আমিও বাড়িতে একটু টিপিন করে নেব স্যার।

বুদ্ধদেব একগাল হেসে বলে, আমার তো টিপিন সর্বক্ষণই চলছে সার।

এমন অসময়ে বিমলকে দেখে অবাক সীমা। ভাত খাওয়া সেরে সে সবে পান মুখে দিয়েছে। এবার ঘুমের ব্যবস্থা। দুপুরে মোটামুটি ঘণ্টা দুই ঘুম তার বরাদ্দ। এসময়ে চারপাশের ব্যস্ততা সরিয়ে ওটুকুই বুঝি তার একলার।

জুতো খুলতে খুলতে বিমল বলে, মিনিট পনেরোর জন্য এলাম।

সীমা ফ্রিজের কাছে যেতে যেতে বলে,

পায়েস আছে। দেব একটু?

— না না। আমার তো টিফিনবক্স সঙ্গে আছে। তাছাড়া পায়েসে অসম্ভব ফ্যাট।

সীমা হাসে মুখ টিপে, রোজ রাতে যা খাও তাতে বুঝি ফ্যাট নেই!

বিমল টিফিনবক্স খুলে রুটি-তরকারি মুখে তোলে। পিস করে রাখা শশা কামড়ায়। সীমা গ্লাসে জল দেয়।

— চা করি?

বিমল মাথা নাড়ল। তারপর বলল, একটা বালিশ রেখো। একটু গড়িয়ে নেব।

সীমা উঠে যায়। জানলার ওপারে পাখি ডাকে বাগানে। খোলা মাঠে গোরু চরে। জেলখানার লাল পাঁচিলে একঝাঁক ছাতারে পাখি ডানায় ছররা ছেটায়। মাঠ পেরিয়ে দূর থেকে হাজরা মোড়ের ব্যস্ততা, গর্জন ধাওয়া দেয়। একজোড়া হলুদ প্রজাপতি জানলা বরাবর পাক খেতে থাকে। একটা ভাড়া-খাটা অ্যাম্বাসাডর বিকট শব্দে মাঠ পার হয়। মাঠপাড়ে টালির চাল ঘরে গাঁক গাঁক টিভি চলে। আকাশে কাটা কাটা মেঘ ভেসে যায়।

মুখ ধুয়ে শোবার ঘরে আসার পথে, সরু করিডোর পার হতে হতে চোখে পড়ে মা কাত হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পাশে খুলে রাখা ট্রানজিস্টরে কিশোরকুমার মৃদুস্বরে গাইছেন, যাঁহা গম ভি না হো... আঁশু ভি না হো...

সীমা আড় হয়ে বালিশে মাথা রাখে। মুনি কলেজে গিয়েছে। বাড়িজুড়ে এখন কিশোরকুমারের ওই গান ছাড়া আর কিছু নেই। পিছনের আউট হাউসে এন ভি এফ-দের ঘরের সামনে দুপুরের জটলা। পেঁয়াজ ফোড়নের ঝাঁঝ। কাঠ চেলা করার আওয়াজ।

বালিশে মাথা রেখে বিমল বলে, জেগে আছো?

সীমা ঘুমোবার সময় কথা বলতে চায় না জেনেও বিমলের প্রশ্ন। এবার সীমার নাকটা বিমল দু-আঙুলে টিপে ধরে। এই ব্যাপারটা সীমার খুবই অপছন্দের। তাই সে ঠেলে হাত সরিয়ে দেয়।

বিমল হাসে, স্বভাব যায় না—

সীমা হেসে বলে, পরের কথাটাও বলে দাও।

— নাঃ, ওটা বাজে কথা।

— তুমি কি সবসময় ভালো ভালো কথা বলো না ভাবো?

এ ভারি কঠিন প্রশ্ন। কথার মধ্যে এমন হঠাৎ জটিল বিষয় এনে ফেলা সীমার স্বভাব।

বিমল হাসিমুখেই বলে, হুঁ, বলি, তবে ভাবি না। সে কি তুমিও করো না?

সীমা এবার খানিক চুপ করে। তারপর বলে ওঠে, কী জানি?

মাঠপাড়ে পাম্পিং মেশিনের পরিচিত শব্দটা গর্জে ওঠে। সেইসঙ্গে একটি গাড়ির শব্দ গড়িয়ে যায়। পাশে— সরলরেখার দিকে অসময়ে স্নান করতে আসা ছেলের পাল হাহা-হোহো ছোড়ে। একটি ছাগলছানা আর্ত ডেকে যায়। বিমল দেখে সীমা ওপাশ ফিরে শুয়েছে।

সেলফোন বেজে ওঠে। ডি এম।

— গুড আফটারনুন ম্যাম।

— হ্যাঁ। তবে ভেরি ব্যাড আফটারনুন। আপনি কোথায়?

— এখুনি হাইকোর্ট থেকে ফিরলাম ম্যাম।

— বেশ, এবারে আরও বড় ব্যাপারের জন্য তৈরি হোন। বিষ্ণুপুর এক নম্বর ব্লকে এখুনি যেতে হবে।

এরপর জেলাশাসক যা বলেন তা হল ওখানে একটি অকাল কালীপুজোর প্যান্ডেল নিয়ে গণ্ডগোল। পাশেই মসজিদ। সকালের আজান দেওয়ার পর থেকেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। সোজা কথায় কমিউন্যাল রায়টের মুখপাত। এখনই না থামাতে পারলে সমূহ বিপদ।

বিমল দ্রুত উঠে পড়তে ফোনে যোগেশকে গাড়ি লাগাতে বলে। ডি এম বলে দিয়েছেন ওখানে পুলিশ চলে গিয়েছে। অ্যাডিশনাল এস পি আছেন। আছেন কর্তাব্যক্তি পুলিশ অফিসারগণ।

সীমাও উঠে পড়েছে ফোনের সাড়ায়।

সে বলে, কী হল?

বিমল সংক্ষেপে বলে, গণ্ডগোল।

সীমা অবাক মুখে তাকায়, কী গণ্ডগোল বলো তো!

— হিন্দু-মুসলমান।

— সে তো এদেশে হয় না। ও-সব তো বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের ব্যাপার।

বিমল জুতোয় পা গুঁজে দ্রুত বেরিয়ে যায়। ঘুমন্ত মা'র ঘরে রেডিওয় গান বাজে, এ ভাই, জরা দেখকে চলো, ডাঁয়ে ভি নহি বাঁয়ে ভি...

গাড়ি ছোটে অতি দ্রুত। যোগেশকে বলে দেওয়ায় সে ঘন ঘন গিয়ার পাল্টায়। সিকিউরিটি বুদ্ধদেব সামনের সিটে বসে কেবলই টুপি ঠিক করে। রিভলবারে হাত দেয়। আলিপুর ছেড়ে, কালীঘাটের ব্রিজ পেরিয়ে গাড়ি ছোটে। যেতে যেতে বিমল ফোনে সি এ বা কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টকে সব জানিয়ে দেয়। বলে দেয় সে না ফেরা পর্যন্ত সেকেন্ড অফিসার আর সি এ যেন অফিসে থাকেন।

যেতে যেতে বিমলের মাথায় পাক খায় সদ্য পড়া একখানা বইয়ের কথা। 'Some Recent Speeches and Writings of Mr. Jinnah'– বইখানা ১৯৪২ সালে লাহোর থেকে বেরোয়। জিন্না এক জায়গায় বলছেন, '... religion should not be allowed to come into politics, that race should not be allowed to come into politics... Religion is merely a matter between man and God... Is this a question of language purely? ... this is a question of minorities and it is a political issue.'

এইসব কথা বা ভাবনা কি নেহাতই কথার কথা ছিল? তাহলে এত বড় দাঙ্গা কেন হল? কেনই বা দেশভাগ?

এসব কথা ভাববার সময় কেন যে মনে পড়ল এই কথাগুলো তার ব্যাখ্যা মাথায় নেই। বই পড়া বাতিকের মতো এই সমস্ত ভাবনাও বুঝি একরকমের বাতিক। তাহলেও জিন্নার কথায় ধর্ম যদি মানুষ আর ঈশ্বরের মাঝখানের বিষয় হয়, তাহলে তা নিয়ে এত কামড়াকামড়ি কেন? সংসারে চিরকালই এই মাঝখানের বিষয় বা মিডলম্যান ভারি গণ্ডগোল তৈরি করে। অথচ সঙ্গীত, সে তো কোনও ভেদ জানে না। ভালো গান শুনতে হলে খাঁ সাহেবদের স্মরণ নিতে হয়। বড়ে গুলাম আলি গেয়ে ওঠেন, হরি ওম্ তৎসৎ। এখানে কোথায় জাতিপাতি আর কোথায়ই বা ধর্ম। এত কিছুর পরেও এখনও হিন্দু-মুসলমান।

এখানে এসে বিমলের মনে হয়— এই চাকরিটা সবসময় বিরক্তিকর হলেও এইসব টাটকা সমস্যা দেখতে পাওয়া বা তার ভিতর যাওয়া— এ ভারি কম নয়। আর পাঁচটি রংদার চাকরির চেয়ে এই সিভিল সার্ভিস যে কতখানি আলাদা রকমের বাস্তব, তার কোনও জুড়ি হয় না।

গাড়ি যেখানে এসে দাঁড়ায় তার সামনেই এখনকার বাস্তব। বুদ্ধদেব তড়িঘড়ি গেট খুলে ধরে। বিমল লাফ দিয়ে নামে। পুলিশ নিয়মমতো স্যালুট দেয়।

রাস্তার ডাইনে— সামান্য ভিতরে অকুস্থল। মসজিদের গম্বুজ দেখা যাচ্ছে। কালীপুজোর প্যান্ডেলের আভাসও। তার উর্ধ্বে বৃষ্টিহীন ঝকঝকে আকাশ। পাখি উড়ছে। ওইখানে ওই পাখিদের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ, সম্প্রদায়ের আন্দাজ নেই। অথচ তারই নীচে কালীপুজো আর

সঙ্গীত, সে তো কোনও ভেদ জানে না। ভালো গান শুনতে হলে খাঁ সাহেবদের স্মরণ নিতে হয়। বড়ে গুলাম আলি গেয়ে ওঠেন, হরি ওম্ তৎসৎ। এখানে কোথায় জাতিপাতি আর কোথায়ই বা ধর্ম।

মসজিদের আজান। কী আশ্চর্য বয়ে চলেছে এই পৃথিবীর সংসার।

অ্যাডিশনাল এস পি ভদ্রলোক অবাঙালি আই পি এস। আধো বাংলায় ব্যাপারটা ব্রিফ করেন বিমলকে। থানার ও সি-ও কিছু বলেন। বিমল একটু পাশে সরে যায়। দূরে দাঁড়ানো বি ডি ও গোলক হাওলাদারকে হাত নেড়ে ডেকে নেয়। উত্তর বাংলার এই ছেলেটি শুধু ভালো অফিসারই নয়, মাথা ঠান্ডা, বিচক্ষণ। এই ব্লকেই তার প্রথম পোস্টিং।

বিমল সামনে ঝুঁকে নিচু গলায় বলে, আচ্ছা গোলক, তোমার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে দেখছি না যে। মানে কাজী ইমরান!

গোলক বলে, দেখবেন না স্যার। উনিই তো নাটের গুরু।

— তার মানে এখানেও পলিটিক্স চলছে। কমিউনিস্ট পার্টি করেও ধর্মের সুড়সুড়িতে একই কারবারি।

গোলক গম্ভীর স্বরে বলে, আবার মুসলিমদের উসকানি দিচ্ছে যারা, তাদের মধ্যে কিছু হিন্দু নেতাও আছে। তবে একবারে পিছনে। সামনে সব মুখে তালাচাবি।

— এটাই তো আমাদের রাজনীতি। সস্তা ব্যাপার।

গোলক এবার বলে, স্যার, আমার মনে হয় যা বলার পুলিশই বলুক। আপনার এখানে কিছু না বলাই ভালো।

বিমল মৃদু হাসে, দূর, তা হয় নাকি। প্রশাসক কি চুপ করে থাকতে পারে?

গোলক আর কথা বাড়ায় না। বিমল তাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে চলা পথে নামে অকুস্থল দেখতে। সঙ্গে দুজন কনস্টেবল আর একজন থানা অফিসার চলেন।

প্যান্ডেলের পাশে মসজিদের সামনে একটি জমায়েত। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বিমল লক্ষ করে মানুষগুলির চোখেমুখে কী বিচিত্র অবিশ্বাস আর বিষণ্ণতা আঁকা। অকাল কালীপুজোর ম্যারাপের সামনে কয়েকজন যুবক। তারাও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিমলকে দেখে তারা আরও সতর্ক হয়ে যায়। কানে কানে নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করে।

বিমল মসজিদের সামনে দাঁড়ানো একজনকে ডাকে। বয়স্ক মানুষ। মাথায় ফেজ টুপি, পাঞ্জাবি-পাজামা। কাঁচা-পাকা বাহারি দাড়ি। চোখে সুরমা। তিনি এগিয়ে এসে বিমলকে নমস্কার জানান। এবং বিমল প্রশ্ন করার আগেই তিনি বলে ওঠেন, জি, আমার নাম কাজী বন্দে আলি। আমি এই মসজিদের ইমাম।

বিমল দেখে ইমাম সাহেব কথা বলার ফাঁকে আরও জনাকয় এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

আলি সাহেব মৃদু হাসেন, কী বলব আর! আপনি তো আমাদের কর্তা হুজুর। এখন আপনিই বলুন। আমাদের পুরনো মসজিদ। সেটা তো হুট বলতে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।

বিমল বলে, ব্যাপারটা আমি মোটামুটি শুনে নিয়েছি ইমাম সাহেব। এখন সমস্যাটা কী শুনি।

আলি সাহেব মৃদু হাসেন, কী বলব আর! আপনি তো আমাদের কর্তা হুজুর। এখন আপনিই বলুন। আমাদের পুরনো মসজিদ। সেটা তো হুট বলতে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারি না।

— মন্দির-মসজিদ কখনও উঠিয়ে নেওয়া যায়!

— তাহলে আপনিই বলুন স্যার।

অপরদিক থেকে চার-পাঁচজন এগিয়ে এল। একজন বলে ওঠে, স্যার, আমি একটু বলি?

— কী নাম আপনার?

— রাখাল সরকার স্যার। গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বার।

— বেশ।

— স্যার এ চত্বরে হিন্দু-মুসলমানে কোনওকালে বিবাদ হয়নি। তাহলে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এটা কেন হচ্ছে ভাবতে হবে। এর পিছনে কে বা কারা আছে সেটা বিচার করতে হবে।

তখনই ওদিক থেকে ইমাম সাহেব বলে ওঠেন, পিছনে আছে পলিটিক্স হুজুর, পলিটিক্স। দেশটা এই করেই গেল।

ইমামের পাশ থেকে একজন অল্পবয়সি ছোকরা মুখ বাড়ায়, আমাদের আজানের সময়, নমাজের সময় যদি জোরে জোরে ঢাক বাজায়, মাইক ছাড়ে, তাহলে কি হয়?

রাখাল গলা তোলে, আমাদের প্যান্ডেলের পাশে গর্ত করে গোরুর হাড়গোড় পুঁতে রাখা কি ভালো কথা!

বিমল এবার তাকায় বি ডি ও গোলকের দিকে। তারপর বলে, কিছু মনে করবেন না আপনারা। দু-তরফই ভালো কাজ করছেন না, এই ব্যাপারটা সকলকে বুঝতে হবে তো।

দু-পক্ষই নিঃশব্দ। অদূরের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায়। দূরে কোথায় মাইক বাজে। আকাশে পাখির ঝাঁক পাক দেয়। রাস্তার দিক থেকে মাঝে মাঝে মানুষের স্বর শোনা যায়।

রাখাল বলে, তাই বলে কালীর বেদির পিছনে গোরুর হাড়।

ইমাম মুচকি হাসেন, তাই বলে মসজিদে তো ভোজ হয় না, প্রার্থনা হয়।

বিমল সবার দিকে একবার করে চোখ বোলায়, তাহলে এই সামান্য ব্যাপারটা নিয়ে আমরা তর্ক করে যাব— এই তো?

একজন যুবক গলা তুলে বলে, স্যার, এদের কথা শুনতে গেলে রাতভোর হয়ে যাবে। এখানে সবাই সমান।

বিমল ঘাড় ঘোরায় ছেলেটির দিকে, তোমার নাম কী?

— আমার নাম স্যার চাঁদ মহম্মদ। আমি ফুটবল খেলি।

— বাঃ, কোন পজিশনে?

— গোলকিপার।

— তার মানে বল গলতে না দেওয়াই তোমার কাজ।

— ঠিক স্যার। কী হবে এসব ফালতু কাজে! গোরুর হাড়। তারপর কালীর বেদি। ফুঃ। স্যার ছেলেগুলোকে বলুন বুড়োদের মতো এমন ঝগড়া না করতে। রোজ মাঠে এসে প্র্যাক্টিস করতে বলে দিন।

ছেলেটির এই আকস্মিক কথা মুহূর্তে পরিবেশটিকে গুরুতর করে দেয়। খুবই পলকা কথা। কিন্তু তার মাত্রা বহুতর বক্ররেখা টের পাইয়ে দেয়।

পাশ দিয়ে এক ছেলে হেঁটে যায়। তার পকেটে রাখা এফ এম রেডিও বাজছে। রেডিওর গান বলছে কী আশ্চর্য কাকতালীয় আর এক ঘুরপথের কথা।

শুনি টাকডুম টাকডুম বাজে
বাজে ভাঙা ঢোল
ও মন যা ভুলে যা কী হারালি
ভোল রে ব্যথা ভোল...

ছেলেটি নিজের মতো চলে যায়। তার গায়ে লেখা নেই— সে হিন্দু না মুসলমান। সম্ভবত এই গ্রামের ছেলে হলেও তার এই যাবতীয় কচালে মন নেই।

ইমাম গম্ভীর গলায় বলেন, তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াল স্যার?

ওদিক থেকে রাখালও কথা কয়, সেটা আমরাও জানতে চাই।

ক্রমশ

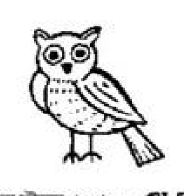

কালান্তর

সম্পাদকীয়

বাংলা সাহিত্যের সত্যযুগে, যে বালক কোনক্রমে শেষ পদগুলির মিল যোজনা করতে পারত, সেই কবি নামে খ্যাত হ'ত। এর ওপর, সেই বালক যদি তার পদ্য চোদ্দ লাইনের সীমার মধ্যে খর্ব করতে পারত, তাহলে তার যশ রোধ করবার সাধ্য ছিল কার? কবির প্রশ্রয় বিলাসী অভিভাবকদের উৎপীড়নে সেই ছন্দ-মিল-যুক্ত অক্ষমতা অভ্যাগতরা কতবার গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হতেন সঠিক জানা না থাকলেও, অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

বাংলা-সাহিত্যের সেই নিষ্পাপ যুগে গল্প-উপন্যাস বলতে বোঝাত প্রথম দর্শনে প্রেম। (যে লেখক প্রেমের সঞ্চারকে কয়েকবার দৃষ্টি-বিনিময় পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারতেন, তিনি তো রীতিমত প্রগতিশীল)। প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আরেকটি তৃতীয় পক্ষের অবতারণা সচরাচর করা হ'ত। তিনি একেবারে পূর্ণ কীচক-রূপী ভীলেন। উপসংহারে মিলনের পটভূমিকায় রীতিমত কীচক-বধ। নূতনত্বের মধ্যে কেউ বা ভীলেনটিকে শেষ পর্যন্ত অনুতাপবিদ্ধ, সাশ্রুনয়ন, সর্ব-পাপ-মুক্ত পরম বৈষ্ণবে রূপান্তরিত ক'রে ক্ষান্ত হতেন।

তারপর, সময় এগিয়ে গেছে, বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বিস্তৃততর হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কয়েকজন দিক্‌পাল নূতন দিক নির্দেশ করেছেন।

কবিতা ভাবালুতার গোষ্পদ অতিক্রম ক'রে ভাবুকতার সমুদ্রে মুক্তি পেয়েছে। চাঁদ-চকোরের, পুষ্প-পারিজাতের সঙ্কীর্ণ সীমানা ক্রমশ বন্ধ্যা প্রসারিত হয়েছে।

গল্প-উপন্যাসও বিবর্তনের চক্রপথে নূতন নূতন রূপ পেয়েছে। বিষয়, আঙ্গিক এবং বিন্যাসের সহস্র পরীক্ষার পর, আজকের স্বসম্পূর্ণ, নিটোল ডৌলটি ধরা পড়েছে।

যদি বলি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য এই বিবর্তনের চক্রান্ত এড়িয়ে গেছে, তাহলে বোধ করি কিঞ্চিৎ প্রতিবাদের সম্মুখীন হ'তে হবে। এই প্রতিবাদ যুক্তি-অভেদ্য নয়।

বাংলা প্রবন্ধে অবশ্যই পরিবর্তন দেখা গিয়েছে, কিন্তু সে পরিবর্তন পরিমাণে— প্রকৃতিতে নয়।

সেকালে নিয়ম করে প্রবন্ধ লিখতেন প্রধানত তাঁরাই যাঁদের সাহিত্যের অন্য ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার ছিল না। (ব্যতিক্রমদের কথা এখানে ধরা হচ্ছে না। আর তা ছাড়া ব্যতিক্রম-তো নিয়মটাকেই ঘোষণা করে।) সাধারণত স্কুল-কলেজের শিক্ষক-অধ্যাপক পদাধিকার-বলে প্রবন্ধকার হতেন। এবং যেহেতু প্রবন্ধ বস্তুটি বিষয় হিসেবে গুরু এবং তাঁদের পদও কিছুমাত্র লঘু নয়, সুতরাং তাঁরা যা লিখতেন তা সচরাচর গুরুপাক। বস্তুত, ফুটনোট, উল্লেখ উদ্ধৃতি-কণ্টকিত শব্দ-যোজনাটি পাচ্য ছিল কিনা বলা দুরূহ। পাণ্ডিত্যের অভ্রান্ত পরিচয় অবশ্যম্ভাবী ছিল এই জাতীয় রচনাতে। প্রাঞ্জল হবার দায় ছিল না লেখকের— এ তো তাঁর ক্লাশের ছাত্রের ঘোড়া সম্বন্ধে রচনা নয়। তাছাড়া, দায় থাকলেও সাধ্য ছিল না। সুতরাং পাঠক সভয়ে এ-জাতীয় রচনা পরিহার করেছে। প্রবন্ধকারের আত্মপ্রসাদ বৃদ্ধি পেলেও, বাজার দর বাড়েনি।

ইতিমধ্যে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে। প্রবন্ধেরও চাহিদা বেড়েছে। মাসিক পত্রিকাকে সর্বাঙ্গীন করতে হবে, পূজা সংখ্যা সমৃদ্ধ করা দরকার, সুতরাং প্রবন্ধ চাই। পাঠক পড়বে কি না সম্পাদকের কৌতূহল নেই, লেখকের উদ্যম নেই, যে কোনও প্রকারে পাতা ভরিয়ে দিলেই হ'ল। যদি দুর্বোধ্য হয়, তাহলে সেটা লেখকের অক্ষমতা নয়, বিষয়ের কাঠিন্য— এমন কথাও সদম্ভে বলতে শুনেছি কাউকে।

কাজেই, প্রবন্ধ সংখ্যায় বেড়েও, জাতে ওঠেনি। যাঁরা প্রবন্ধ রচনা করেছেন এতাবৎকাল, তাঁরা এইচ জি ওয়েলসের বিখ্যাত প্রাথমিক উপদেশে কর্ণপাত করেননি: পাঠকদের হাতে বই বন্ধ করে বসে থাকবার মহা অস্ত্র সর্বদাই মজুত। সতর্ক হও, এমন ভাবে বক্তব্য দাখিল কর, যাতে অনায়াসে পড়ে ফেলতে পারে, বই বন্ধ করতে মন না চায়।

পাঠকের অনুরাগ আকর্ষণ করবার দক্ষতা আছে এমন কয়েকজন কথাশিল্পী সাহিত্যিক এর পর 'প্রবন্ধের আসরে' অবতীর্ণ হয়েছেন। 'আসর' কথাটি ঠিক হয়েছে কিন্তু 'প্রবন্ধ' শব্দটি বোধ করি অপপ্রয়োগ হ'ল।

এঁরা যা রচনা করেছেন, সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে "ব্যক্তিগত প্রবন্ধ"।

আসরে যেমন কথকতা হয়, অনেকটা সেই ধরণের। কথা-সাহিত্যিক— সুতরাং ভাষার উপর দখল আছে, কলমের কায়দায় শব্দযোজনা চিত্তাকর্ষকও হয়। এ'রা সব সময়ে পাঠককে সামনে রেখেছেন। জেনেছেন, একে বেশী বললে, গুরুতর কিছু বললে, ভাবতে বললে বা ভাবালে তৎক্ষণাৎ বই বন্ধ করে দেবে। সুতরাং, পড়ানোই যখন আসল উদ্দেশ্য, তখন কথাটাই মনোগ্রাহী করে গাঁথা যাক, বিষয় তো বাহুল্য-মাত্র। বিষয়?— সে যেন প্রতিমা গড়বার আগের কাঠের কাঠামো। যত খড়, মাটি, রঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়, ততই ভালো, ততই শিল্পীর সাফল্য। যেটা প্লটের অভাবে গল্পের রূপ পেত না, সেই ক্ষণচিন্তাকে একটু বক্র ভঙ্গীতে দেখে, একটু ষ্টাইল দিয়ে সজ্জিত করে, শিরোনামায় 'প্রবন্ধ' নামাঙ্কিত করে দিয়ে কোনও রকমে বাজারে চালিয়ে দিলেই হ'ল। প্রবন্ধ হিসাবে যা অপাঙ্‌ক্তেয়, গল্প হিসাবে যা অচল, তাই "ব্যক্তিগত প্রবন্ধ'রূপে উপাদেয়। উপাদেয় সন্দেহ নেই; কিন্তু উপকারী নয়।

সাহিত্য উপকারী হ'তে হবে কি না এ নিয়ে তর্কের ঝড় তোলবার প্রয়োজন নেই। এটুকু বোধ হয় বিনা তর্কে স্বীকার করে নেওয়া যায় যে, উপাদেয় বস্তু যদি উপকারী হয় তাহলে সেই অধিকন্তু 'ন দোষায়' তো বটেই; উপরন্তু "বহু গুণায়"। মূল বক্তব্যে আরও প্রবেশ করবার পূর্বে এতক্ষণ বাকজালের নীট সিদ্ধান্তটি আর একবার বলে নিতে চাই। ফুট-নোট-টীকা-পাণ্ডিত্য ভারাক্রান্ত অপাচ্য প্রবন্ধ থেকে হঠাৎ পাল্লা ঝুঁকে মজলিশি লঘু বচন-বিন্যাসের দিকে পাল্লা ঝুঁকেছে এবং ব্যালান্স হারিয়ে ফেলেছে।

যে বিদেশী সাহিত্য থেকে এই 'মাই ডিয়ার' জাতীয় রচনা আহৃত হয়েছে, সেখানে এই শেষ নয়,—পরম তো নয়-ই। সেখানে গুরুতর বিষয়ে প্রচুর প্রবন্ধের সাক্ষাৎ মিলবে অনায়াসে। কঠিন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখলে প্রবন্ধ দুরূহ হওয়া অনিবার্য, আমাদের সাহিত্যিকদের এই দারুণ ভুল ভাঙবার জন্য বিদেশী দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি প্রবন্ধই যথেষ্ট।

চিন্তার একটু বক্রতা, কথার কারুকার্যে চমকপ্রদ করে পাঠকের মনে কিছু প্রসন্নতা আনা যায় বৈ কি! কিন্তু সেই সঙ্গে যদি কিছু সংবাদ, কিছু সন্ধান, কিছু তথ্য অমনই মনোগ্রাহী করে পরিবেশন করা যেত, তাহলে মনের এক দিকের ক্ষুধার নিবৃত্তি হ'ত।

সাধারণ পাঠকের প্রকৃতি কারও অজানা নেই। তাছাড়া গভীর বিষয়ের প্রতি গভীর অনাসক্তি শুধু বাঙালী পাঠকের একচেটে নয়। পাঠক যেহেতু আয়াসে অনুরাগী নয়, তাই লেখককে পরিশ্রম ক'রে সহজ হ'তে হবে, সুলভ এবং পরিচ্ছন্ন হ'তে হবে; সংক্ষিপ্ত হয়েও প্রাঞ্জল হতে হবে।

সাহিত্যের এই একটা বিভাগে লেখককে কল্পনার আশ্রয় ছেড়ে তথ্যকে ভিত্তি করতে হবে। শুধু নিজের চিন্তার নয়, আরও পাঁচজনের চিন্তার সঙ্গে সংযোগসাধন করতে পারলে, তবেই প্রবন্ধের সার্থকতা।

পাঠক লঘু-চিত্ত ব'লে, লেখকও যদি হালকা হয়ে যান, সেটা আর যাই হোক, সুবিবেচনার পরিচয় নয়। শুধু মনোরঞ্জন করাই কি চরম আদর্শ? ভাঁড়-ও তো মনোরঞ্জন করে?

জানি, লেখক পাঠকের মন রেখে চলতে চান। তাই বাংলা প্রবন্ধের বিষয় 'চাদের কলঙ্ক' না হয়ে "ক্লাইভ ষ্ট্রীটে চাঁদ", "ডোডোর বিলোপ" না হয়ে 'ভূতের বিলোপ'। কিন্তু পাঠকের মন রেখে চলেও নিজের মান রাখা যায়, তারই উদাহরণ হিসাবে একটু আগেই বিদেশী প্রবন্ধ সাহিত্যের উল্লেখ করেছি।

বাংলা দেশে ও-জাতীয় প্রবন্ধের অভাব রীতিমত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। সাহিত্য-রথীদের কাছে তাই আমাদের অভিযোগ নয়, আবেদন। যাঁদের লেখা সাধারণে পড়ে, যাঁরা সাধারণের পড়বার মতো ক'রে লিখতে পারেন, তাঁদের কাছেই তথ্যাশ্রয়ী, সহজ, মার্জিত প্রবন্ধের আশা করেছি আমরা।

কে না জানে, বাঙালী পাঠককে ভুলিয়ে পড়াতে হয়, না জানিয়ে শেখাতে হয়।

সংবাদ ও সাহিত্যের মধ্যে স্মরণীয় সেতুবন্ধে সাহিত্যিকেরই অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। হবার কথা-ও।

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' শ্রাবণ, ১৩৫৬ থেকে পুনর্মুদ্রিত।
বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

কবিতা-পরিচয়

ঘোড়া: জীবনানন্দ দাশ

আলোক সরকার

আমরা যাইনি ম'রে আজো— তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়:
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে:
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন— এখনও ঘাসের লোভের চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে;
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো— ঘুমে— ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্ রেস্তরাঁতে,
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

কবিতাটি নিঃসন্দেহে একটি থিমেটিক কবিতা। এর থিম বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা সহজেই করা যেতে পারে, কিন্তু অনেক পঙক্তির বাক্যবিন্যাস, অনেক চিত্রের তাৎপর্য, অনেক বিশেষণের যাথার্থ্য অথবা গোপন নির্দেশ বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। বিশেষ ক'রে লক্ষণীয়, বক্তব্য এখানে সরাসরি ঘোষণার মতো উচ্চারিত হয়নি— যা জীবনানন্দর পরবর্তীকালে অনেক কবিতায় হয়েছে— বক্তব্য এখানে কয়েকটি চিত্রের মধ্যবর্তিতাতেই প্রধানত নির্দেশিত। সেই চিত্রগুলি কতিপয় সংবেদনী ইঙ্গিতসঘন আবহাওয়া, তা এক অমোঘ সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায় কিন্তু নিজেরা উদাসীন নির্লিপ্ত থাকে। চিত্রকল্প বলতে যা বোঝায় এরা ঠিক তা নয়, এদের জন্য আলাদা বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কিন্তু তার আগে কবিতাটির বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আমার ধারণা উপস্থিত করা যাক:

'ঘোড়া' সময়-চেতনার কবিতা। এই সময় এক অখণ্ড প্রবহমানতা, দুর্বোধ্য এবং তাৎপর্যহীন। সেই প্রবহমানতায় অতীত-বর্তমান একাকার; জীবিত মানুষ তার বর্তমানের ক্লান্তিকর জাগরণের ভিতরেও অতীতকে উপস্থিত সত্যের মতোই বারবার অনুভব করে, অনুভব করে তার নিজের অর্থহীনতা, কেবল উদরান্নের তাগিদ আর অদ্ভুত যুক্তিহীন আবর্তিত পৃথিবী। 'ঘোড়া' অবশ্যই প্রতীকী ব্যবহার, তা সকল প্রাকৃতিক-নিয়ম-রুদ্ধ প্রাণীরই প্রতিনিধিত্ব করছে। আমাদের দৃশ্য বা vision-এর ভিতর যে মহীনের বাস্তব ঘোড়াগুলোর জন্ম হয়, তারা প্রস্তরযুগের সেই আদিম ঘোড়াগুলোর মতোই, তারা আমাদের সচেতন করে সেই অখণ্ড সময় বিষয়ে যা শাশ্বত, অতীত-বর্তমান যেখানে সমার্থক, যা উদ্দেশ্যহীন নিত্যবহমান এবং পরিবর্তন-বিমুখ। এবং উভয়তই, উদরান্নের তাগিদই বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা। এক অপরিসীম ক্লান্তি, যেখানে আছে শুধু জীবনযাপন আর জৈবিক প্রয়োজন, আছে আস্তাবলের ঘ্রাণ অর্থাৎ ঘোড়াদের উপস্থিতি, আর খড় কাটার শব্দ অর্থাৎ খাদ্য। এই খড় কাটার শব্দও বিষণ্ণ, তাৎপর্যহীনতায় ক্লান্তিকর, যেহেতু তা শুধু অর্থহীন বেঁচে থাকা এবং অর্থহীন জৈবিক সত্যকেই স্পষ্ট করে। ঘুমে বিবশ বেড়ালছানার মতো চায়ের পেয়ালাকটাকে ঘিরে ঘেয়ো কুকুরের, সামর্থ্যহীন কুকুরেরও অলস পরাক্রম— একদিকে খাদ্যের প্রয়োজন এবং সমস্ত পরিশ্রমের অর্থহীনতা। কিন্তু সকলের উপর সেই অখণ্ড সময়, শাশ্বত প্রবহমানতা, যেখানে অতীত-বর্তমান সব একাকার, তার প্রশান্তির ফুঁয়ে আস্তাবলের আলো নেবে, বর্তমানের সব পরিশ্রম অতীত, অনন্ত সময়ের ভিতর শান্ত হয়। প্রস্তরযুগের আদিম ঘোড়াগুলোর স্তব্ধতা অর্থাৎ প্রাচীনতম স্তব্ধতার জ্যোৎস্নার ইঙ্গিতে ঘোড়া, সকল প্রাণী অসীম সময়ের ভিতর, অতীতের ভিতর নিজেদের হারিয়ে ফেলে।

এই মোটামুটি সংক্ষিপ্তসারের পরেও কতকগুলি প্রাথমিক সংশয় থেকে যায়। প্রথম সংশয়, শুরুর লাইনের 'তবু' শব্দটিকে নিয়ে। 'আমরা যাইনি ম'রে আজো— তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়' এর সহজ মানে এই দাঁড়ায় যে মৃত অবস্থাতেই দৃশ্যগুলির জন্ম সম্ভব ছিল কিংবা জীবিত অবস্থায় দৃশ্যগুলির জন্ম বস্তুত অসম্ভব। আসলে 'তবু' শব্দটির ভিতর এই কবিতার অন্যতম চাবি লুকিয়ে রয়েছে। 'আমরা যাইনি ম'রে আজো' অর্থাৎ আমরা এখনো জীবিত আছি তবু বারবার দৃশ্যগুলির জন্ম হচ্ছে। কোন্ দৃশ্যের? যে-দৃশ্য বাস্তব মহীনের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তরযুগের ঘোড়াগুলোর সঙ্গে একাকার করে, বর্তমানকে বিলীন করে অতীতের মধ্যে, যে-দৃশ্যে অতীত এবং বর্তমান এক অখণ্ড প্রবহমানতার ভিতর অঙ্গাঙ্গি হয়। বর্তমানের ভিতর অতীতের এই প্রত্যাবর্তন স্বাভাবিক নয়, বর্তমান তার নিজের কোলাহলের ভিতরই নিমগ্ন থাকতে চায়, কিন্তু অতীতের এই প্রত্যাবর্তনের রীতিকে, শাশ্বত উপস্থিতিকে অমান্য করা অসম্ভব। 'আমরা যাইনি ম'রে আজো', আমরা এখনো বেঁচে আছি, বর্তমানের কোলাহলের ভিতর আছি তবু অতীত তার অনতিক্রমণীয় উপস্থিতি বিষয়ে আমাদের সচেতন করে। আমরা এটাও বুঝতে পারি, রক্তের স্বভাবে আমরা অতীতের সঙ্গে নিবিড় অন্বিত, বাস্তব মহীনের ঘোড়াগুলোর কার্তিকের ম্লান জ্যোৎস্নার প্রান্তরে জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর যেমন তাগিদ, ঠিক সেই রকমই ছিল প্রস্তরযুগের আদিম ঘোড়াগুলোর। সেই একই ভাবে বেঁচে থাকা এবং উদরান্নের প্রয়োজন মেটানো, যা ছিল আদিমকালের তা এখনো অব্যাহত।

খাদ্যের লোভে অতীত এবং বর্তমান, সকল কালের ঘোড়াগুলো চ'রে বেড়াচ্ছে 'পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে'। 'কিমাকার ডাইনামো' অর্থাৎ অদ্ভুত, তাৎপর্যহীন গতিশীলতা, যার কোনো লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য থাকলেও তা একান্তই অবোধ্য। ডাইনামো অর্থাৎ সেই যন্ত্র যা শক্তির উৎপাদক, পৃথিবীর গতিশীলতার ভিতর সেইরকম কোনো যন্ত্র কাজ করছে কিন্তু তা কিমাকার, অদ্ভুত, তা পৃথিবীকে আবর্তিত করে, কোন্ উদ্দেশ্যে করে তা বোঝা যায় না। দুর্বোধ্য, তাৎপর্যহীন গতিশীল পৃথিবী, সময় আর তারই উপরে ততোধিক দুর্বোধ্য অনাদি-অনন্তকাল ধ'রে সকল প্রাণীর খাদ্যান্বেষণ— দৃশ্যগুলি বারবার আমাদের কাছে এই অর্থহীন, দ্যুতিহীন, ক্লান্তিকর সংবাদ বহন ক'রে আনে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতায় যে-ধরনের সময়-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় জীবনানন্দর সময়-চেতনার সঙ্গে তার মৌল পার্থক্য আছে। 'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে/কাজ করে যাও গোপনে গোপনে' কিংবা সোনার তরী-র 'পুরস্কার' অথবা কল্পনা-র 'বসন্ত' যেখানে পৃথিবীকে প্রকৃতিকে বিগত লক্ষ যুগের সংগীতমাখা ব'লে অনুভূত হয়েছিল, অনুভূত হয়েছিল বর্তমানের মানুষের সঙ্গে অতীতের মানুষগুলির আবেগের অভিন্নতা, সেখানে এক সদর্থক দৃষ্টি ছিল, কিন্তু জীবনানন্দ অতীত এবং বর্তমানের এই অভিন্নতাকে এক ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি হিসেবেই দেখেছেন। এবং যদিও কবিতার শেষাংশে তিনি সময়ের এই অখণ্ড প্রবহমানতাকে এক নিবিড় প্রশান্ত স্তব্ধতা ব'লে অনুভব করেছেন, উৎসর্গীকৃত রিক্ত ধ্যানময়তা হিসেবে জেনেছেন কিন্তু সেখানে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কোনো বস্তুময় পরিতৃপ্তি নেই, স্বপ্ন নেই, সম্ভাবনা নেই, কেবল অরব বিলীনতা আছে।

কবিতাটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম চার পঙক্তি অর্থাৎ 'পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে' পর্যন্ত একটি স্তবক, পরের অংশ দ্বিতীয় স্তবক। দ্বিতীয় স্তবক কোনো দৃশ্য বা vision নয়, সেখানে বাস্তব জগৎ, দৃশ্যমান চিত্রগুলিরই উপস্থাপনা। সেই চিত্র একান্তভাবেই একটি আস্তাবল এবং তার পরিপার্শ্বের। সেখানে খড় কাটার কল আছে। পাইস-রেস্তরাঁ আছে, যা আস্তাবলের আশেপাশে থাকাই স্বাভাবিক। প্রথম স্তবকে যে মহীনের ঘোড়াগুলোকে কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ঘাস খেতে দেখা গিয়েছিল তারা এখানে নেই, তারা vision বা দৃশ্যজাত। ভাবা যেতে পারে, দৃশ্যজাত এই মহীনের ঘোড়াগুলোর অনুষঙ্গেই আস্তাবল এবং তার পরিপার্শ্বের ছবি মনে এসেছে, তারাও কোথাও নেই, স্মৃতির সূত্রেই তাদের আবির্ভাব। কিংবা এটাও ভাবা সম্ভব যে মহীনের ঘোড়াগুলোকে, কোনো দৃশ্য বা vision-এ নয়, বস্তুত দেখা গিয়েছিল কার্তিকের জ্যোৎস্নায়, তাদের দেখে মনে হয়েছিল যেন কোনো আদ্যিকালের জীব, এখনো ঘাসের লোভে চ'রে বেড়াচ্ছে, আর তাদেরই অনুষঙ্গে মনে পড়ল স্মৃতিসঞ্চিত আস্তাবল এবং তার পরিপার্শ্ব। আমার কাছে অবশ্য প্রথম ভাবনাটাই গ্রহণীয় মনে হয়। যাই হোক, আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসছে 'এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়'। 'এক ভিড়'-এর অর্থ কী? এক ঝলক হাওয়া? দমকা হাওয়া? নাকি অবিশ্রাম হাওয়া? এক ঝলক অথবা দমকা হাওয়ার কথা ভাবলে সহসা এই আস্তাবলের উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে— এইরকম মনে করা যেতে পারে। অবিশ্রাম হাওয়া ধ'রে নিলে এই আস্তাবলের উপস্থিতি সবসময়ের, একে বিস্মৃত হবার কোনো উপায় নেই, এ-রকম ভাবতে হবে। 'এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়' ইংরেজি crowded night (চিন্তা-বিক্ষিপ্ত রাত্রি)-এর বঙ্গানুবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। যাই হোক, চিন্তা-বিক্ষিপ্ত রাত্রিতে অথবা সহসা এক-ঝলক হাওয়ায় আস্তাবলের ঘ্রাণ অর্থাৎ ঘোড়াদের উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে এবং একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বিষণ্ন খড়ের পৌনঃপুনিক ক্লান্তিময় ঝ'রে পড়ার শব্দ। ঘোড়া আছে এবং খড় কাটা আছে, আছে বেঁচে থাকা এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনের খাদ্য। খড়ের বিশেষণ 'বিষণ্ন' কেন? খড় অর্থাৎ খাদ্যের নিজে বিষণ্ন হবার কোনো কারণ নেই। মনে হয়, 'বিষণ্ন খড়ের শব্দ' আসলে 'খড়ের বিষণ্ন শব্দ'। খাদ্যের এই যে আয়োজন, প্রত্যহ এই যে জৈবিক প্রয়োজন যা সুদূর অতীত থেকে আজও অব্যাহত, যা আমাদের বেঁচে থাকার সহায়তা করে অথচ বেঁচে থাকার কোনো তাৎপর্যই আনতে পারে না, তা করুণ বিষণ্নতা ছাড়া আর কী!

চায়ের পেয়ালাগুলোকে মনে হচ্ছে কটা বেড়ালছানার মতো। অনুমান করা যায় এখন রাত্রিবেলায় পাইস-রেস্তরাঁর কাপগুলোকে বাইরে নামিয়ে রাখা হয়েছে, দূর থেকে তাদের মনে হচ্ছে নিদ্রাতুর বেড়ালছানার মতো— আর তাদের ঘিরেই ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট অধিকার। 'অস্পষ্ট', সমস্ত চিত্রটিকে দূর থেকে দেখা হচ্ছে ব'লেই অস্পষ্ট, ব্যাপারটা আপাত-অর্থে তাই হলেও 'অস্পষ্ট' বিশেষণটি একেবারেই নিরামিষভাবে হয়তো ব্যবহার করা হয়নি, 'অস্পষ্ট' আসলে অলস, তা একদিকে যেমন অসুস্থ কুকুরগুলোর সামর্থ্যহীনতা প্রমাণ করছে, অন্যদিকে কুকুরগুলো অলসভাবে খাদ্যান্বেষণ করছে, যেরকম অলসভাবে কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে মহীনের ঘোড়াগুলোর খাদ্যান্বেষণ— এই রকম ইঙ্গিতও বিশেষ ক'রে মনে পড়ে। এবং আহার-অন্বেষণে কাপগুলোর ন'ড়ে ওঠা, তা-ও 'হিম' অর্থাৎ ক্লান্তিময়, প্রতিবাদহীন। যে-অর্থে খড় কাটার শব্দ বিষণ্ন, ঠিক সেই অর্থেই, মনে হয়, কাপগুলোর হিম হ'য়ে ন'ড়ে ওঠা।

নবম লাইনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা 'গোল আস্তাবলে' শব্দ দুটিকে নিয়ে। আস্তাবলের বিশেষণ 'গোল' কেন? আস্তাবলের আকার যে কখনোই গোল হয় না, এটা আমরা সবাই জানি। 'গোল' বিশেষণটি ব্যবহার ক'রে কবি কি আমাদের বৃত্তাকার পৃথিবীর কথাই স্মরণ করাতে চাইছেন? মনে হয় তা-ই। ঘোড়া যেখানে সকল প্রাকৃতিক-নিয়ম-রুদ্ধ প্রাণীরই প্রতিনিধিত্ব করছে, আস্তাবল সেখানে সমগ্র পৃথিবীর। শাশ্বত সময়, যার কাছে অতীত-বর্তমান সমার্থক, যা এক জাগ্রত নিত্যতা, তারই প্রশান্তির স্পর্শে পৃথিবীর সব আলো নেভে, ('প্যারাফিন-লণ্ঠন'কে এ-ক্ষেত্রে চাঁদ ভাবাই যুক্তিযুক্ত; প্যারাফিন-লণ্ঠনের ক্ষীণজ্যোতি হলুদ আলো ম্রিয়মাণ চাঁদের আলোর কথাই স্মরণ করায়) বর্তমান বিলীন হয়ে যায় অতীতের ভিতর। 'এইসব ঘোড়াদের'— অর্থাৎ দৃশ্যজাত মহীনের ঘোড়াগুলো যা প্রস্তরযুগের ঘোড়াদের সমার্থক, যেখানে বর্তমান এবং অতীত একাকার, তাদেরই আদিম স্তব্ধতার স্পর্শে বর্তমান হারিয়ে যায় অতীতের ভিতর।

অন্য একটি কবিতায় জীবনানন্দ হামিদের মরকুটে কানা ঘোড়াদের কথা বলেছেন:

কে যেন উঠিল হেঁচে হামিদের মরকুটে কানা ঘোড়া বুঝি
সারাদিন গাড়ি-টানা হ'লো ঢের, ছুটি পেয়ে এবার জ্যোৎস্নায়
নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস
যেন কোনো ব্যথা নেই পৃথিবীতে।— 'মহাপৃথিবী'

কিন্তু এরা মহীনের ঘোড়াগুলোর মতো একেবারেই নয়। তারা 'আট বছর আগের একদিন'-এর ফড়িং দোয়েলের মতো, বোধ-বিবর্জিত জীবন-যাপনেই তাদের পরিতৃপ্তি। মহীনের ঘোড়াদের কাছেও খাদ্যান্বেষণই প্রধান কথা, জীবনযাপনই একমাত্র, কিন্তু সেখানে এক অরব ক্লান্তি, বিষাদ— হামিদের মরকুটে ঘোড়া অথবা 'আট বছর আগের একদিন'-এর দোয়েল-ফড়িঙেরা যার সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নয়।

'ঘোড়া' কবিতাটি বক্তব্যপ্রধান এবং বক্তব্য এখানে কয়েকটি চিত্রের মধ্যবর্তিতাতেই প্রধানত নির্দেশিত। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই কবিতায় 'মতো' শব্দের ব্যবহার মাত্র একবারই হয়েছে, চিত্রকল্প যা বস্তুর সাদৃশ্যে অপর বস্তুর কল্পনা করে, এখানে তার অবকাশ নেই। কেবল কয়েকটি নিরপেক্ষ ছবি— যারা নিজেরা উদাসীন এবং নির্লিপ্ত— তারা, কোনো অপর বস্তুর নয়, এক অমোঘ সত্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করছে। বক্তব্যকে ঘোষণার মতো ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই, আমাদের কেবল কয়েকটি ছবির মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে এবং যেমন কোনো-কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের সামনে আলোকিত উন্মোচন ঘটায়, ঠিক সেইরকমই কবিতাটি তার সকল সত্য নিয়ে আমাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসিত হয়েছে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, অষ্টম সংকলন
(মাস-সাল অনুল্লিখিত)

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন।—
সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কী রকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

উত্তর লিখেছেন: অরুণকুমার সরকার

রাজনীতির যেটা প্রেরণা, যে-অংশটা আদর্শবাদ— এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য ঘুচিয়ে সুস্থ মানবসম্বন্ধ স্থাপনের স্বপ্ন, এক কথায়, পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধনা, তার সঙ্গে কোনো কবিরই বিরোধ থাকতে পারে না। আমার অন্তত নেই। কিন্তু চোখের সামনে যখন দেখি এদেশের নোংরা বাকসর্বস্ব রাজনীতি দলীয় সঙ্কীর্ণতা এবং ক্ষমতালালসায় আদর্শবাদ থেকে ক্রমেই দূরে সরে আসছে আর সাধারণ লোক যে-তিমিরে সেই তিমিরেই দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসুস্থতা এবং অনিশ্চয়তায় ত্রাহিস্বরে আর্তনাদ করছে, চতুর দালালদের হাতে ব্যবহৃত হয়ে স্বজননিধনে মেতে উঠছে, তখন কখনো-বা রাগে রি-রি ক'রে জ্বলে উঠি কখনো-বা ঘৃণায় নিজেকে গুটিয়ে ফেলি, কখনো-বা মনে হয় রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে নিষ্ঠুর হাতে রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের মুখোশগুলো ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিয়ে আসি। কিন্তু অন্ধ আক্রোশটাকে কবিতার মধ্যে পাচার ক'রে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার ইচ্ছে একবারও হয় না। কেননা, কবিতা লিখে সামাজিক বিপ্লব আনা সম্ভব এমন ভণ্ডামিতে আমি বিশ্বাস করি না। কবির পথ এবং রাজনীতিকের পথ ভিন্নমুখী। বিপ্লবের জন্য সংগঠন দরকার, শিক্ষার প্রসার দরকার, নিরলস নিষ্কাম পরিশ্রম এবং সংগ্রাম দরকার। বিপ্লবের জন্য প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে, শিক্ষকতা করা যেতে পারে, মিছিলে ধ্বনি তোলা যেতে পারে (এ-সব কিছুই একদিন করেছি এবং এখনো করতে প্রস্তুত আছি) কিন্তু কবিতায় আগুন ছড়ানো? সেটা হবে নপুংসক ন্যাকামি, ফুলগাছকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা। মনে রাখা দরকার কবিও বৃহত্তর অর্থে একটি সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। কবিতা পাঠের ফল চিত্তশুদ্ধি। ভালো কবিতা পাঠকের মনকে উন্নীত করে, ভালোবাসতে শেখায়, আপ্লুত করে সহানুভূতিতে। এর মূল্য কিছু কম নয়। সৎ রাজনীতিক এই মানবিক মূল্যগুলির জন্যও লড়াই করেন।

যাঁরা কবিতা লেখেন অথবা কবিতা পাঠ করেন তাঁদের মনেও রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার ভাঁটা কাজ করে। কখনো তাঁরা বিরক্ত হন, কখনো উৎসাহিত। কিন্তু কোনো সময়েই রাজনীতি তাঁদের কবিতা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। কবিতাই তো তাঁদের একমাত্র না হোক, অন্যতম আশ্রয়। তাই ইদানীংকালের রাজনৈতিক অস্থিরতা কবিতাকে জব্দ বা স্তব্ধ ক'রে দিতে পারেনি। বর্তমান কবিতা-পত্রিকাগুলিই তার প্রমাণ।

কবিতাকে নিশ্চয়ই মুখের ভাষার কাছাকাছি পৌঁছতে হবে। তবে সেটা শহুরে রকবাজদের ভাষা নয়। সেটা হবে বিশেষভাবে তৈরি করা একটা ভাষা যার সঙ্গে কথ্য ভাষার মিলটা শুধু ব্যাকরণগত, অন্তরঙ্গ কিছু নয়।

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

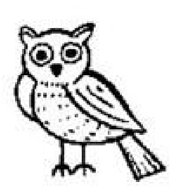

কবিতা কল্পনালতা?

কবিতা কল্পনালতা বলে ওই যে একটা কথা আছে, ওটা শুনলে আমার বেদম হাসি পেয়ে যায়। ভাবি যে, এর মধ্যে এত কল্পনার কী আছে। যা দেখছি, যা শুনছি আর চারপাশে আমার চেনা-জানা মানুষদের সংসারযাত্রা যেভাবে চলছে, তাই নিয়েই তো দিব্যি কবিতা লেখা যায়। আমি অন্তত সেইভাবেই লিখে যাচ্ছি আমার কবিতা। তার থেকে গুটিকয় কবিতা বেছে নিয়ে এখানে ছাপা হল।

বাছাইয়ের কাজটা আমাকেই করতে বলা হয়েছিল। আমি রাজি হইনি। তার কারণ নিজে যা লিখেছি, তার একটাও আমার পছন্দ নয়। যেটার ওপরে চোখ বুলোই, সেটাই বিচ্ছিরি ঠেকে। মনে হয়, বিস্তর খুঁত রয়ে গিয়েছে, যা হয়তো একটু অন্যভাবে লিখলে থাকত না। শেষপর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে বাছাইয়ের কাজটা অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিই।

অমরেন্দ্র নিজে কবি। তায় সদ্যকৈশোরোত্তীর্ণ বয়সে **কবিতা-পরিচয়** নামে যে কাগজখানা বার করেছিলেন (যাতে প্রকাশিত আলোচনা ও মন্তব্যগুলি পরে আলাদা একখানা চমৎকার বই হয়ে বেরিয়েছে), তাতেই বুঝেছিলাম যে, অন্যদের লেখা কবিতা সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অটুট সম্পর্ক। তাছাড়া চক্রবর্তীকে চক্রবর্তী না-দেখলে দেখবেই বা কে? নির্বাচনের কাজটা তিনিই করে দিয়েছেন।

আমার তরফে একটা কথা অবশ্য না-বললেই নয়। সেটা এই যে, আমি কবিতা লিখি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। অভিজ্ঞতার অভিঘাত কখনও-কখনও এত প্রবল হয় যে, কলমের আর তর সয় না, কবিতাটা একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই লেখা হয়ে যায়। আবার কখনও-কখনও লিখি ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার অনেকদিন, এমনকী অনেক বছর পরে। এটা হয় একমাত্র তখনই, নতুন কোনও ঘটনার সঙ্গে সেই পুরনো ঘটনার যখন কোনও মিল খুঁজে পাই।

আর কথা বাড়াব না।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৩১ জুলাই ২০১৩

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নির্বাচিত দশটি কবিতা

নিতান্ত কাঙাল

নিতান্তই ক্লান্ত লোকটা। শুধু
ছোট্ট একটা ঘরের কাঙাল।
দক্ষিণের জানলা দিয়ে ধুধু
অফুরন্ত মাঠ দেখবে। আর
পশ্চিমের জানলা দিয়ে লাল
সূর্য-ডোবা সন্ধ্যার বাহার।
নিতান্তই ক্লান্ত লোকটা। শুধু
ছোট্ট একটা ঘরের কাঙাল!

নিতান্তই শান্ত লোকটা। তাই
মিষ্টি একটা মেয়ের কাঙাল।
যে তাকে খুনসুটি করে প্রায়ই
রাত জাগাবে। বলবে, 'কোন্ দিশি
লোক তুমি তা বোঝা শক্ত। কাল
আনতে হবে আলতা এক শিশি।'
নিতান্তই শান্ত লোকটা। তাই
মিষ্টি একটা মেয়ের কাঙাল।

নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়,
অল্প-একটু সুখের কাঙাল।
রৌদ্রে, জলে, উদ্দাম হাওয়ায়
ঢের ঘুরেছে। বুঝল না এখনও
ইচ্ছার আগুনে খেয়ে জ্বাল
একটু-সুখে তৃপ্তি নেই কোনো!
নিতান্তই ভ্রান্ত লোকটা। হায়,
অল্প-একটু সুখের কাঙাল।

১২ আশ্বিন, ১৩৬২

নিজের বাড়ি

ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই শান্ত উঠোন,
এই খেত, ওই মস্ত খামার—
সবই আমার।
এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি
ইচ্ছেমতন জানলা-দরজা খুলতে।
ইচ্ছেমতন সাজিয়ে তুলতে
শান্ত সুখী একান্ত এই বাড়ি।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, চেয়ার টেবিল,
আলমারিতে সাজানো বই, ঘোমটা-টানা নরম আলো,
ফুলদানে ফুল, রঙের বাটি,
আলনা জুড়ে কাপড়-জামার
সুবিন্যস্ত সমারোহ, সবই আমার।
এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি
দেয়ালে লাল হলুদ রঙের কাড়াকাড়ি
মুছে ফেলতে সাদার শান্ত টানে।
এই যে বাড়ি, এই তো আমার বাড়ি।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই ঠান্ডা উঠোন,
এই খেত, ওই মস্ত খামার,
আলমারিতে সাজানো বই,
ফুলদানে ফুল, রঙের বাটি,
টবের গোলাপ, নরম আলো,
আলনা জুড়ে কাপড়-জামার
শৃঙ্খলিত সমারোহ, সবই আমার, সব-ই আমার।

ভাবতে ভাল লেগেছিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে
হঠাৎ কোথাও চলে যাব।
ফিরে এসে আবার যেন দেখতে পারি,
যে-নদী বয় অন্ধকারে, তারই বুকের কাছে
বাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
ওই যে বাড়ি, ওই তো আমার বাড়ি।

শ্রাবণ, ১৩৬৪

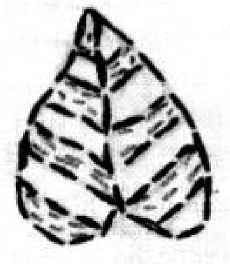

ভিতর-বাড়িতে রাত্রি

রাত্রি হলে একা-একা পৃথিবীর ভিতর-বাড়িতে
যেতে হয়।
সারাদিন দলবদ্ধ, এখানে-ওখানে ঘুরি-ফিরি,
বাজারে বাণিজ্যে যাই;
মাঝে-মাঝে রোমাঞ্চিত হবার তাগিদে
সামান্য ঝুঁকিতে বসি তাসের আড্ডায়;
কেউ বা তিন-আনা জেতে; কেউ হারে।
রাত করলে সবাই উঠে যায়।
মাথায় কান-ঢাকা টুপি, পায়ে মোজা, বারোটা-রাত্তিরে
জানি না কোথায় যায় দুরি তিরি রাজা ও রমণী।
আমি যাব ভিতর-বাড়িতে।

ভিতর-বাড়ির রাস্তা এখনও রহস্যময় যেন।
এত যে বয়স হল, তবুও অচেনা লাগে।
কোথায় কবাট-জানলা, উঠোন, মন্দির, কুয়োতলা,
কুলুঙ্গি, ঘোরানো সিঁড়ি, বারান্দা, জলের কুঁজো।
কোথায় ময়নাটা ঠায় রাত্রি জাগে।
বুঝবার উপায় নেই কিছুই, অন্তত আমি কিছুই বুঝি না।
বাড়িটা ঘুমের মধ্যে হানাবাড়ি। তবু
দুয়ার ঠেললেই কেউ ভীষণ চেঁচিয়ে উঠবে, এমন আশঙ্কা হয়।
দুয়ার ঠেলি না, আমি সারা রাত্রি দেখি
খরস্রোত অন্ধকার বয়ে যায় ভিতর-বাড়িতে।

১৬ ভাদ্র, ১৩৬৮

অন্ধের সমাজে একা

রাস্তার দুইধারে আজ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছে অন্ধ সেনাদল;
আমি চক্ষুষ্মান হেঁটে যাই
প্রধান সড়কে। দেখি, বল্লমের ধাতু
রোদ্দুরের প্রেম পায়, বন্দুকের কুঁদার উপরে
কেটে বসে কঠিন আঙুল।
যে-কোনো মুহূর্তে ঘোর মারামারি হতে পারে, তবু
অস্ত্রগুলি উল্টানো রয়েছে আপাতত।
পরস্পরের দিকে পিঠ দিয়ে সকলে এখন
সম্মান রচনা করে। আমি দেখি,
অযুত নিযুত অন্ধ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছে রাস্তার উপরে।
আমি চক্ষুষ্মান হেঁটে যাই।

আমি সেনাপতি। আমি সৈন্য-পরিদর্শনে এসেছি।
কিন্তু কার সেনাপতি, কাহাকে সমরে নেব, কিছুই জানি না।
আমি শুধু দেখতে পাই, দশ লক্ষ যোদ্ধার সভায়
কাহারও কপালে অক্ষিতারকার শোভা নেই;
কপালে গভীর দুই গর্ত নিয়ে সবাই দাম্ভিক দাঁড়িয়েছে।
আমি একা দেখতে পাই, আমি একা দেখতে পাই, আমি
দশ লক্ষ যুযুধান অন্ধের সভায় আজ একা।
অথচ অন্ধের দেশে একা চক্ষুষ্মান হওয়া খুব ভয়াবহ।
প্রধান সড়কে তাই সৈন্য-পরিদর্শনের কালে
বারবার চমকে উঠি। মনে হয়,
অন্ধের সমাজে একা চক্ষুষ্মান হবার অধিক
বিড়ম্বনা কিছু নেই, কখনও ছিল না।

রাস্তার দুই ধারে আজ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছে যুদ্ধে সমুৎসুক
অন্ধ সেনাদল।
আমি হেঁটে যাই। আমি হেঁটে যেতে-যেতে
গুরুবন্দনার ছলে দেখে যাই, বল্লমের ধাতু
রোদ্দুরে হতেছে সেঁকা, বন্দুকের কুঁদার উপরে
কেটে বসে কঠিন আঙুল।
আপাতত রণাঙ্গন নিস্তব্ধ যদিও,
আমি তবু বুঝতে পারি, নিকুম্ভিলা যজ্ঞের আগুনে
সর্বত্র ভীষণ ধুমধাড়াক্কার উদ্যোগ চলেছে।

আমি সেনাপতি। আমি প্রধান সড়কে হেঁটে যাই।
অথচ কখন যুদ্ধ শুরু হবে, কার যুদ্ধ, কিছুই জানি না।
কাহাকে সমরে নেব, কিছুই জানি না!
(আমি কার সেনাপতি, আমি কার সেনাপতি) আমি
অন্ধের সমাজে একা চক্ষুষ্মান হবার বিপদ
টের পেতে-পেতে আজ গুরুবন্দনার ছলে ভাবি,
এবার পালানো ভাল দৌড়িয়ে। নতুবা
যদি ভীমরবে সেই বিস্ফোরণ ঘটে যায়, তবে—
যেহেতু নিদানকালে চক্ষুলজ্জা ভয়াবহ, তাই—
নিজের চক্ষুকে হয়তো নিজেরই নখরাঘাতে উপড়ে
ফেলে দিয়ে
অন্ধের সমাজে আজ মিশে যেতে হবে।

মাঘ, ১৩৬৮

তর্জনী

তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো...কখনও বলবে না...
কাকে...তুমি ভয় দেখাও কাকে...
আমি অনায়াসে সব ভেঙে ফেলতে পারি...
মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারি সবকিছু...
বাঁ পায়ের নির্দয় আঘাতে আমি সব
মুছে ফেলতে পারি...
তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো...কখনও বলবে না...

ভীষণ চমকিয়ে দিয়ে দশটার এক্সপ্রেস চলে গেল।
পরক্ষণে পৃথিবী নীরব।
তারের উপরে বাজে হাওয়ার শাণিত ভাষা, আর
মিলায় চাকার শব্দ...তর্জনী দেখিয়ে কেন...
তর্জনী দেখিয়ে কেন...
যেন-বা হুড়মুড় শব্দে স্বপ্নের বাড়িটা
ভেঙে পড়তে গিয়ে টাল সামলে নিয়ে এখন আবার
অতল নয়নজলে জেগে রয়।

১৬ চৈত্র, ১৩৬৮

জলে নামবার আগে

সকলে মিলিত হয়ে যেতে চাই আজ
পৃথিবীর মিশকালো ঘরে।
গিয়ে স্থির হতে চাই, কাঠের জাহাজ
যেমন সুস্থির হয় জলের জঠরে।
কেননা আলোয় যারা করে চলাচল,
ডাঙাই তাদের কাছে বিশ বাঁও জল।

যেন সব ভুলে যাই, কোন্‌খান থেকে
কত দূরে কোথায় এলাম।
আলোকিত দেবতার মুখ যায় বেঁকে,
প্রেমিক জানে না তার প্রেমিকার নাম।
জীবনে কোথাও ছিল এত বড় দহ,
জানত না মানুষের বাপ-পিতামহ।

অথচ আকাশ নীল। ফুলের প্রণয়
হাওয়ায় সলিলে ওই ভাসে।
ছোঁবার সাহস নেই, যেন খুব ভয়
শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসে।
যদিও সবাই জানে, খুঁজতে গেলেই
দেখা যাবে, কারও আজ শিরদাঁড়া নেই।

ফলত সবাই যেন যেতে চাই আজ
পৃথিবীর মিশকালো ঘরে।
সবাই লুকোতে চাই; কাঁকড়া কি মাছ
যেমন লুকিয়ে থাকে জলের জঠরে।
এদিকে ডাঙায় যারা করে চলাচল,
ডাঙাই তাদের কাছে বিশ বাঁও জল।

আশ্বিন, ১৩৬৮

একটাই মোমবাতি

একটাই মোমবাতি, তুমি তাকে কেন দু'দিকে জ্বেলেছ?
খুব অহঙ্কারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা যায়।
তুমি এত অহঙ্কারী কেন?
চোখে চোখ রাখতে গেলে অন্য দিকে চেয়ে থাকো,
হাতে হাত রাখতে গেলে ঠেলে দাও,
হাতের আমলকী-মালা হঠাৎ টান মেরে তুমি ফেলে দাও,
অথচ তারপরে এত শান্ত স্বরে কথা বলো, যেন
কিছুই হয়নি, যেন
যা কিছু যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে।
খুব অহঙ্কারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা যায়।

অথচ এমন কাণ্ড করবার এখনই কোনো দরকার ছিল না।
অন্য কিছু না থাক, তোমার
স্মৃতি ছিল; স্মৃতির ভিতরে
ভুবন-ভাসানো একটা নদী ছিল; তুমি
নদীর ভিতরে ফের ডুবে গিয়ে কয়েকটা বছর
অনায়াসে কাটাতে পারতে। কিন্তু কাটালে না;
এখনই দপ করে তুমি জ্বলে উঠলে ব্লাউজের হলুদে।

খুব অহঙ্কারী হলে তবেই এমন কাণ্ড করা যায়।
তুমি এত অহঙ্কারী কেন?
একটাই মোমবাতি, তবু অহঙ্কারে তাকে তুমি দু'দিকে জ্বেলেছ।

২৬ ভাদ্র, ১৩৭১

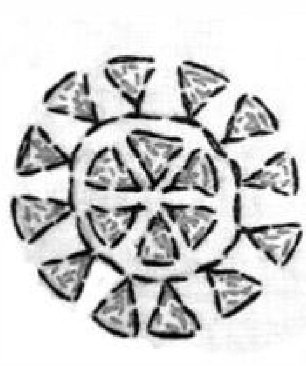

প্রবাস-চিত্র

যেখানে পা ফেলবি, তোর মনে হবে, বিদেশে আছিস।
এই তোর ভাগ্যলিপি।
গাছপালা অচেনা লাগবে, রাস্তাঘাট
অন্যতর বিন্যাসে ছড়ানো,
সদরে সমস্ত রাত কড়া নাড়বি, তবু
বাড়িগুলি নিদ্রার গভীর থেকে বেরিয়ে আসবে না।
এই তোর ভাগ্যলিপি।
সকলে বলবে না কথা; যারা বলবে,
তারা পর্যটন বিভাগের কর্মী মাত্র,
যে-কোনো টুরিস্ট্‌কে তারা দুটি-চারটি ধোপদুরস্ত কথা
উপহার দিয়ে থাকে,
তার জন্যে মাসান্তে মাইনে পায়।
এই তোর ভাগ্যলিপি।

যেখানেই যাবি, তোর মনে হবে, এইমাত্র উড়োজাহাজের
পেটের ভিতর থেকে ভিন্ন-কোনো ভূমির উপরে
নেমে এসেছিস।
এই তোর ভাগ্যলিপি।
কাপড় সরিয়ে কেউ বুকের রহস্য দেখাবে না।

১৭ ফাল্গুন, ১৩৭৩

খড়কুটো

সেই যে বাড়িয়ে রাখা ছিল দুই হাত,
জানো আর না-ই জানো
সেই দুর্দিনে তারও ছিল কিছু মানে।
ভেসে চলে গেছে সেই দিন সেই রাত
সময়ের চোরা টানে।
এ-রকমই হয়, এ-রকমই হয়ে থাকে,
মানো আর না-ই মানো
খড়কুটো ছাড়া থাকে না কিছুই আর।
অগত্যা তা-ই সিন্দুকে তুলে রাখে
মানুষের সংসার।

২৯ বৈশাখ, ১৪০৭

নিজের কাছে স্বীকারোক্তি

আমি পাহাড় থেকে পড়তে পড়তে
তোমাকে ধরে বেঁচে রয়েছি, কবিতা।
আমি পাতালে ডুবে মরতে মরতে
তোমাকে ধরে আবার ভেসে উঠেছি।
আমি রাজ্যজয় করে এসেও
তোমার কাছে নত হয়েছি, কবিতা।
আমি হাজার দরজা ভালবেসেও
তোমার বন্ধ দুয়ারে মাথা কুটেছি।

কখনও এর, কখনও ওর দখলে
গিয়েও ফিরি তোমারই টানে, কবিতা।
আমাকে নাকি ভীষণ জানে সকলে,
তোমার থেকে বেশি কে জানে, কবিতা?

আমি ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াই,
গোপন রাখি সকল শোক, কবিতা।
আমি শ্মশানে ফুল ঘটাব, তাই
তোমার বুকে চেয়েছি ঢেউ রটাতে।
আমি সকল সুখ মিথ্যে মানি,
তোমার সুখ পূর্ণ হোক, কবিতা।
আমি নিজের চোখ উপড়ে আনি,
তোমাকে দিই, তোমার চোখ ফোটাতে।
তুমি তৃপ্ত হও, পূর্ণ হও,
জ্বালো ভূলোক, জ্বালো দ্যুলোক, কবিতা।

ভাদ্র, ১৩৭৪

কবিতার ভাষা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আমার যখন ছাত্রাবস্থা চলছে, কবিতা সম্পর্কে সেই সময়ে প্রায়ই একটি প্রাজ্ঞবচন শুনতুম। সেটা কী? না 'পোয়েটস টক টু দেমসেল্‌ভ্‌স, উই ওনলি ওভারহিয়ার।' অর্থাৎ কবিতা আসলে কবিদের স্বগত-সংলাপমাত্র, যা কিনা আমরা আড়াল থেকে শুনে ফেলি। কথাটা আমি তখনও বিশ্বাস করতুম না। এখনও করি না। কেননা তা-ই যদি হত, তবে তো স্বগতোক্তি শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই দায় মিটে যেত কবির। কবিতাটিকে তিনি তখন জলে ভাসিয়ে দিতে পারতেন, আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে পারতেন কিংবা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিতে পারতেন হাওয়ায়।

কিন্তু কই, তা তো তিনি করেন না। যখন ছাপাখানা ছিল না, তখনও করেননি। যখন কাগজ ছিল না, তখনও না। যদি ধরেও নিই যে, কবিতা একপ্রকার আত্মকথনই বটে, তো দেখি, কবিরা তাঁদের সেই আত্মকথনকে তখনও লিপিবদ্ধ করে রাখতে ছাড়েননি। কখনও লিখে রেখেছেন ভূর্জপত্রে, কখনও তালপাতায়। শুধু কি তা-ই? যাঁদের কপালে রাজানুগ্রহ জুটত, রাজসভায় গিয়ে তাঁরা সেগুলি পড়ে শোনাতেনও। আর এখন তো ছাপাখানাই এসে গেছে। কবিদের তাই আর অত ধকল পোহাতে হয় না। যা লিখেছেন, তার একটি অনুলিপি করলেই হল, সেটি তিনি কোনও পত্রিকায় ছাপতে পাঠিয়ে দেন, নয়তো তাঁরই লেখা আরও কিছু কবিতার সঙ্গে একত্রিত করে আস্ত একটি কাব্যগ্রন্থ হিসাবে ছাপিয়ে বার করেন।

দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এটা কেন করেন তিনি? তবে কি শুধু নিজের কথাটা নিজেকে শুনিয়েই তিনি তৃপ্ত নন? নিজেকে যা শুনিয়েছিলেন, তা এখন আরও পাঁচজনকে শোনাতে চান? এছাড়া তো এর আর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

কথাটা যতই ভাবি, ততই এর সূত্র ধরে আরও একটা চিন্তার জালে জড়িয়ে যাই। ভাবি যে, নিজের সঙ্গে বলা কথাগুলি যদি একটা কবিতার রূপ পরিগ্রহ করেই থাকে, আর সেই কবিতাটিকে যদি আমি আরও অনেকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে তো যেমন তার বিষয়, তেমনি তার ভাষাও হওয়া চাই অনেকজনের অধিগম্য, তা যদি না হয়, অর্থাৎ কবিতাটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদি পাঠক কোনও ধারণাই করতে না পারেন ও তার ভাষাও হয় তাঁর অনধিগম্য তবে তো কবিতাটিকে এই যে অন্য অনেকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল, এই কাজটাই একেবারে নিরর্থক হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে একান্ত ব্যক্তিগত হতে পারে, হয়ও। তাই তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন এখানে তুলব না। কিন্তু প্রশ্ন তুলব ভাষা নিয়ে। তাও ভাষার বিন্যাস নিয়ে নয়। কেননা সর্বজনের ভাষার বিন্যাস যে একই ছাঁদের হবে না, বরং এক-এক জন এক-এক ছাঁদে ব্যক্ত করবেন তাঁর ভাবনাগুলিকে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলে কী নিয়ে আমার প্রশ্ন? প্রশ্নটা আসলে ভাষার স্তর নিয়ে, এবং যা দিয়ে ভাষা গঠিত হয়, সেই শব্দাবলি নিয়ে। প্রশ্ন দুটো আমার মনে বারবার জেগেছে, এবং নিজেরই কাছে বারবার খুঁজেছি তার উত্তর। এই প্রসঙ্গে এখুনি আবার ঢুকব। কিন্তু তার আগে আর-একটা কথা বলে নিই। সেই যখন থেকে আমার লেখা কাগজপত্রে ছেপে বেরুচ্ছে, তখন থেকেই এই একটা ধারণা আমাকে পেয়ে বসে যে, এ-লেখা তাহলে আর আমার একার রইল না, আরও অনেকের হয়ে গেল। কিন্তু সেই 'আরও অনেকে' কি বুঝতে পারবে এ-লেখার মর্মার্থ? উত্তরে নিজেই নিজেকে বলি, বুঝতে পারবে, যদি আমি ভাষার স্তর নির্বাচনে কোনও ভুল না করে থাকি, এবং শব্দ নির্বাচনেও না ফলিয়ে থাকি কোনও পাণ্ডিত্য।

কথাটা কি ধাঁধার মতো ঠেকছে? তাহলে একটা গল্প বলি। গল্পটা হয়তো আগেও বলে থাকব, তবে আর একবার বললেও ক্ষতি নেই।

এক পাদরি সাহেব খেয়াঘাটে গিয়ে দেখেন যে, খেয়ানৌকোটি খুব ধীরে-ধীরে এপারে আসছে। কিন্তু তাঁর ওপারে যাবার বিষম তাড়া। তাই তিনি হাঁক পেড়ে বললেন, 'ওহে, কর্ণধার, তোমার তরণী তুমি সত্বর এই তটভূমিতে

নিজের সঙ্গে বলা কথাগুলি যদি একটা কবিতার রূপ পরিগ্রহ করেই থাকে, আর সেই কবিতাটিকে যদি আমি আরও অনেকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে তো যেমন তার বিষয়, তেমনি তার ভাষাও হওয়া চাই অনেকজনের অধিগম্য...
সহজ বাংলার জনপথ ধরেই আমাকে হাঁটতে হবে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যে-ভাষায় কথা বলি, যথাসম্ভব সেই ভাষাতেই লিখব আমার কবিতা।

তরুণসমাজে সেই কবিতাটিকে যখন মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়তে দেখি, তখন বুঝতে পারি যে, যাকে আমি একান্তভাবে আমারই যন্ত্রণা ও ক্রোধ বলে ভেবেছিলুম, তা আরও অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। আমার কথাগুলিকে আমি অন্য অনেকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি।...

আনয়ন করো।' তাতে মাঝির কোনও হেলদোল দেখা গেল না। সাহেব তো অবাক। রেগে গিয়ে ঘাটের লোকদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, ব্যাপারটা কী, তিনি অত তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও লোকটা অমন ধীরেসুস্থে আসছে কেন? ঘাটের লোকেরা হেসে বলল, 'আপনার ভাষা ও বুঝতে পারেনি।' সাহেব তাতে আরও অবাক। বললেন যে, মাঝি তো বাঙালি। আর তিনিও তো ওকে যা বলবার তা বাংলাতেই বলেছেন, তাহলে ওর না বুঝবার কারণ কী।

কারণটা যে কী, পাঠকরা তা নিশ্চয় বুঝেছেন, এবং বুঝতে পেরে দম ফাটিয়ে খুব হাসছেনও হয়তো। তবু বলি, 'নানান দেশের নানান ভাষা' যেমন আছে, তেমনি আবার নানান ভাষার মধ্যে আছে নানান স্তর। ওটা বাংলা ভাষাতেও আছে। একটা স্তরের বাংলা যেমন কঠিন, আর-একটা স্তরের বাংলা তেমনি তুলনায় অনেক সহজ-সরল। মাঝিটি সহজ স্তরের বাংলা বলে ও বোঝে। পাদরি সাহেব যদি সহজ স্তরের বাংলায় তাঁর হুকুম জারি করতেন, অর্থাৎ যদি বলতেন, 'ওহে মাঝি, তুমি তোমার নৌকোখানি তাড়াতাড়ি এপারে নিয়ে এসো।' তাহলে তাঁর কথা বুঝতে মাঝির কোনও অসুবিধে হত না। কিন্তু তা তো তিনি করেননি। তিনি তাঁর কথাটা বলেছেন কঠিন স্তরের বাংলায়। তাও আবার তাতে গুঁজে দিয়েছেন গজাল-ঠোকা এমন সব তৎসম শব্দ, মাঝিটি যা তার বাপের জন্মে শোনেনি। সাহেবের কথা তাহলে সে বুঝবে কী করে?

গল্পটা শুনে আমিও যে হাসিনি, তা নয়। তবে একইসঙ্গে বুঝেছিলুম যে এর থেকে একটা শিক্ষাও নেবার আছে। সেটাও কিন্তু নিতে ভুলিনি। কী সেই শিক্ষা? না কঠিন ভাষা যারা বলে, শোনে ও বোঝে, সহজ ভাষা বলে, শোনে ও বোঝে তার চতুর্গুণ মানুষ। আর তাই আমার কবিতা যদি অনেক লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হয় তো ভাষার স্তর নির্বাচনে কোনও ভুল করলে আমার চলবে না, সহজ বাংলার জনপথ ধরেই আমাকে হাঁটতে হবে। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যে-ভাষায় কথা বলি, যথাসম্ভব সেই ভাষাতেই লিখব আমার কবিতা। পারতপক্ষে তাতে কোনও কঠিন শব্দ ব্যবহার করব না।

এবারে আসল কথায় আসি। পঁয়তাল্লিশ সালের নভেম্বরের গোড়ায় তো আমরা রাজগির থেকে কলকাতায় ফিরেছিলুম, তা সেই মাসেরই শেষের দিকে— একুশে নভেম্বর— এই শহরে এমন একটা ঘটনা ঘটে, যাতে আমার এই ধারণা ও সংকল্প আরও জোর পেয়ে যায়। কী হয়েছিল সেদিন? আমারই একটি পুরনো লেখার কিছুটা অংশ উদ্ধার করে সেটা জানাই:

"১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সেনাদের মুক্তির দাবিতে মির্জাপুর স্ট্রিটের বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক সভা ডাকা হয়েছিল। অত বড় ছাত্রসভা তার আগে কখনও দেখিনি। সভার পরে সেখান থেকে বার হয় এক বিরাট মিছিল। পুলিশ তৈরিই ছিল। মিছিল যখন ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে এগিয়ে আসছে, তখন নিউ সিনেমার সামনে তারা নির্বিচার লাঠি ও গুলি চালায়। ছাত্রসমাজের তরুণ কর্মী রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম তো আজ আর কারও অজানা নয়। গুলিবিদ্ধ হয়ে ট্রামরাস্তার উপরে তিনি লুটিয়ে পড়েন।

"পুলিশি হামলার এই ঘটনা আমার চোখের সামনেই ঘটেছিল। অতর্কিত আক্রমণে প্রথমটায় দিশাহারা হয়ে গেলেও মিছিল যে আবার দ্রুত সংহত হয়, এবং ঘটনাস্থল থেকে তাদের যে আর একটুও নড়ানো যায় না, সে-কথা ভুলিনি। রাস্তার উপরে চাপ-চাপ রক্ত, চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে ছেঁড়া বই-খাতা, চপ্পলের পাটি আর ভাঙা চশমা, আর তারই মধ্যে নিহত সঙ্গীকে নিয়ে রাত্রিযাপন করছেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী— সেদিনকার কথা যখন ভাবি, তখন এই দৃশ্যটা আজও চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

"মনে পড়ে, অনেক রাত্তিরে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলুম, এবং বাড়ি ফিরেই— যেন-বা একটা ঘোরের মধ্যে লিখেছিলুম একটি কবিতা 'শহিদ রামেশ্বর'। আমার সব কবিতার নীচেই তারিখ লেখা থাকে। এই কবিতাটির নীচে তারিখ লেখা রয়েছে ৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৫২। খ্রিস্টাব্দ আর বঙ্গাব্দের বিভ্রম কাটিয়ে কেউ যদি মিলিয়ে দেখেন, তাহলে বুঝবেন যে, ১৯৪৫ সালের ২১ নভেম্বর আর ১৩৫২ সালের ৫ অগ্রহায়ণ আসলে একই তারিখ।

"কবিতা লেখা শেষ হয়। কিন্তু বাকি রাত আর ঘুম আসে না। ক্রমাগত সেই বন্ধুদের কথা মনে পড়তে থাকে, রক্তাক্ত ধর্মতলা স্ট্রিটের উপর খোলা আকাশের নীচে যারা বিনিদ্র বসে রয়েছে।

"পরদিনই কবিতাটি 'দেশ'-এর দফতরে পাঠিয়ে দিই, এবং 'দেশ'-এর পরবর্তী সংখ্যাতেই পুরো একটা পাতা জুড়ে ছাপা হয় সেই কবিতা। আমি তখন ল-কলেজের ছাত্র। আমার বয়স তখন একুশ।

"কী ছিল সেই কবিতায়? পরাধীনতা ও তজ্জনিত অসহায়তার গ্লানি একটি একুশ বছরের তরুণের বুকে যে যন্ত্রণা ও ক্রোধ জাগিয়ে তুলতে পারে, একমাত্র তা-ই ছিল। কিন্তু তরুণসমাজে সেই কবিতাটিকে যখন মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়তে দেখি, তখন বুঝতে পারি যে, যাকে আমি একান্তভাবে আমারই যন্ত্রণা ও ক্রোধ বলে ভেবেছিলুম, তা আরও অনেকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গেছে। আমার কথাগুলিকে আমি অন্য অনেকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি।...

এটাই তো চেয়েছিলুম আমি। চেয়েছিলুম যে, আমার কবিতায় যা আমি বলতে চাই, সেই কথাটা আরও অনেকের কাছে পৌঁছে যাক। আমার অনুভূতি হয়ে উঠুক তাদেরও অনুভূতি। ছেপে যখন বেরিয়েছে, তখন আমার কবিতা তো আর একা আমারই রইল না, হয়ে উঠল তাদেরও কবিতা, শুধু আমার আনন্দ নয়, আমার যন্ত্রণারও তারা এখন সমান শরিক। আবার বলি, এটাই তো আমি চেয়েছিলুম। তাহলে আর আমি খুশি হব না কেন? খুশি হয়েছিলুম, আবার একইসঙ্গে যে একটু চমক লেগেছিল, তাও ঠিক।

এবারে একটা সরল সত্য স্বীকার করি। সেটা এই যে, কোনও কবিতা কার কতটা ভালো লাগবে, তার পিছনে সময়ের ভূমিকার গুরুত্বও নেহাত কম নয়। শহিদ রামেশ্বরকে নিয়ে ওই যে কবিতাটি আমি লিখেছিলুম, ওটি যদি মর্মান্তিক ওই ঘটনা ঘটার দু-চার দিনের মধ্যে ছেপে না বেরিয়ে বেরোত আরও চার-ছ'মাস বাদে, কবিতাটি তাহলে জনচিত্তকে অতটাই মথিত করত কি না, সেটা ঘোর সন্দেহের ব্যাপার। আমার ধারণা, করত না। কেননা— মাঝখানে অনেকটা সময় কেটে যাওয়ায়— জনতার আবেগ ইতিমধ্যে অনেকটাই শান্ত হয়ে আসত।

সাপ্তাহিক বর্তমান-এর সৌজন্যে

আগামী সংখ্যায় **আলোক সরকারের** স্বনির্বাচিত সাতটি কবিতা

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

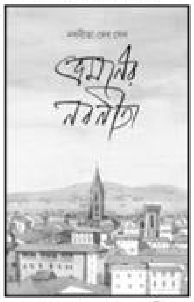

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

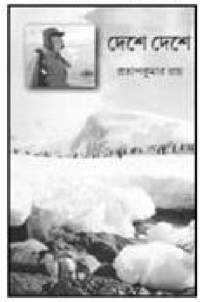

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড | ৩য় মুদ্রণ **₹৩৫০** **দ্বিতীয় খণ্ড** | ২য় মুদ্রণ **₹২৭৫**

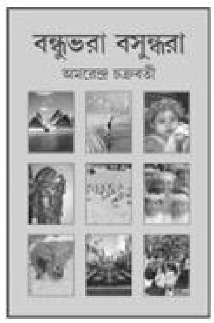

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য। সঙ্গে রঙিন ছবি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

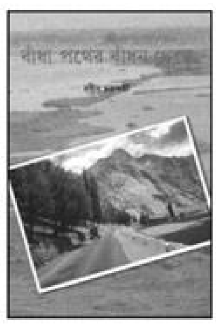

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

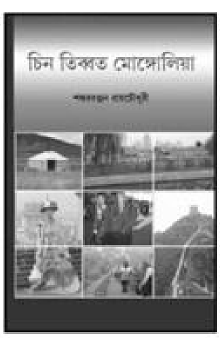

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার্ক মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

কাদম্বরী সমাচার

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

ঠাকুরবাড়ির অ্যালবাম থেকে: ওপরের ছবিতে বাঁদিক থেকে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাদম্বরী দেবী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (বসে)

'মরণ রে (যদ্দৃষ্টং) তুঁহু মম শ্যামসমান', কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যায় কবির হৃদয় নিঙরানো বেদনার্ত প্রতিক্রিয়া।

কাদম্বরীর আত্মহত্যা নিয়ে সম্প্রতি যে উদ্দাম চর্চা চলছে, ওপরে উদ্ধৃত বাক্যটি তারই ফলশ্রুতি কিনা ঠিক বলা যাচ্ছে না, কারণ যে বইটি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল, সেই বইতে রচনাকাল বলা হয়নি। বাক্যটি নেওয়া হয়েছে গাঙচিল প্রকাশিত সুকুমারী ভট্টাচার্যের 'প্রবন্ধসংগ্রহ' (তৃতীয় খণ্ড) থেকে। সুকুমারী ভট্টাচার্য কবে লেখেন তাঁর 'অমৃতের পথে: রবীন্দ্রকাব্যে মৃত্যু-প্রসঙ্গ', জানা যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবিষয়ক ধারণা এক সূত্রে ধরা নেই, কালের প্রবাহে, অভিজ্ঞতার ধাক্কায় সেটা পাল্টিয়েছে— এই বক্তব্যকে বিশদ করার জন্য সুকুমারী ভট্টাচার্য রবীন্দ্রনাথের 'মরণ' কবিতাটি স্মরণ করেছেন। যখন কালানুক্রমিক আলোচনাই হবে, আশা করা গিয়েছিল, লেখিকা কবিতাটির রচনাকালটি জেনে নেবেন। জানার চেষ্টা করলে তিনি অনায়াসে জানতে পারতেন। কবিতাটি কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তিন বছর আগে লেখা, মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া নয়। সন্দেহ হয়, কাদম্বরী দেবীকে নিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য থেকে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় যে তুমুল হট্টগোল

বাধিয়েছেন, সুকুমারী ভট্টাচার্য তারই শিকার।

আসল বোমাটি বানিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), যদিও বোমাটি ফাটতে দেরি হয়েছে। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) ও অম্লান দত্তের (১৯২৪-২০১২) সম্পাদনায় 'Quest' পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ তথ্যের ধার না ধেরে লিখে দিলেন তাঁর রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক প্রবন্ধ:

That in course of time he and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each other did not mend matters at all; and when the family married him off presumably to prevent scandal, had got worsed until his sister-in-law killed herself.

একটি সাময়িক পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই, ১৯২৮ সালে, একটি খবর ছেপেছিল এই মর্মে যে রবীন্দ্রনাথ যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। পত্রিকাটি অখ্যাত, ক্ষীণজীবী, নাম 'অবতার'। রবীন্দ্রনাথ মামলা করার কথা ভেবেছিলেন, তবে মামলা করলে খবরটাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে ভেবে মামলা করেননি। Quest বনেদি কাগজ, দুই বিদগ্ধ সম্পাদক তার তত্ত্বাবধানে। এক বছর আগে সুধীন্দ্রনাথ মারা গিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও, এই দুই সম্পাদক প্রবন্ধটি ছাপলেন, সম্পাদনার বিন্দুমাত্র চিহ্ন না রেখে। ইন্দিরা দেবীও ১৯৬১ সালে মে সংখ্যার 'Quest' পত্রিকা প্রকাশের সময় প্রয়াতা। তিনি বহু আগেই লিখেছিলেন (পরে, ১৯৯২ শারদীয় 'এক্ষণ'-এ মুদ্রিত), তাঁর নতুন কাকিমার মৃত্যুর সময় তিনি ছোট ছিলেন (১৮৭৩-১৯৬০), পরে অনুসন্ধান করেও পরিষ্কার করে জানতে পারেননি, 'এখন জানবার সম্ভাবনাও নেই, প্রয়োজনও নেই, যদিও অনেকের দেখি এ বিষয়ে বিশেষ কৌতূহল আছে।' কোনও রবীন্দ্রজীবনীকারই সুধীন্দ্রনাথের এই পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করেননি। রবীন্দ্রনাথের নাতজামাই কৃষ্ণ কৃপালনি তাঁর Rabindranath Tagore– A Biography -র দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৯৮০) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পর্যবেক্ষণটির উল্লেখ করেননি। যদিও সুধীন্দ্রনাথ শিক্ষিত, রুচিবান, কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, অধ্যাপকই শুধু নন, তিনি রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের ঘনিষ্ঠ সহচরদের একজন। কৃপালনি লিখলেন, কাদম্বরীর মৃত্যুর বিষয়ে: No one knows why. If the secret was known to any members of the family it has passed away with them. In the absence of any authentic evidence, any surmise or guess would be not only profitless but disrespectful to the memory of one of the finest specimens of Indian womanhood.

সুধীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে জিজ্ঞাসা করা যেত, কাদম্বরী-রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কেচ্ছা যদি সত্য হত, তাহলে স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'পুষ্পাঞ্জলি' ছাপতেন, কাদম্বরীর মৃত্যুর পরেই ১২৯২ বৈশাখ সংখ্যায়? রবীন্দ্রনাথ যে চিরকাল কাদম্বরীর স্নেহের কথা বলে গিয়েছেন, সেসব রবীন্দ্রনাথের মিথ্যাভাষণ? পারিবারিক কেচ্ছা থাকলে রবীন্দ্রনাথ সাহস পেতেন কাদম্বরীর মৃত্যুর আগে এবং ঠিক পরে চারটি কাব্যগ্রন্থ তাঁকে উৎসর্গ করতে?

মৃত্যুর কারণ হিসেবে ইন্দিরা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী (আবদুল ওদুদ-কে বলা) বা সুনয়নী দেবী (জগদীশ ভট্টাচার্যের 'কবিমানসী ১ গ্রন্থে উদ্ধৃত বক্তৃতা) যা-ই শুনে থাকুন, কোনও ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ আসেননি।

প্রবলভাবে এলেন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে, যে উপন্যাসের বিষয় রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরীর প্রেম। রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হওয়ার পরে, কাদম্বরীর সাহচর্য থেকে কবি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান এবং তজ্জনিত মনঃকষ্টে রবীন্দ্রনাথের নতুন বৌঠান আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এই উপন্যাস, 'কাদম্বরী দেবীর সুইসাইড-নোট' এই অর্থে ব্যতিক্রমী— ২০১২ জানুয়ারিতে এর প্রথম প্রকাশ এবং ২০১৩ জুন পর্যন্ত এর পঁচিশবার মুদ্রণ, পঁচিশ হাজার কপি বিক্রি— যেটা বাংলা প্রকাশন জগতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রচনাশৈলী যেমনই হোক, বাঙালি পাঠকের মনোরঞ্জন করছে এই উপন্যাস এবং সমবেত এক বৃহৎ বাঙালি পাঠকগোষ্ঠীর বিশ্বাস অর্জন করেছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী

রঞ্জনের উপন্যাসে খলচরিত্র রবীন্দ্রনাথের মেজবৌঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫০-১৯৪১)। যে কথাগুলো উপন্যাসটিতে ধুয়ার মতো ব্যবহার করা হয়েছে, সেই কথাগুলো ছিল সত্যেন্দ্রনাথের লেখা চিঠিতে। কাদম্বরীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ের কথা হচ্ছে শুনে সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞানদানন্দিনীকে লিখেছিলেন বোম্বাই থেকে—

৮জুন ১৮৬৮: শ্যাম গাঙ্গুলির ৮ বৎসরের মেয়ে— আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না। কোন হিসাবে যে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না।

১২ জুলাই ১৮৬৮: শ্যামবাবুর মেয়ে মনে করিয়া আমার কখনই মনে হয় না যে ভালো মেয়ে হইবে— কোনও অংশেই জ্যোতির উপযুক্ত তাহাকে মনে হয় না।

শ্যাম গাঙ্গুলি এবং তাঁর বাবা জগন্মোহন গাঙ্গুলি দুজনেই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী— উচ্চপদস্থ কর্মচারী নন।

এই কথাগুলো রঞ্জন জ্ঞানদানন্দিনীর মুখে বসিয়ে যখন-তখন কাদম্বরীকে গঞ্জনা দেন— সব সময়েই মনে করিয়ে দেন, ছোট লোকের বংশ তাঁর। যেটা ব্যবহার করেন না রঞ্জন সেটা হল, সত্যেন্দ্রনাথেরই বিমূঢ় মন্তব্য, যা তাঁর চিঠিতেই পাওয়া যায়। জ্ঞানদানন্দিনীকে লেখা:

৮ জুন ১৮৬৮: মুম্বই থেকে নতুনের কি মত— তিনি সন্তুষ্ট হইলেই হইল। এই বিবাহের পর বোধ করি নতুনের আর বিলাত যাইবার ইচ্ছা থাকিবে না। একবার সংসারী হইয়া বসিলে আর কি নড়িতে ইচ্ছা করে?

১২ জুন ১৮৬৮ আহমেদনগর থেকে: তুমি লিখিতেছ নতুন হয়তো একজন মনের মতো লোক পাইয়া চিরজীবন সুখে থাকিতে পারেন— তেমন হইলেও পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমার বোধ হয় তাহার বিপরীত হওয়া অধিক সম্ভব এবং সেরূপ হইলে মনে করো দেখি কতদূর পরিতাপের বিষয়। (সত্যেন্দ্রনাথ এর আগে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন

শ্যাম গাঙ্গুলির ৮ বৎসরের মেয়ে— আমি যদি নতুন হইতাম, তবে কখনই এ বিবাহে সম্মত হইতাম না। কোন হিসাবে যে এ কন্যা নতুনের উপযুক্ত হইয়াছে জানি না।

তাঁর পরিচিত ব্যক্তিদের, যাঁরা বিয়ে করে ইংল্যান্ডে শিক্ষার জন্য গিয়েছেন এবং ফিরে এসে অশিক্ষিত, অমার্জিত স্ত্রীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছেন না। তাঁর পরামর্শ ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আগে ইংল্যান্ডে গিয়ে আই সি এস বা ব্যারিস্টারি পাশ করে আসুন। তার পরে বিয়ে করবেন। তাঁর নিজের ক্ষেত্রে, তিনি জানিয়েছেন, তিনি ভাগ্যবান, তাঁর মতো স্ত্রীভাগ্য ক'জনের হয়?')

১২ জুলাই, ১৮৬৮, আহমেদনগর থেকে: তবে নতুনের বিবাহের ধুম লাগিয়া গিয়াছে। হিতেন্দ্র ও নীতীন্দ্রের ভাত, তোমরা বেশ আমোদে আছ। নতুনের বিবাহ দেখিবার তোমার যে এত সাধ ছিল, তাহা পূর্ণ হইল।

অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ: 'বাল্মিকী প্রতিভা'য়

(৫ জুলাই ১৮৬৮ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিয়ে হয়। প্রশান্তকুমার পাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত সংবাদ উদ্ধৃত করে লিখেছেন, '... শুভ বিবাহ সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহসভায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণসকল উপস্থিত ছিলেন। দরিদ্রদের প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করিয়া বিস্তর অর্থ প্রদান করাও হইয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথও 'জীবনস্মৃতি' আর 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে এই নতুন বধূর আবির্ভাব নিয়ে যা লিখেছেন, তার কোথায়ও নিম্নবংশজাত পাত্রীকে অবহেলার চিহ্ন নেই, বরং উল্টোটাই আছে।)

১৬ জুলাই ১৮৬৮, আহমেদনগর থেকে: তবে জ্যোতির বিবাহ তো হইয়া গেল— নতুন বৌকে কি তাহার বেশ মনে ধরিয়াছে? নতুনের বিলাত যাওয়া এই পর্যন্ত— বাবামশায় লিখিয়াছেন সকলেরই কি তোমার মতো বিলাত যাওয়া ঘটে— জ্যোতি কোনও গভর্নমেন্টের কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলে এখানেই তাহার পদের উন্নতি করিতে পারিবে। আর এখন নতুন বৌকে পাইয়া আর কি দ্বীপ দ্বীপান্তরে যাইবার ইচ্ছা থাকিবে?

১৯ জুলাই ১৮৬৮, আহমেদনগর থেকে: নতুন নতুন-বৌকে পাইয়া বুঝি শিক্ষা পরীক্ষা সকলই ছাড়িয়া দিয়াছেন? বিবাহের নূতনত্ব চলিয়া না গেলে পরে অন্য দিকে মন যাইবে না।

এই হে কে, এ বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নন। হেমাঙ্গিনী চরিত্রে অভিনয় করার পর রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে 'হে' বলে ডাকতেন, এবং রবীন্দ্রনাথ সেকথা মেনে নিয়েছিলেন। সজনীকান্তের এমনই দাবি।

জ্যোতিকে জিজ্ঞাসা করিব তাহার কি ইচ্ছা?

সত্যেন্দ্রনাথের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও জ্ঞানদানন্দিনীকে আহমেদনগরে পৌঁছে দিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উৎসাহ পাননি সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রীকে ছেড়ে বা স্ত্রীকে নিয়ে।

প্রাথমিক আপত্তি থাকলেও সত্যেন্দ্রনাথ কাদম্বরী সম্পর্কে আর কোনও বিরূপ মন্তব্য করেছেন বলে কোনও তথ্য নেই। আত্মীয়দের মধ্যে চিঠি লেখালেখিতেও। কাদম্বরীকে অবহেলা/গঞ্জনার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

কাদম্বরীর যে ছবি এঁকেছেন রঞ্জন তাঁর উপন্যাসে তার যাথার্থ্যনিরূপক কোনও তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ছবিটি এরকম: ঠাকুরপরিবারে কাদম্বরী অবহেলিত, নিঃসঙ্গ, বন্ধ্যাত্বের জন্য নিরন্তর গঞ্জনার পাত্রী। যে কাদম্বরী তেতলার ছাদে বাগান তৈরি করেছিলেন, যাকে কবি অক্ষয় চৌধুরি নন্দনকানন আখ্যা দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী কাদম্বরীকে ভারতী গোষ্ঠীর মক্ষিরাণী অভিহিত করেছিলেন, যে কাদম্বরী 'মানময়ী' আর 'এমন কর্ম আর করব না' (অলীকবাবু) নাটকে অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যে কাদম্বরী ঠাকুরপরিবারে বালকবালিকাদের সেবার একমাত্র অবলম্বন— সেই কাদম্বরী অনুপস্থিত রঞ্জনের উপন্যাসে।

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স এখন ১৯। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ফার্স্ট আর্টস পড়ছেন। কিন্তু পড়া শেষ করবেন না।)

২০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮, আহমেদনগর: তুমি আসিবার সময় কি নতুন বৌকে লইয়া আসিতে পারিবে না?— নতুনকে একটু জেদ করিয়া বলিলে তাহার সম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে না।

২৬ অক্টোবর ১৮৬৮, আহমেদনগর: তুমি কি জ্যোতিকে বলিয়া জ্যোতিকে ও নতুন বৌকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পার না? আমি কি

অভিনেত্রী কাদম্বরী রঞ্জনের উপন্যাসে নেই, এমন নয়। কিন্তু কীভাবে আছেন? 'অলীকবাবু' নাটকের মহড়া চলছে। বয়স হয়েছে তাই জ্ঞানদানন্দিনী হেমাঙ্গিনীর পার্ট পাননি, পেয়েছেন কাদম্বরী। হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরছেন জ্ঞানদানন্দিনী। একদিন, মহড়ার সময়, কাদম্বরী দেখলেন, জ্ঞানদানন্দিনী চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর পায়ের কাছে তাঁর

হাঁটুতে হেলান দিয়ে বসে আছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (জ্ঞানদানন্দিনী আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অবৈধ প্রেম রঞ্জনের উপন্যাসের একটি মুখ্য উপকরণ)। যখন কাদম্বরী নাটকের সংলাপ (স্বামিবন্দনা) বলছেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে (রবীন্দ্রনাথ অলীকবাবুর ভূমিকায়), তখন জ্ঞানদানন্দিনীর 'চোখে কী ঘৃণা! কী রাগ! কী ঈর্ষা!'

কাদম্বরীর 'মানময়ী' বা 'এমন কর্ম্ম আর করব না' নাটকের অভিনয় সম্পর্কে অবশ্য সন্দেহাতীত তথ্য নেই, অন্তত প্রশান্তকুমার পাল খুঁজে পাননি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলেতপ্রবাসের আগে একবার মলিয়ের রচিত প্রহসনের জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা নাটকের অভিনয় হয়েছিল জোড়াসাঁকোতে ঘরোয়া মহলে। সেবার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অক্ষয় চৌধুরীর স্ত্রী শরৎকুমারী। হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় কাদম্বরীর অভিনয় প্রসঙ্গ তুলেছিলেন সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে, এমন দাবি সজনীকান্ত করেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ: জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থে'। 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'শ্রীমতী হে'-কে। এই হে কে, এ বিষয়ে কেউ নিশ্চিত নন। হেমাঙ্গিনী চরিত্রে অভিনয় করার পর রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে 'হে' বলে ডাকতেন, এবং রবীন্দ্রনাথ সেকথা মেনে নিয়েছিলেন। সজনীকান্তের এমনই দাবি। অথচ, প্রশান্ত কুমার মহলানবিশ যখন রবীন্দ্রনাথ নিয়ে গবেষণা করছেন, তৈরি করছেন রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী, তখন প্রশান্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেন, শ্রীমতী হে কে? রবীন্দ্রনাথ অনেক ভেবেও বলতে পারেননি, হে কে! প্রশান্তকুমার এই কথা লিখে গিয়েছেন তাঁর ১৯৩২-এর দিনলিপিতে।

'মানময়ী' নাটকে কাদম্বরী কোন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, সে বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, উর্বশীর ভূমিকায়। সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' আত্মজীবনীতে লেখেন শচীর ভূমিকায়। যে ভূমিকাতেই কাদম্বরী অভিনয় করে থাকুন, ইন্দিরা এবং সরলা দুজনেই স্মরণ করেছেন, তাঁদের নতুন মাসিমার অসাধারণ গান গাওয়ার কথা।

জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাইরের তেতলায় থাকতেন, আমাদের সুদ্ধ সব ছেলেপিলেদেরই ভালোবাসতেন ও আদরযত্ন করতেন। রং শ্যামলা ছিল, কিন্তু চোখ বড় ২, মুখশ্রী ভালো ও খুব লম্বা চুল ছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ এবং তারপরে তাঁর কাদম্বরী সম্পর্কে ঔদাসীন্যের কারণেই কাদম্বরী বিষ খেয়ে মরেন, এটা রঞ্জনের উপন্যাসের বিষয় হলেও, তাঁর আত্মহত্যার কারণ হিসেবে অন্যান্যরা যেসব অনুমান করেছেন, রঞ্জন সেগুলোও তাঁর উপন্যাসে এনেছেন। তবে তার মূল বিষয় কাদম্বরী-রবীন্দ্রনাথের প্রেম, ফলে অন্যান্য কারণগুলো ঠিকমতো সাজাতে পারেননি। যেমন, উপন্যাসের উপসংহারে, তিনি কাদম্বরীর চিঠিতে উল্লেখ করা 'আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়' অংশে লিখছেন, দেবেন্দ্রনাথ দায়ী নন (রবীন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছেন বলে), জ্ঞানদানন্দিনী নন (নতুনদাদার যোগ্য স্ত্রী হিসেবে ভাবতে না পারলেও), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন (যাঁর জামার পকেটে এক প্রেমপত্র পাওয়া গিয়েছিল বলে কারওকারও ধারণা)। রঞ্জনের ভাষায়, কাদম্বরী লিখছেন, '... আমি পেলাম এক বিখ্যাত নটীর প্রেমপত্র। সেই প্রেমপত্রের নীচে কোনও নাম ছিল না।' রঞ্জনের খেয়াল নেই, নাম না থাকলে সেটা নটীর প্রেমপত্র বোঝা গেল কী করে?

ইন্দিরা দেবী তাঁর 'জীবনকথা' লেখেন ১৯৫৩-৫৫ সালে। তিনি যদি জানতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ওই পারিবারিক কেচ্ছা অর্থাৎ কাদম্বরী-রবীন্দ্রনাথের প্রেম-সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত, হয়তো খোঁজখবর নিতেন। 'জীবনকথা'-য় প্রসঙ্গটি শেষ হয়েছে এইভাবে:

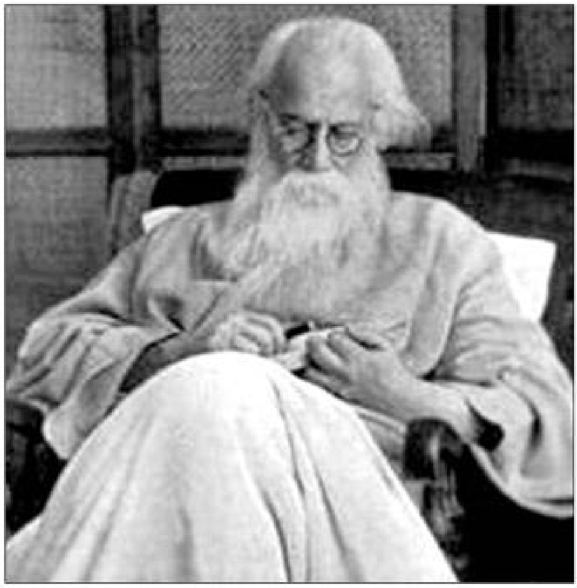

'কথাটা যখন উঠলই, তখন বলে ফেলি যে, জোড়াসাঁকোর আরও ২/১টি বউয়ের এইরকম অঘটন ঘটে। সেটা পরিবারের পক্ষে বড় সুনামের কথা নয়, তাই এ নিয়ে বেশি আলোচনা না করাই ভালো।'

ইন্দিরা দেবী গবেষক নন, তবে তাঁর পরবর্তীকালের গবেষকেরা যাঁরা ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল বা রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন নিয়ে খোঁজখবর করেছেন, তাঁরাও ঠাকুরবাড়িতে অনুরূপ বউদের অঘটন নিয়ে কোনও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। তবে একটা কথা বলতেই হয়। রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে স্মরণীয় করে গিয়েছেন বটে, তবে ইন্দিরা তাঁর নতুন কাকিমাকে নিয়ে খুব যে উচ্ছ্বসিত ছিলেন না, তা বোঝা যায়। প্রসঙ্গটি নিয়ে তাঁর হেলাফেলার ভাব দেখে। 'এক্ষণ'-এর সম্পাদক 'জীবনকথা' মুদ্রণের সময় টীকাতে একটি চিঠির বয়ান উদ্ধৃত করেছেন, যেটার মধ্যে এই হেলাফেলার ভাবটি স্পষ্ট। 'মহিলামহল' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৬৮ সংখ্যায় হেমন্তবালা দেবীকে (১৮৯৪-১৯৭৬) ইন্দিরা লিখেছেন:

'তুমি আমার নতুন কাকিমা কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চেয়েছিলে। কিন্তু রবিকাকার জীবনী প্রভৃতিতে যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশি কিছু আমি বলতে পারব না। কারণ তিনি যখন মারা যান, তখন আমরা বালিকামাত্র। এই পর্যন্ত মনে আছে যে, তিনি হাড়কাটার শ্যামলাল গাঙ্গুলির মেয়ে। আরও দুই বোন ছিল তাদের বোধহয় ঠাকুর গুষ্ঠিতেই বিয়ে হয়েছিল। তাঁর অল্প বয়সেই জ্যোতিকাকামশায়ের সঙ্গে বিয়ে হয় এবং জোড়াসাঁকোর বাড়ির বাইরের তেতলায় থাকতেন, আমাদের সুদ্ধ সব ছেলেপিলেদেরই ভালোবাসতেন ও আদরযত্ন করতেন। রং শ্যামলা ছিল, কিন্তু চোখ বড় ২, মুখশ্রী ভালো ও খুব লম্বা চুল ছিল। ছবি 'ছেলেবেলা' বইয়ে আছে। লেখাপড়া বেশি কিছু জানতেন বোধ হয় না। শুনেছি কাকামশায়ের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়েও বেড়িয়েছেন। ছেলেপিলে হয়নি। শুনেছি অল্প বয়সেই আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু কারণটা পরিষ্কারভাবে কখনও শুনিনি। আর এখন শুনেই বা লাভ কি?'

বই-ঠেক

নতুন বই

মণীন্দ্র গুপ্ত-এর
'কবিতা সংগ্রহ'

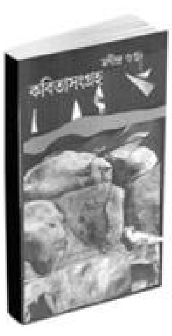

মণীন্দ্র গুপ্ত এমন এক নক্ষত্র যিনি বাংলা কবিতার আকাশে শুক্লপক্ষের নির্ভাজ রাতেও বেছে নেন কোনও নিরীহ মেঘের আড়ালে নিরালা আসনটুকু। কেবল তাঁর কবিতার দৃঢ় স্বরক্ষেপ যখন ভেসে আসে সেই অন্ধকার থেকে, বোঝা যায় স্বেচ্ছানির্বাচিত অন্তরাল আসলে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিণতি। কলকাতা এই কবিকে বিশেষ পায় না। মিডিয়ালালিত কবিকৃতির খেলাঘরে তিনি নেই। ফলে একলা আকাশে তাঁর স্যাটেলাইটের সংখ্যাও নেহাত কম। তিনি একাই জ্যোতিষ্মান হয়ে উত্তর-ফাল্গুনী বাতাসে দপদপ করেন।

মণীন্দ্র গুপ্ত বলতেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'অক্ষয় মালবেরি'র কথা মনে পড়বে। মনে পড়বে আমাদের পৃথিবীর খুব কাছে যেদিন চলে এসেছিল মঙ্গলগ্রহ, সেদিন রাতে এই মহাজাগতিক ঘটনাটি নিয়ে লেখা তাঁর অনবদ্য কবিতাটি, কিংবা অন্য আর-একটি, যাতে রাজপথের ধারে অল্প ঝোপজঙ্গলের মধ্যে গৃহস্থের রেখে যাওয়া বিসর্জিত দেবমূর্তির কথা তিনি লিখেছেন, কবিতার অন্তে যে নিঃসঙ্গ মৃন্ময় দেবতা তাঁর অলংকার, জৌলুস, অঙ্গাদি হারিয়ে শেষপর্যন্ত শরীরকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন। উপস্থাপনার গুণে এসব কবিতা মহাকালের সিন্দুকে চলে গিয়েছে।

যদিও অনেকবার পড়া, তবু ঘুরেফিরে বারবার পড়তে ভালোবাসি তাঁর ১৯৯২ সালে বেরনো এক অসামান্য কাব্যগ্রন্থ 'শরৎমেঘ ও কাশফুলের বন্ধু'। 'তিব্বতী' শীর্ষক কবিতা দিয়ে বইয়ের সূচনা হলেও প্রত্যেকবারই বেশ কয়েকটি পাতা উজিয়ে সম্মোহিতের মতো ছুটে যাই বইটির একটি বিশেষ কবিতার কাছে। কবিতাটির নাম 'মোমবাতি'। প্রথমে ওই কবিতা, তারপর একে একে বাকিরা। মোমবাতি যেন এই বইয়ের ধ্রুবতারা।

বুদ্ধদেব বসু একসময় নাকি বলতেন, বাইরে বেরিয়ে তাঁর চোখে যা কিছু পড়ছে, তার সবেরই মধ্যে রূপকার্থ খুঁজে পাচ্ছেন।

অগ্রজ কবির এই মন্তব্যটি পাঠকের মনে আসবেই, 'মোমবাতি' কবিতাটির প্রথম কয়েকটি লাইন পড়লে।

> এই মোমবাতি এক জটিল উদ্ভিদ।
> বিধবা মায়ের মতো রান্নাঘরে চোখের
>   জল ফেলতে ফেলতে
> সে ক্ষয়ে যায়।

এরপর কবির কাছে সেই মোমবাতি কখনও

পৌরাণিক উপমাকে এইরকম অনায়াসে তিনি নগরীর পথে ছেড়ে দেন।

ঈর্ষাপরায়ণ ছোট-জায়ের মতো ফিক করে হেসে বাঁশবনে অদৃশ্য হয়ে যায়, কখনও গির্জায় ধর্মীয় সঙ্গীতের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে গোটা কবিতা জুড়ে।

কত অদ্ভুত এবং তুচ্ছ বিষয় তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে ওঠে, কত সাধারণ ঘটনা থেকে তিনি অসাধারণ হয়ে ওঠা কবিতার রসদ পান, সেকথা ভাবলে অবাক লাগে। একই সঙ্গে অদ্ভুত সুরে বাজতে থাকে তাঁর ইতিহাস ও সমাজ-চেতনা। যেমন, 'হাতি' কবিতাটি। গারো পাহাড়ে হাতিদের রাজপাটে উপনিবেশ গড়ে তুলল মানুষ-রাজা। হাতিরা হয়ে গেল ক্রীতদাস। সেই ইতিবৃত্ত চলল বছরের পর বছর। তারপর রাজা-রাজত্ব সবই গেল। পড়ে রইল কেবল নিঃসঙ্গ গারো পাহাড়।

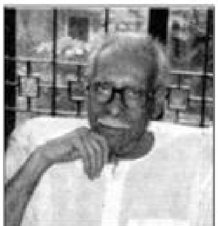

মণীন্দ্র গুপ্ত

মদকল মত্ত হাতিরা একদা তাদের বিশাল মাথা
দিয়ে ধাক্কা দিত পাথরে
এখন অন্ধকার থেকে শুধু সূর্যের সিঁদুরমাখা
মাথা বেরিয়ে এসে
শিখরের পর শিখরে আঘাত করে ভোরবেলা।

এইভাবে সার্থক কবিতা হয়ে ওঠার সঙ্গেই মণীন্দ্র গুপ্তর কবিতারা সফল গল্পও হয়ে যায়। তাঁর পুরাণবোধ মিশে যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানে (ভবতারিণী), কখনও শিবকে তিনি পেড়ে আনেন মর্ত্যপৃথিবীতে। লেখেন:

ছেলেটা বগল বাজিয়ে ভিক্ষে চাইল বলে, হঠাৎ
বুঝতে পারলাম
ও ভিখিরি, কিন্তু ওর মধ্যে শিবের অংশ আছে।
এইভাবেই ভস্মে ঢাকা থাকে সেই দেবরহস্য।

পৌরাণিক উপমাকে এইরকম অনায়াসে তিনি নগরীর পথে ছেড়ে দেন। এই ধারাবাহিকতায় আমাদের সাজিয়ে তোলা সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসও লজ্জা পাইয়ে দেওয়া বাস্তবতায় আঘাত করে এইভাবে:

চতুর্দশী পেরিয়ে পূর্ণিমা যখন আমার
কাছে এল, আমি
ভাবতে লাগলাম ওকে কোথায় বসাই:
পূর্ণিমা সিং হলে ও যাবে গুরু
বিপিন সিংহের নর্তনালয়ে
নাচ শিখতে।
পূর্ণিমা বিশ্বাস হলে ও ঝাউতলা বস্তি
থেকে উষায় বেরিয়ে
যাবে ঝি খাটতে।
পূর্ণিমা বাগচী হলে ও স্বামীর সঙ্গে যাবে কানাডা।
পূর্ণিমা সর্দার হলে বিপক্ষ পার্টির লোকেরা ওকে
ধানকাটার মরসুমে
বলাৎকারের জন্য টেনে নিয়ে যাবে। (পূর্ণিমা)

ফি রে প ড়া ব ই

আর্থার মিলার-এর

'ডেথ অব এ সেলসম্যান'

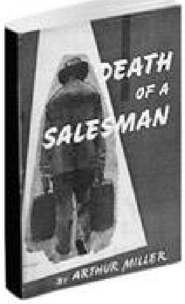

মার্কিন নাট্যকার আর্থার মিলারের এই নাটকটির পটভূমি গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শেষদিকে ভোগবাদের দিকে যাত্রা করা আমেরিকান সমাজ এবং সেই সমাজের মানুষের জটিল মনস্তত্ত্ব। নাটকটি লেখা শেষ হয় ১৯৪৯-এ। সে বছরই এটি নাটক বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কার পায়। তারপর থেকে ইংল্যান্ডের ব্রডওয়ে সহ সারা পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। নাটকটির ভিত্তিতে টেলিভিশনের জন্য নির্মিত একই নামের একটি ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন হলিউডের অভিনেতা ডাস্টিন হফম্যান। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে এই নাটকের প্রযোজনা করেছেন নান্দীকার, 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' শিরোনামে।

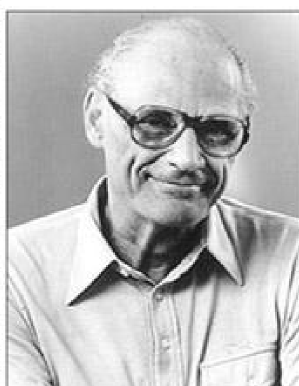

আর্থার মিলার

'ডেথ অব এ সেলসম্যান' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ষাট বছরের উইলিয়াম লোম্যান। পেশায় তিনি সেলসম্যান। স্ত্রী ও দুই ছেলে বিফ এবং হ্যাপিকে নিয়ে তার সংসার। বিফ এবং হ্যাপি পড়াশুনোর সূত্রে অন্যত্র থাকে। বিফ যদিও পরীক্ষা না দিয়ে বছর নষ্ট করেছে। কিন্তু আপাতত তারা দুজনেই নিজেদের বাড়িতে ফিরেছে কয়েকদিনের জন্য। নাটকের শুরুতেই দেখা যায় নিজের কর্মক্ষেত্র থেকে অবসন্ন দেহে বাড়ি ফিরেছেন উইলিয়াম। সেলসম্যান হিসেবে তাঁকে অনেকটা দূরত্ব যাতায়াত করতে হয়। স্ত্রী লিন্ডা তাঁর শারীরিক অবস্থা লক্ষ করে উইলিয়ামকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যাতে তিনি তাঁর অফিসের বস হাওয়ার্ড ওয়াগনারকে বলে কর্মক্ষেত্রটা নিজের বাড়ির কাছাকাছি পরিবর্তন করে নিতে পারেন।

উইলিয়ামের অভ্যেস একা একা নিজের মনে কথা বলে যাওয়ার। বিফ ভবিষ্যতে কীভাবে জীবনধারণ করবে তাই নিয়ে সবসময় তিনি চিন্তামগ্ন থাকেন। ছেলেদের ঘরে গিয়ে তাদের অনর্থক সময়ের অপব্যয় করতে দেখে উইলিয়াম রেগে যান। তখন তাঁকে শান্ত করতে হ্যাপি তড়িঘড়ি বলে ওঠে, আগামীকালই বিফ তার একটি নতুন ব্যবসার প্রস্তাবনা নিয়ে কিছু প্রভাবশালী লোকের কাছে যাবে। উইলিয়াম এতে খুশি হন।

পরদিন বসের কাছে হাজির হয়ে তাঁকে যাতে বাড়ির কাছাকাছি কাজ দেওয়া হয় সেজন্য তদ্বির করেন উইলিয়াম। বস পাল্টা জানিয়ে দেন উইলিয়ামের বয়স হয়েছে, ফলে এখন তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। কোম্পানিতে তাঁর মতো পুরনো লোকের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। চাকরিটি খুইয়ে হতাশ উইলিয়াম নতুন একটি চাকরির সন্ধানে প্রতিবেশী চার্লির অফিসে যায় এবং সেখানে তার সঙ্গে দেখা হয় চার্লির ছেলে, সফল আইনজীবী বার্নার্ডের। বার্নার্ড বিফের 'সামার স্কুল'-এর সহপাঠী। উইলিয়ামকে বার্নার্ড জানায়, সামার স্কুলে বিফ পড়াশুনো করছিল ভালোভাবেই, কিন্তু একবার বস্টনে উইলিয়ামের সঙ্গে দেখা করে স্কুলে ফিরে আসার পরই সে যেন বদলে গিয়েছিল। পরীক্ষা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

অন্যদিকে বিফ তার বাণিজ্য-প্রস্তাব নিয়ে এক পুরনো যোগসূত্র ধরে কোনও এক বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাকে না-চেনার ভান করলেন। সারাদিনের ব্যর্থ ঘটনাপ্রবাহে হতাশ বাবা ও ছেলে, সেইসঙ্গে হ্যাপিও, সন্ধ্যায় মিলিত হয় এক রেস্তোরাঁয়।

এলিয়া কাজান নির্দেশিত 'ডেথ অব এ সেলসম্যান'-এর প্রথম প্রযোজনার একটি দৃশ্য

উইলিয়াম নিজে ব্যর্থ, তবু ছেলে বিফের কাছ থেকে সাফল্যের কথা ছাড়া আর যে কিছু শুনতে চান না সেটাও স্পষ্ট করে দেন। হ্যাপি অন্যদিকে চায়, বাবা যাতে খুশি হয়, সেরকম একটা মিথ্যে বলুক বিফ। বিফ তার কাছে সবিস্তারে বলে যায়, উইলিয়াম কতটা রাগী মানুষ, তার কতটা পরিচয় সে কীভাবে পেয়েছে সেইসব। বলতে বলতে সে ডুব দেয় তার স্মৃতিতে। তার চোখে ভাসে বস্টনের সেই হোটেল, যেখানে কার্যোপলক্ষে উঠেছিলেন উইলিয়াম। আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে উইলিয়ামের যে এক বান্ধবী আছেন এবং দুজনের মধ্যে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক আছে, তা আবিষ্কার করে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল বিফ। বাবার সম্পর্কে উঁচু ধারণাটাই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল সেই মুহূর্তে।

উইলিয়ামের যে এক বান্ধবী আছেন এবং দুজনের মধ্যে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক আছে, তা আবিষ্কার করে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল বিফ। বাবার সম্পর্কে উঁচু ধারণাটাই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল সেই মুহূর্তে।

সেইসব তিক্ত কথা মনে পড়ায় আচমকা ছিটকে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসে বিফ। পিছন পিছন ভাই হ্যাপিও, সদ্য পরিচয় হওয়া দুই বান্ধবীকে নিয়ে। একা এক বিরাট শূন্যতা মাথায় নিয়ে রেস্তোরাঁর টেবিলে বসে থাকেন উইলিয়াম। বাড়িতে ফিরলে লিন্ডা ছেলেদের বকাবকি করতে শুরু করেন উইলিয়ামকে একা রেখে চলে আসার জন্য। পাশের ঘরে উইলিয়াম নিজের মনে কথা বলে যেতে থাকেন। নিজের আচরণের জন্য অনুশোচনা হওয়ায় বিফ উইলিয়ামের কাছে যায়, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, উইলিয়াম তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেন তা পূরণ করার সামর্থ্য তার নেই, সে এতটাই সাধারণ। শুধু সে একাই নয়, উইলিয়ামও খুব সাধারণ একজন মানুষ। অনেক বড় স্বপ্ন দেখার উপযোগী তারা কেউ নয়। চোখে জল নিয়ে বিফ বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকে, উইলিয়াম যেন তাঁর অবাস্তব স্বপ্নের নাগপাশ থেকে তাকে মুক্তি দেন।

বিফ কী বলতে চায় তা সম্যক না বুঝে, উইলিয়াম ভাবলেন, ছেলে তাঁকে বুঝি তাঁর পুরনো স্খলনের জন্য ক্ষমা করে দিয়েছে, এবার বুঝি তাঁর কথা মেনে মন দিয়ে ব্যবসা শুরু করবে। পরদিন উইলিয়াম স্বেচ্ছায় নিজের গাড়ির দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মারা যান যাতে বিমার টাকা পেয়ে বিফ সেই টাকায় ব্যবসা শুরু করতে পারে। যাতে আমেরিকার নব্য অর্থনীতিতে স্বচ্ছন্দে গা ভাসিয়ে দিতে পারে। যদিও উইলিয়ামের শেষকৃত্যে বিফ ব্যবসাজীবী না হওয়ারই সিদ্ধান্ত নেয়। উইলিয়ামের দেখানো পথে হাঁটে হ্যাপি।

টনি মরিসন-এর

'সং অব সলোমন'

নোবেলপ্রাপক লেখিকার ১৯৭৭ সালের উপন্যাসটি একসময় অনেক বিতর্কের ঝড় তুলেছে। নব্বইয়ের দশকে আমেরিকার স্কুলে বইটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তারপরও বইটি পেয়েছে অনেক পুরস্কার। এমনকি সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার পছন্দের

টনি মরিসন

৪০টি উপন্যাসের তালিকাতেও স্থান হয়েছে এই উপন্যাসের।

মিশিগান শহরের এক বিমা-দালাল রবার্ট স্মিথ উড়তে পারে এই দাবি করে পিঠে নীল সিল্কের ডানা লাগিয়ে মার্সি হাসপাতালের ছাদ থেকে লাফ দেয়। তার দাবি ছিল উড়ে সে সুপিরিয়র লেকের অন্য পাড়ে গিয়ে উঠবে। তার বদলে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে মারা যায়। পরদিন সেই হাসপাতালেই এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন শহরের একমাত্র কালো চামড়ার চিকিৎসকের কন্যা রুথ ফস্টার ডেড। শিশুটির নাম রাখা হয় মিল্কম্যান ডেড।

মাত্র চার বছর বয়সেই মিল্কম্যান নিজের এবং তার আশপাশের লোকজনের সম্পর্কে সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলে যখন তার প্রাথমিক জ্ঞানগম্যির ফলে সে বুঝতে পারে, মানুষের মধ্যে ওড়ার কোনও ক্ষমতাই নেই। যদিও সে তার মা এবং পিসি পাইলেট, দুই বোন— প্রথম করিন্থিয়ানস ও ম্যাগদালিন এবং পরবর্তীকালে তার পিসতুতো বোন তথা প্রেমিকা হ্যাগারের ভালোবাসা ও সাহচর্যে বেড়ে উঠতে থাকে, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তার অনুৎসাহও বাড়তে থাকে। ক্রমশ সে হয়ে উঠতে থাকে নিষ্ঠুর, অনেকটা তার বাবা দ্বিতীয় মেকন ডেড-এর মতো। জুনিয়র মেকন একজন নির্মম জমিদার, যেনতেন প্রকারে সম্পদ আহরণ করাই তার জীবনের লক্ষ্য।

মিল্কম্যানের ঠাকুর্দা প্রথম মেকন ডেডও জমিদার ছিলেন। নিজের জমি দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দেন। সেই হত্যাকাণ্ড লুকিয়ে দেখে ফেলে মিল্কম্যানের বাবা মেকন জুনিয়র এবং পিসি পাইলেট। ঘটনাটি তাদের মনে গভীর ছাপ ফেলে যায় এবং ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় দুই ভাইবোন। পাইলেট খুব দরিদ্র অবস্থায় পড়েন কিন্তু একজন স্বাধীন ও শক্ত মনের নারীতে পরিণত হন। মেয়ে রেবা এবং নাতনি হ্যাগারকে নিয়ে তার সংসার।

মিল্কম্যানের বয়স যখন বত্রিশ, তখন নিজের বাবা-মায়ের শাসনে থাকা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল এবং সে পালিয়ে যাবে বলে মনস্থ করল। তার বাবা মেকন জুনিয়র তখন তাকে বলেন, তার অনুমান তার বোন পাইলেটের বাড়িতে অনেক লুকোনো সোনাদানা আছে। মিল্কম্যান পাইলেটের বাড়িতে ডাকাতি করবে বলে ঠিক করে। সঙ্গে নেয় বন্ধু গিটার বেইন্সকে। কিন্তু অনেক তল্লাশি করে পাইলেটের বাড়ি থেকে যা পাওয়া গেল তা হল কিছু পাথর আর একটি নরকঙ্কাল। এই কঙ্কালটিই জুনিয়র মেকন ও পাইলেটের বাবা প্রথম মেকন ডেড-এর।

মেকনের পেনসিলভ্যানিয়ার খামার-বাড়িতেও হানা দিল মিল্কম্যান ও গিটার। সেখানে যাওয়ার আগে হ্যাগারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করল মিল্কম্যান। হ্যাগার এতে এতই ভেঙে পড়ল যে বেশ কয়েকবার মিল্কম্যানকে শারীরিকভাবে আঘাত করার ব্যর্থ চেষ্টাও করল। এদিকে পেনসিলভ্যানিয়ায় এসেও উদ্দিষ্ট সোনাদানা কিছুই পাওয়া গেল না। কিন্তু এখানেই মিল্কম্যানের সঙ্গে দেখা হল সারকি নামে এক প্রবীণা ধাই-এর যিনি মেকন জুনিয়র ও পাইলেটের জন্মের সময় সাহায্য করেছিলেন। সারকি তাকে জানালেন প্রথম মেকনের আসল নাম ছিল জেক এবং তিনি বিবাহ করেছিলেন সিং নামে এক ভারতীয় রমণীকে।

নিজের পরিবারের ইতিহাস খুঁজে পেয়ে উদ্দীপ্ত মিল্কম্যান চলে এল ভার্জিনিয়ার শালিমারে তার ঠাকুর্দার পৈতৃক ভিটেয়। এদিকে সে জানে না যে ক্ষুব্ধ গিটার তাকে গোপনে অনুসরণ করছে। গিটারের ধারণা, ইতিমধ্যেই সমস্ত সোনাদানা হাতিয়ে নিয়ে মিল্কম্যান তাকে বঞ্চিত করেছে। শালিমারে এসে মিল্কম্যান জানতে পারে তার ঠাকুর্দার বাবা সলোমন এখানে একজন কিংবদন্তি। আমেরিকায় দাসত্বের জীবন থেকে তিনি পালিয়েছিলেন আকাশপথে। ফিরে গিয়েছিলেন স্বদেশ আফ্রিকায়। কিন্তু স্ত্রী রাইনা ও তাঁদের একুশটি সন্তানকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি। রাইনা পাগল হয়ে যান। জেক বেড়ে উঠতে থাকে এক ভারতীয় রমণী হেডির কাছে। পরে এই হেডির মেয়ে সিং-কে বিয়ে করে।

নিজের পরিবারের পুনরাবিষ্কার মিল্কম্যানকে এক আশ্চর্য তৃপ্তি দেয়। বাবা এবং পিসিকে সে-কাহিনি বলার জন্য সে বাড়িতে ফিরে আসে। এসে দেখে ভগ্নহৃদয় হ্যাগার মারা গিয়েছে। অতঃপর পাইলেটকে সঙ্গে নিয়ে মিল্কম্যান ফিরে আসে শালিমারে। যে পাহাড় থেকে আফ্রিকার দিকে রওনা দিয়েছিল সলোমনের উড়ান সেখানেই ঠাকুর্দা জেক-এর অস্থিগুলি কবরস্থ করে মিল্কম্যান।

ইতিমধ্যে সেখানে হাজির হয় গিটার। মিল্কম্যানকে লক্ষ্য করে তার ছোড়া গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাইলেটকে আঘাত করে এবং পাইলেট সেখানেই মারা যান। হতচকিত মিল্কম্যান গিটারের নাম ধরে চিৎকার করতে করতে তার পিছু ধাওয়া করে।

পার্ল এস বাক-এর

'দ্য গুড আর্থ'

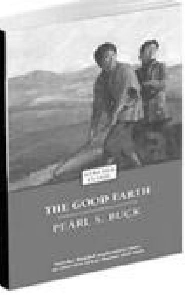

দীর্ঘকাল চিনপ্রবাসী সাহিত্যে নোবেলজয়ী মার্কিন লেখিকা পার্ল এস বাকের এই উপন্যাসটি প্রকাশ পায় ১৯৩১ সালে। আর তারপর গোটা ১৯৩১ ও তার পরের বছর জুড়ে আমেরিকার সর্বাধিক বিক্রিত উপন্যাস ছিল 'দ্য গুড আর্থ'। ১৯৩২ সালে বইটি পুলিৎজার পুরস্কার পায়। ১৯৩৮-এ বাক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

'দ্য গুড আর্থ' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে চিনের প্রত্যন্ত গ্রামের এক গরিব কৃষক ওয়াং লাং। যেসময়ের কথা উপন্যাসে বিধৃত, সেসময়টায় চিন ক্রমশ আধুনিক সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ঐতিহ্য-পরম্পরার শিকড়ের টানও ভুলতে পারছে না। এমনই একটা পরিবর্তনের দিনকালে ওয়াং লাং বিবাহযোগ্য বয়সে পৌঁছল। তার বাবা স্থানীয় ধনী হোয়াং পরিবারের দ্বারস্থ হলেন, যদি তাঁরা তাঁদের কোনও বিবাহযোগ্যা দাসীকে ওয়াং-এর কনে হিসেবে বিক্রয় করেন। তখনও চিনে দাস কেনাবেচার প্রথা ছিল। হোয়াংরা তাঁদের দাসীদের মধ্য থেকে কুড়ি বছরের এক তরুণীকে ওয়াংয়ের বাবার কাছে বিক্রয় করে। তরুণীটির নাম ও-ল্যান। কিন্তু ওয়াংয়ের তাকে ঠিক পছন্দ নয়। কেন-না, সেসময় চিনে তরুণীদের পায়ের গঠন সুশ্রী করার জন্য পা বেঁধে রাখার চল ছিল। কিন্তু ও-ল্যানের পা বাঁধা ছিল না। তবু তারা বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়ল।

দুজনে তাদের ছোট খেতটুকুতে চাষাবাদ করে। ও-ল্যান গর্ভবতী হয় এবং একটি পুত্রসন্তান হয় তার। অন্যদিকে হোয়াং-পরিবারের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। পরিবারটির কর্তা নারীলোলুপ, কর্ত্রী আফিমের নেশায় বুঁদ। সব মিলিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানায় থাকা উর্বর জমির একাংশ না বেচে উপায় থাকে না। ওয়াং সেই জমি কিনে নেয় এবং প্রাণমন ঢেলে চাষ করে প্রচুর রোজগার করে। ও-ল্যান

১৯৩৭-এ মুক্তিপ্রাপ্ত হলিউডের ছবি 'দ্য গুড আর্থ'-এ পল মুনি এবং লুইজ রেইনার

আরেকটি পুত্রের জন্ম দেয়। ইতিমধ্যে ওয়াংয়ের সম্পদশালী অবস্থা দেখে তার অলস এবং লোভী কাকা তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু সেইসময়কার চিনের সামাজিক মূল্যবোধের কারণে, সব জেনেও ওয়াং তার কাকাকে অর্থসাহায্য করে যেতে থাকে। ইতিমধ্যে হোয়াংদের আরও কিছু জমি সে কিনে নিয়েছে এবং ও-ল্যান একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেছে।

এইসময়ই গোটা দেশজুড়ে খরা আর দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেল। তারই মধ্যে আরেকটি কন্যাসন্তান হল ও-ল্যানের। কিন্তু খাবারের অভাবে হতাশায় জন্মের পরই তাকে হত্যা করল ও-ল্যান। শীতে গ্রামে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠলে পরিবার সহ ওয়াং চলে এল দক্ষিণ চিনের এক শহরে। সেখানে ও-ল্যান ও বাচ্চারা ভিক্ষে করে আর ওয়াং রিকশা চালায়। আর কোনওদিন যথেষ্ট অর্থোপার্জন করে গ্রামে ফিরে যেতে পারবে কিনা তাই নিয়েই সংশয় জমা হতে থাকে ওয়াং এবং ও-ল্যানের মনে। কিন্তু তারই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে। শহরের এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করতে যাচ্ছিল অভুক্ত মানুষ। ওয়াং তাদের দলে জুটে যায় এবং অনেকগুলি সোনার মোহর ডাকাতি করে আনে। এই অর্থের ওপর ভরসা করে তারা আবার গ্রামে ফিরে আসে এবং একটি নতুন বলদ আর বীজ কিনে নব উদ্যমে চাষবাস শুরু করে দেয়। হোয়াংদের মালিকানায় থাকা আরও তিনশো একর জমি কিনে নেয় ওয়াং। ও-ল্যান এবার দুটি যমজ সন্তানের জন্ম দেয়। কিন্তু তারপরই ধরা পড়ে তাদের বড় মেয়েটি মানসিক প্রতিবন্ধী। এইভাবে বেশ কিছুদিন যায়। ওয়াং সম্পদশালী জমিদার হয়ে ওঠে। তার সংগ্রহেও এখন অনেক মুনিষ আর দাসদাসী। সহসা প্রবল বন্যায় ভেসে যায় চিন। চাষের কাজ কমে যায় সাময়িকভাবে। হাতে কাজ না থাকায় ওয়াং-ও কিছু অলস হয়ে পড়ে, আর টানাপোড়েনের জীবনে সেই প্রথম বোধহয় স্ত্রীর দিকে তাকানোর সুযোগ পায়। ও-ল্যানকে তার কুশ্রী মনে হতে থাকে, বিশেষত তার ছড়ানো বড় পায়ের পাতার জন্য। বিপরীতে লোটাস নামে এক সুন্দরী তরুণীর প্রতি তার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। লোটাসকে সে তার উপপত্নীর মর্যাদা দেয়। কিন্তু এইসময় নাগাদই ও-ল্যান অসুখে পড়তে চোখ খুলে যায় ওয়াংয়ের। তার জীবনে ও-ল্যানের অবদান সে বুঝতে পারে। তার দুচোখ জলে ভরে যায়। ও-ল্যানকে বলা প্রতিটি খারাপ কথার জন্য সে অভিশাপ দিতে থাকে নিজেকে। হোয়াং পরিবারের বাড়িটিও কিনে নেয় ওয়াং। আর অসুস্থ ও-ল্যান ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে সেখানেই বাস করতে শুরু করে। পুরনো বাড়িটি দিয়ে যায় কাকার পরিবারকে।

> ও-ল্যান অসুখে পড়তে চোখ খুলে যায় ওয়াংয়ের। তার জীবনে ও-ল্যানের অবদান সে বুঝতে পারে। তার দুচোখ জলে ভরে যায়। ও-ল্যানকে বলা প্রতিটি খারাপ কথার জন্য সে অভিশাপ দিতে থাকে নিজেকে।

ও-ল্যান মারা যায়। ওয়াংয়ের ছেলেরাও বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা কেউ আর চাষের কাজ করতে চায় না। অর্থকরী বিষয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের ঝগড়া লেগেই আছে। ওয়াং বুড়ো হয়ে পড়েছে। পিয়ার ব্লসম নামে এক তরুণী দাসীকে সে উপপত্নীর মর্যাদা দিয়ে মানসিক প্রতিবন্ধী কন্যাটির দেখাশুনোর ভার সঁপে দেয় তার ওপর।

পার্ল এস বাক

শেষপর্যন্ত ওয়াং-এর ছেলেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরিবারের জমি বিক্রি করে টাকা পয়সা ভাগাভাগি করে নেয়। জমির সঙ্গেই যেন মুছে যায় ওয়াং ও ও-ল্যানের সংঘর্ষময় জীবনের শেষ স্মৃতিচিহ্নটুকুও।

কুশীলব উপাধ্যায়

এই কলামটির বিষয় কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত হবে সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

২

ফিয়ার্স লেন

'হাইড্র্যান্ট খুলে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল' জীবনানন্দ দাশের 'রাত্রি' কবিতাটি আমার বরাবরই খুব প্রিয়, বহুবার পড়ি কবিতাটির শব্দ আর চিত্রকল্পের টানে টানে, কবিতাটি পড়া শেষ করে এক অন্য উপলব্ধি। সেই কবিতা একটু এগোতেই যে-পঙক্তিগুলি খুব বিদ্ধ করত তা হলঃ

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটিবাজারে
চীনাবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে।

নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় একেবারে আকস্মিকভাবে আমার বদলি হয়েছিল সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে। আমার অফিস ছিল ডা. বিধান রায়ের বাড়ির ঠিক পিছনেই, কিন্তু সেই বাড়ি ছেড়ে দিতে হয় হাইকোর্টের এক আদেশবলে, আইনানুযায়ী অধিগ্রহণের সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ায়।

বলা যায় উদ্বাস্তু হয়ে তখন ঘুরছি অফিসের যাবতীয় ফার্নিচার ও অফিসার-স্টাফদের নিয়ে। তখন সরকার থেকে আমাদের বলা হল সিভিল ডিফেন্সের হেড অফিসে দুটো ঘরে আপাতত অফিস চালাতে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও নতুন বাড়ি খুঁজে পাওয়া যায়। ঘটনাক্রমে সিভিল ডিফেন্সের হেড অফিস ফিয়ার্স লেনে। একতলা ও দোতলায় সিভিল ডিফেন্স, তিন থেকে পাঁচতলা সবটাই পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিস। এই শেষোক্ত অফিসটির কল্যাণে বহু মানুষ এই বাড়িটি চেনেন, মেট্রো রেলের সেন্ট্রাল স্টেশনে নেমে যে-রাস্তাটা চলে গিয়েছে পোদ্দার কোর্ট পেরিয়ে লালবাজারের দিকে, সেই রাস্তায় ঢুকে চার-পাঁচটা বাড়ি পরেই প্রায় জাহাজ-প্যাটার্নের এই অট্টালিকাটি সারাদিনই গমগম করে বহু সরকারি কর্মীর উপস্থিতিতে।

সেই বাড়িরই দোতলার একটি ঘরে পাতা হল আমার বসার চেয়ার-টেবিল। বাঁদিকে একটি জানালা, উঁকি দিলেই দেখা যায় নাতিপ্রশস্ত একটি রাস্তা, সেই রাস্তার নাম জানা হয়ে গেল ফিয়ার্স লেন।

ফিয়ার্স লেন! মানে জীবনানন্দ দাশের কবিতায় হাজারবার পড়া সেই ফিয়ার লেন! তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে গিয়ে দাঁড়াই জানালার কাছে, ভিড়ভর্তি সেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে হল, এই রাস্তা দিয়েই তা হলে কোনও একদিন হেঁটে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাস!

আমি তৎক্ষণাৎ শরীরে অনুভব করি এক অদ্ভুত শিহরন, কী আশ্চর্য, সেই বিখ্যাত রাস্তার ওপরেই তাহলে আমার এখনকার নিত্যদিনের অফিস-করা!

সারাদিন টেবিলে জমা হওয়া অজস্র ফাইলে স্বাক্ষর ও নোটানুটি করার অবকাশে বারবার চোখ পড়ে রাস্তাটার দিকে। মনের কোনায় উসকোয় কে এই ফিয়ার্স! ইংরেজ আমলের কোনও একজন সাহেব নিশ্চিত। কিন্তু কী তাঁর পরিচয়!

অতএব উল্টোতে থাকি ইতিহাসের পৃষ্ঠা, খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাই কলকাতা হাইকোর্টের পিউনি বিচারক স্যার জন বড ফিয়ারের নাম। ফিয়ার্স নন, ফিয়ার। এই ফিয়ারের বানান পি এইচ ই এ আর। তারপর নিশ্চয় একটি অ্যাপস্ট্রফি এস দিয়েই রাস্তার নাম ফিয়ার্স লেন। কলকাতায় আসার আগে ফিয়ার সাহেব ছিলেন কেমব্রিজের ক্লেয়ার কলেজের ফেলো লেকচারার ও সিনিয়র মডারেটোর। আঠারোশো চুয়ান্ন সালে ইনার টেম্পল বার-এ শুরু করেন তাঁর বিচারকের জীবন। তারপর চলে আসেন কলকাতায়, আঠারোশো চৌষট্টি থেকে আঠারোশো ছিয়াত্তর পর্যন্ত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। অতঃপর সিংহলের প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ায় কলকাতা ছেড়ে চলে যান, কিন্তু রেখে যান এ দেশের প্রতি তাঁর বহু অবদান। তিনি

এতটাই সহৃদয় ছিলেন যে, তৎকালীন বাঙালিরা তাঁকে দেখতেন সম্ভ্রমের চোখে। নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে লেখালেখি হত, তাতে বলা হত তিনি ছিলেন দেশীয় মানুষদের বন্ধু ও হিতৈষী। তাঁকে ভারতবন্ধুও বলা হত সেসময়। বিচারপতি হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ ও নির্ভীক। তাঁর আরও একটি পরিচয় ছিল তিনি একজন সুগণিতজ্ঞ। তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, একবার পার্লামেন্টের সভ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তখনকার বাঙালি সমাজ চাঁদা তুলতে শুরু করেন, কেননা তখন পার্লামেন্টের সভ্য হতে গেলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হত। কিন্তু বাঙালি সমাজের সেই চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি, তিনি পরাজিত হয়েছিলেন সেই নির্বাচনে।

আঠারোশো ছিয়াত্তরে, তাঁর ফেয়ারওয়েল মিটিং অনুষ্ঠিত হয় মনমোহন ঘোষের সার্কুলার রোডের বাড়িতে। মহারানি স্বর্ণময়ী ও নদিয়ার ভুবনেশ্বরীর উদ্যোগে লেডি ফিয়ারকে একটি মানপত্র উপহার দেন কলকাতার মহিলাসমাজ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তখনকার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল।

অফিসে কাজের ফুরসতে মাঝেমধ্যে বেরিয়ে পড়তাম ফিয়ার্স লেন বরাবর। রাস্তার দুপাশে অসংখ্য ড্রাম জমা হয়ে থাকত যা সৃষ্টি করত এক অজানা কৌতূহলের। যেসব বাড়ি চোখে পড়ত তার বাসিন্দারা কেউ অবাঙালি মুসলমান, কেউ চিনা, কিছু অবাঙালি হিন্দু। আবার আর্মেনীয় ও অন্যান্য অ্যাংলোর উপস্থিতিও চোখে পড়ত। বাঙালির সংখ্যা সম্ভবত হাতে গুনে বলা যায়। মুসলমানদের মধ্যে আছেন ভোরা, মেহমুন ও বহু উত্তরপ্রদেশের মানুষ। লোকমুখে শ্রুত উনিশশো ছেচল্লিশের দাঙ্গায় নিহত হয় এ গলির বহু মানুষ।

সিভিল ডিফেন্স অফিসের কয়েকটা বাড়ি পরেই একটি প্রসিদ্ধ মসজিদ, সেখানে প্রতি শুক্রবার দুপুরে রাস্তা বন্ধ করে নমাজ পড়েন কয়েকশো মুসলমান। শুক্রবার হলেই মাথায় ফেজ টুপি পরা অসংখ্য মানুষ জমা হন মসজিদ প্রাঙ্গণে, তারপর শোনা যায় আজানের ডাক। রাস্তার দুপাশে তখন ছোটখাটো একটা মেলা বসে যায়, সারিসারি সেমাইয়ের দোকান। নানা ফলের সমাহার। নমাজের ঠিক পরে পরেই শুরু হয় কেনাকাটা। বিরাজ করতে থাকে উৎসবের মেজাজ।

'রাত্রি' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে, কবিতাগুলির রচনাকাল এপ্রিল ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৫, বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮-এ। কবিতাটি যখন লিখেছিলেন কবি, প্রায় সত্তর বছর আগেকার ফিয়ার্স লেন কীরকম ছিল তা ভাবতে ইচ্ছে করে। নিশ্চয় বাণিজ্যের এরকম রমরমা ছিল না তখন। ছিল না এরকম ঘিঞ্জিও। বাসিন্দারা বাস করতেন খোলামেলা পরিবেশে। তখন চলছে বিশ্বযুদ্ধ। এই সময়কালে লেখা কবিতাগুলির পশ্চাৎপট তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি অনুসরণ করে। তখন কলকাতার প্রেক্ষাপটেও এক প্রবল অস্থিরতা, জাপান হুঙ্কার দিচ্ছে মিত্রশক্তির সমর্থকদের, তখন রবীন্দ্রনাথ চিনকে পাঁচশো টাকা সাহায্য দিতে চাইছেন, বলছেন, 'আরো দিতুম যদি আরো সামর্থ্য থাকত'। জীবনানন্দ লিখছেন, 'সৌরকরময় চিন, রুশের হৃদয়', আরও লিখেছেনঃ

পশ্চিমে প্রেতের মতন ইয়োরোপ
পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা
আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতো ঘনঘটাচ্ছন্নতা
ইয়াঙ্কির লেনদেন ডলারে প্রত্যয়—

ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে জীবনানন্দ তখন কাটাচ্ছেন কলকাতার সময়কাল, লিখছেন কবিতা, হাঁটছেন কলকাতার পথে পথে, সেই অভিজ্ঞতা জারিত করছেন স্নায়ুকেন্দ্রে, তারপর আবার লিখছেন কবিতা।

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন
প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি।
তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত। পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

ক য়ে ক টি চি ঠি

জানা, না-জানা বই

'কালের কষ্টিপাথর' জুলাই-আগস্ট সংখ্যার 'বই-ঠেক' বিভাগটি নিয়ে আমার এই চিঠি। প্রথমেই বলে রাখি, বিভাগটির আকর্ষণ আমার কাছে যথেষ্ট। বেশকিছু ভাল বইয়ের সন্ধান মেলার জন্যই শুধু নয়, এই বিভাগের লেখকদের লেখনী-শৈলীর জন্যও বটে। এক কথায়, ভাল বই পড়ার আগ্রহ যেমন সবার রয়েছে, সে সব বইয়ের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণের মুনশিয়ানাও কোনও একটি না-জানা বইয়ের প্রতি আকর্ষণ আরও অমোঘ করে তোলে।

এ বারের সংখ্যায় যে চারটি বই পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, তার একটি প্রথিতযশা সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের 'স্কুপ', ময়দান থেকে মানব-জমিনের সাহিত্য-স্রষ্টা মতি নন্দীর 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান', মুসলিম তাত্ত্বিক জাহিরুল হাসানের 'মুসলমানকোষ' এবং জাহিরুল হাসানেরই 'সাহিত্যের ইয়ারবুক ২০১৩'র দ্বিতীয় সংস্করণ। আমার এই চিঠি প্রথম দু'টি বই প্রসঙ্গে।

বিভিন্ন সংবাদপত্রের পরে বাংলায় একাধিক বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম। বাঙালির রোজকার জীবনযাপনে সংবাদকে এড়িয়ে চলা এখন প্রায় অসম্ভব। ফলে, 'ব্রেকিং নিউজ', 'নিউজ ফ্ল্যাশ'-এর মতোই 'এক্সক্লুসিভ' বা 'স্কুপ নিউজ'-এর চলতি নামগুলি এখন আমাদের দৈনন্দিন শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। যে খবর অন্য কোনও সংবাদমাধ্যম অথবা সাংবাদিকের অজানা, 'স্কুপ' বা 'এক্সক্লুসিভ' তা-ই। এক্ষেত্রে কুলদীপ নায়ার, খুশবন্ত সিং, অরুণ শৌরি, এন রাম, কিংবা এম জে আকবরের মতো অভিজ্ঞ ও বর্ষীয়ান সাংবাদিক এদেশে হাতে গোনা। ইদানীং বিচক্ষণ সাংবাদিকতায় আরও অনেক নাম অবশ্য আমাদের পরিচিতির গণ্ডিতে চলে এসেছে। সে প্রসঙ্গ অবশ্য এই চিঠির অবতারণার উদ্দেশ্য নয়।

স্বাধীনতার আনন্দ ও দেশভাগের দুঃখ, এই দু'য়েরই সাক্ষী কুলদীপ নায়ার। পাকিস্তানের শিয়ালকোট থেকে কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে দিল্লিতে এসে পাকাপাকি ভাবে বসবাস শুরু করার পরেই মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড। '৪৮-এর ৩০ জানুয়ারি জাতির বেদনা কীভাবে দীর্ণ করেছিল দেশকে, শ্রী নায়ার তারও মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। জানিয়েছেন, মহম্মদ আলি জিন্নার আশ্বাসবাণী এবং তা অচিরেই সর্বৈব মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার কথা। নেহরুর পরে লালবাহাদুর, এবং তারও পরে পণ্ডিতজির আদরের 'ইন্দু'র প্রধানমন্ত্রিত্বে অভিষেক। যে 'সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটি' ছিল নেহরুর ঘোষিত নীতি, তাঁরই কন্যা পরে জরুরি অবস্থা জারি করে কীভাবে তা খণ্ডন করে জাতির বিরাগভাজন হন-- এ সবই আছে শ্রী নায়ারের বইতে। 'বই-ঠেক'-এ অবশ্য আলোচিত হয়নি ইন্দিরার প্রত্যাবর্তন, কিংবা কার্গিল যুদ্ধের প্রসঙ্গ। '৯৯-এর সেই যুদ্ধ যেন ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের আর এক মোড়। সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াস, লাহোর বাসযাত্রা এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফের সঙ্গে আগ্রা বৈঠক-- সব কিছুরই বিশ্লেষণ করেছেন কুলদীপ নায়ার। আজকের তরুণ সাংবাদিকদের কাছে এ এক আকর গ্রন্থ। ভাল লাগল, 'কালের কষ্টিপাথর'-এ এই বই আলোচনায় উঠে আসায়।

ক্রীড়া সাংবাদিক মতি নন্দী শুধু ময়দানের নেপথ্য-ভাষকই নন, ছিলেন মানবজীবনের এক সার্থক আখ্যানকারও। প্রথম জীবনে হাওড়া স্টেশনে মই বেয়ে উঠে বড় ঘড়ি মোছার কাজ করেছিলেন সে দিনের এক খ্যাতনামা ফুটবলার। আর সে কথা নিজের লেখায় তুলে এনে আমাদের চোখের জল মোছানোর কাজটি করে গিয়েছেন প্রয়াত সাহিত্যিক। কিশোরদের কাছে আজও সমান জনপ্রিয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'স্টপার'। সেখানে যেমন এক দামাল কিশোরের বড় খেলোয়াড় হয়ে ওঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দেখেছি, 'কোনি' উপন্যাস এবং পরে তার চলচ্চিত্রায়নে পেয়েছি এক কিশোরীর জীবন-সংগ্রাম ও নেপথ্যে তার কোচের মানবিক সাহায্যের কাহিনি।

মতি নন্দীর 'নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান' আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের এমনই এক নির্ভেজাল তথ্যপঞ্জি। তাঁর সাবলীল ও টানটান গদ্যে সে লেখা হয়ে উঠেছে আরও সুখপাঠ্য। বাঙালি পাঠক-পাঠিকার কাছে শুধুমাত্র একটি সন্ধ্যা-কেন্দ্রিক উপন্যাস প্রথমত বিরল প্রাপ্তি। তার সঙ্গে বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে আমাদের প্রেম-জীবন, সমাজের চোখে যা কখনও বৈধ, কখনও বা অবৈধ। বিদেশি গাড়ি চড়ে পাড়ার এঁদো গলিতে এসেছেন পর্দার নায়ক, আর তাঁকে দেখতে সব বয়সের নারী-পুরুষের হুড়োহুড়ির মধ্যেই শুরু হয়ে যায় আর এক টানাপড়েনের নাটক। সম্পর্কের নাটক। শারীরিক পাওয়া-না পাওয়ার আর্তি। তারই মধ্যে লোডশেডিং এই উপন্যাসের ক্লাইম্যাক্স। যে যেখানে দাঁড়িয়ে তখন, সেখান থেকেই যেন শুরু হয়ে যায় যে যা করে ফেললেন, যে যার মতো করে তার কাটাছেঁড়া। শুধু লোডশেডিংয়ের অন্ধকার থেকে নয়, কৃতকর্মের আবর্ত থেকেও বেরিয়ে আসার হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় 'ম্যান-ওয়াচার' মতি নন্দীর লেখনীতে ধরা পড়েছে অবিকল।

'বই-ঠেক' আগামী দিনে আরও অনেক জানা, না-জানা বইয়ের সন্ধান আমাদের দেবে, এই আন্তরিক বিশ্বাস থেকেই ধন্যবাদ জানাই 'কালের কষ্টিপাথর'কে।

শ্রীময়ী সেন
সল্টলেক, কলকাতা

শেষ, নাকি এখানেই শুরু!

পত্রলেখক প্রথম সংখ্যা থেকে 'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার পাঠক। বিগত এক বছরের কিছু বেশি সময় ধরে 'বিষাদগাথা' ধারাবাহিকটি পড়ে আসার পর, জুলাই-আগস্ট সংখ্যায় চোখে পড়ল এটি শেষ করে দেওয়া হয়েছে। মনটা একটু মুচড়ে উঠল। অত্যন্ত ভালো লাগছিল উপন্যাসটি। বিরাট এক সময়ের প্রেক্ষিতে তাকে প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করছিলেন লেখক। প্রত্যেক মুহূর্তে টানটান নাটকীয়তা আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখছিল। কত ঘটনাসূত্র, কত প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, কত মুহূর্তের সুখ-দুঃখ, সম্পর্কের বোনাগাঁথা, সামাজিক ব্যাধি ও তার বিনাশে কিছু মানুষের জীবন উৎসর্গ— এই সবকিছু নিয়ে এ আখ্যান একদিন নিশ্চয় শেষ হতই। তবে পরের সংখ্যা থেকেই আর উপন্যাসটি পড়তে পারব না, এ বড় দুঃখের। কিন্তু সেই সঙ্গে এও তো ঠিক, উপন্যাসের বাইরেও উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের জীবন চলতেই থাকবে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর গানে লিখেছিলেন, 'মরণ বলে আমি তোমার জীবনতরী বাই', সেভাবেই সময় ও জীবনপ্রবাহ সামনে এগোবে। পরীক্ষিতের জীবনপর্ব সমাপনের সঙ্গেই 'বিষাদগাথা' শেষ হয়ে যাবে না। পুত্র অরণ্য থাকল। তিস্তা-মেঘাবৃতর মতো অসম্ভব সম্ভাবনাময় দুটি চরিত্রও থাকল। বালিসোনায় রক্তপাত যতই বাড়ুক, আমরা তো পাঠক হিসেবে আশা করব, তারা একদিন সরবে সক্ষোভে চিৎকার করে উঠবে। আসলে 'বিষাদগাথা' শেষ হওয়ার নয়। চলার। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইলাম, আবার কবে তার পদধ্বনি শুনতে পাব, সেই আশায়।

স্বপন পালিত
সিঁথি, কলকাতা

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী** সংগীত ও পরিচালনা: **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার** গান: **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায় ₹৯৯

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
নতুন উপন্যাস

বিষাদগাথা

হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীমাতৃক এক গ্রামের দর্পণে দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র কিংবা সমকালীন রূপকথা।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্য ২০০ টাকা।

২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নীচের ঠিকানায় ১২৫ টাকা পাঠালে আমাদের খরচে ক্যুরিয়ারে বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ছোটদের জন্মদিনে শ্রেষ্ঠ উপহার

ছেলেবেলা

- বাড়ির ছোটদের বা তাদের বন্ধুদের সামনের জন্মদিনেই আগামী একবছরের জন্য প্রতি মাসের ‘ছেলেবেলা’ উপহার দিতে পারেন।
- একবছরের গ্রাহকমূল্য (ডাকব্যয় সহ) ১৫০ টাকা (ক্যুরিয়ারে পেতে চাইলে ২৬০ টাকা) চেকে বা মানি অর্ডারে Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলে আমরাই উপহার প্রাপকের নাম লেখা গিফট কার্ড সহ ‘ছেলেবেলা’ পাঠাবার ব্যবস্থা করব।
- চেকের সঙ্গের চিঠিতে বা মানি অর্ডার ফর্মের একেবারে নীচের দিকে আপনার নাম-ঠিকানা আর উপহার প্রাপকের নাম ও জন্মতারিখ অবশ্যই লিখে দেবেন। উপহার প্রাপকের ঠিকানা অন্য হলে তার ঠিকানাও লিখতে হবে।
- **অনলাইনও গ্রাহক হতে পারেন। লগ অন করুন:** www.swarnakshar.in
- যে মাসে জন্মদিন তার অন্তত একমাস আগে আমাদের দপ্তরে টাকা পৌঁছতে হবে। চেক বা মানি অর্ডার পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Subscribe online: www.swarnakshar.in

ফোন: ২২৮০ ৮৮১৮ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭ ৬৪৪৮ **ই-মেল:** chhelebela@swarnakshar.in

প্রতি মাসের ছেলেবেলা পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছেও পাওয়া যাবে।

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 2 No. 3 □ September 2013 □ Rs. 30 RN WBBEN/2012/50069 Postal Regn. No. KOL RMS/

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.